রঙ্গশ্রী

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক

পঞ্চদশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

[illegible]

ষাণ্মাষিক সূচী

সম্পাদক

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্‌লিশিং হাউস লিমিটেড

৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বিষয় ও লেখক-সূচী

P 30235

প্রবন্ধ

বিষয়	লেখক	
মানব-জীবনে গীতা	অধ্যাপক হেমন্তকুমার বসু	১, ২৫১, ১৪৪
সংস্কৃত সাহিত্যের সার্বজনীনত্ব	ডক্টর শ্রীহীরেন্দ্রবিমল চৌধুরী	১৫
চুঁচুড়ার ইতিবৃত্ত	শ্রীসুধীরকুমার মিত্র	৩৪
ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা	শ্রীতারকেশচন্দ্র রায়	৪৮
বেগার মাই নেবার নেপাল রিপাইয়ে	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৬১
ব্যাঙ্ক-বিকার	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস	৭৩
পুরাণ-বোধোদ্দীপনী…	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩
ইংরাজী সাহিত্য এবং বর্ত্তমান বাংলার সংস্কৃতি	শ্রীকালিদাস রায়	৯৭
ভারতের কলা-সম্পদ	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল	১০২
ভারতীয় নৌবহর ও নৌ-বাণিজ্য	শ্রীহীরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৩
চিত্রশিল্পে বাঙালী নারী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু	১৪২
বিশ্ব-ধরণী— চাদকৌর	শ্রীমতী অমিয়া বসু	১৪৪
জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৫২
স্বাধীনতার পরে	শ্রীসুবোধ রায়	১৬৬
মথার্ট ব্রিজেস	শ্রীঅতিলাল দাশ	১৮৪
স্যোডিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধ-চিত্র	শ্রীরঞ্জিত সিংহ	১৯৫
খেলার ছলে বিজ্ঞান	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২০৪
ওড্রেখর	শ্রীসুধীরকুমার মিত্র	২১২
ভারতীয় মুদ্রার পুরাতত্ত্ব	অধ্যাপক—শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়	২২০
মেজোরিটি ও মিনরিটি	শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার	২২৪
একাডেমীর চিত্র-প্রদর্শনী	শ্রীসতীন্দ্র দাদা	২৩০
শ্রীঅরবিন্দের রাজত বাস	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	২৪৭
ভীল জাতির পরিচয়	শ্রীঅমিয়া বসু	২৫০
দর্দ্দরের দেশ	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	২৫৫
আত্মদর্শন	মো. ক. গান্ধী	২৭৬
মহাত্মাজীর জীবন-দর্শনের চারিটি মূল-সূত্র		২৭৮
মহাত্মা পরিক্রমা		২৯২
মহাত্মাজীর বাণী-সংকলন		২৯৮
মহাত্মার মহাপ্রস্থান	শ্রীনীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৩০২
গান্ধীজীর রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা	শ্রীরবি ভট্টাচার্য্য	৩০৩
যীশু ও গান্ধী	শ্রীমতী শতদল বিশ্বাস	৩১৭
মহাত্মা গান্ধী	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৩১৯
গান্ধী-স্মৃতি-মন্দির	শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার	৩৫১
কমিউনিজম ও গান্ধীবাদ	শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু	৩৫৪
মহাত্মা গান্ধী যেমন ছাত্রসমাজে	জনৈক ব্রহ্মপ্রত্যাগত	৩৬১
জগতের সাম্রাজ্যবাদ ও মহাত্মা গান্ধী	শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়	৩৬২
শ্রদ্ধাঞ্জলি		
ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়	শ্রীননীমাধব চৌধুরী	
ঘটঠাকুরাণীর হাটে সুরমা	শ্রীনমিতা…	
প্লাষ্টিক শিল্প ও ভারত	শ্রীকুঞ্জবিহারী…	
রাণী সাহেবকৌর	শ্রীমতী অমিয়া…	
আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের কথা (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রলাল…	
গুপ্তপানি-প্রস্রবণ, অমিকুণ্ডের ও গোপালের…	শ্রীকৃষ্ণকান্ত…	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ভাবময় ও কর্মময় জীবনের মূর্ত প্রতীক (সচিত্র জীবনী)		৪৬৪
নাট্যাচার্য্য শিশিরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার সমসাময়িক নাট্য-সমালোচনা	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪৬৭
রবীন্দ্রনাথের তিনখানি পত্র	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু	৪৭৭
দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস	শ্রীতারকচন্দ্র রায়	৪৯২
মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতি	শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৫০২
ভারতমাতার পাদ-পীঠ সিংহল	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	৫০৭
রবীন্দ্র-সঙ্গীত	শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়	৫১৪
নবযুগের আদর্শ	শ্রীজনরঞ্জন রায়	৫১৮
মহাকবি শিশিরচন্দ্রের 'করিমচাচা'	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৫২৬
খেলার ছলে বিজ্ঞান	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৩৩
বৃহত্তর বঙ্গ গঠনের কথা	শ্রীসুধাংশুকুমার দাস	৫৪৬
কাহিনী		
নষ্টচন্দ্রের কলঙ্কমোচন	শ্রীসুবোধ সেন	১৭১, ২৩২
গল্প		
নিষ্কৃতি	শ্রীবেলা দে	১০
বিদ্যুল্লতা	শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার	১৭
ভাঙ্গচুরি	শ্রীবেবতীমোহন সেন	৫২ ১০৪
সন্ধিত	শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১০৬
সুখ ও শেষ	শ্রীরমেন মৈত্র	১১২
বাঁচি (অনুবাদ)	শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী	১৩০
বাঘা তেঁতুল	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	১৪৮
সেই	নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯০
ফুরাল	শ্রীতরেশ দত্ত	১৯৮
বহু ভূমি লিপিকার	শ্রীসতীকুমার নাগ	২৩০
হাসিন (অনুবাদ)	নিখিল সেন	২৬২
যোগাযোগের বিশেষ পুরস্কার	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস	২৮৭
মধ্যবিত্তের ছেলে	শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্ত্তী	৩১৬
প্রশ্ন	শ্রীবীরেন রায়	৩৮৭
ওস্তাদের এক কথা	শ্রীগোপালদাস চৌধুরী	৪১৪
ভূতের হাত (অনুবাদ)	শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২১
প্রতীক্ষা (উপকথা)	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস	৪২৮
সত্তা	শ্রীসুজাতা ঘটক	৪৩১
কলঘাসের আবিষ্কার	দূর-লেখক—ইলিয়া ইলফ ও ইউজিন পেট্রোভ অনুবাদক শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী	৪৭২
পথ ও পথিক	শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়	৪৭৯
সুকুমার	শ্রীপাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়	৫১২
দেবী-মূর্ত্তি	শ্রীঅনিলভূষণ ভট্টাচার্য্য	৫২৯
উপন্যাস		
দিদিরাণীর ঘাট	শ্রীনীলরতন দাশগুপ্ত	৬৪, ২১১, ৪২৬
জঙ্গল মাঠের ফসল	শ্রীঅনিলভূষণ দাশগুপ্ত	২৪৩, ৩২৬ ৪২১
নাটক		
লোহাগিনী হস্তিগার	শ্রীযামিনীমোহন মতিলাল	৪২
শেষ মিনতি	শ্রীচারুচন্দ্র সেন	৪৭৭, ৫৪২
কবিতা		
বৈষম্য	শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্ত্তী	৯
জনতা	শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	২২
সমর্পণ	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	২৬
এ ব্যর্থ জীবনশেষে	অধ্যাপক আশুতোষ সান্যাল	২৬
পিপাসা	শ্রীরঘুনাথ ঘোষ	৩৪

বিষয়	লেখক	
আবেদন	শ্রীনিলীপ রায়গুপ্ত	৪১
কবিবর হেমচন্দ্রের প্রতি	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৬০
যারা মেঘে চলি	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রকান্তি করণ	৬০
সূর্য্য-প্রণাম	শ্রীজগন্নাথ মুখোপাধ্যায়	৭২
সোমনাথ	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৪১
জন্মদিনের গান	শ্রীজগন্নাথকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৪১
পূর্ণাশা	শ্রীসুনীলকুমার গুপ্ত	১৯৭
শহীদের গান	শ্রীহরপ্রসাদ সরকার	২১৫
বসন্তের ডাক	শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ঘোষ	২১৪
আবার ডাকুন এসো	শ্রীঅনিলরঞ্জন রায়	২৩৪
এই কি স্বাধীনতা এই কি জয়	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	২৫৬
প্রগতি	শ্রীসুনীল সেন	২৪২
হিন্দু-মুসলমান	বুকেজাদী মির্জা	২৬৬
নবজন্ম	শ্রীহেমেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়	২৪৪
মহাত্মা গান্ধী	শ্রীহরিপ্রসাদ বেলাস্থী	২৭৪
অমর	শ্রীঅনিল সেন	৩১৮
যুগমানব মহাত্মাজী	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৩৪৭
বেদনার স্মৃতি	শ্রীবিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৩৪০
স্বরূপে	শ্রীসুরেশ বিশ্বাস	৩৮০
প্রণাম	শ্রীহরণজিৎকুমার সেন	৩৮২
স্বপ্ন-বিলাস	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	৩৭৫
তবে চলে যাই	শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী	৪৬৬
নব-আয়োজন	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৪৮৯

বিষয়	লেখক	
আত্মহারা	শ্রীহরপ্রসাদ সরকার	৪০৭
কাব্যদূত	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	১৪৮
জাতির জনক	বন্দে আলী মিঞা	৫২৪
গণ-জাগৃতি	শ্রীকল্যাণকুমার সেনগুপ্ত	৫৪২
নববর্ষ	শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়	৪৫৫
আধুনিক ইংরাজী কবিতা (হারবার্ট রীড্)	শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়	৪২৪
নির্দ্দোষী মেষ	শ্রীসুধীন সেন	৪৭৮
মহাপৃথিবীর পথে	শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত	৪৯১
কণেক তরে মাটীর বুকে স্বর্গ এল নেমে	শ্রীঅঞ্জলি দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯৫
মুহূর্ত্ত	শ্রীসুনীল ঘোষ	৫০১
এক কাপ চা	শ্রীসুজিতকুমার নাগ	৫০৬
রহস্যময়ী	শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস	৫১৪
জীবন-নাট্য	তপতী দেবী	৫২৫
অভিসার	শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫৪১
তুমি যেন কবিতার মতো	শ্রীঅনিলরঞ্জন রায়	৫৪১
পুস্তক ও পরিচয়		৪৫৪, ৫৫২
রূপালোক		৮১, ২৬৮, ৪
সম্পাদকীয়		৮৭, ১৭

বজ্রাঘাত

চৈত্রমাস—১৩৫৫

ছবি আঁকছে শ্রীমতী বেলা দেবী

"লক্ষ্মী র্হ্যেষা ধান্যরূপাসি পাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

পঞ্চদশ বর্ষ | বৈশাখ—১৩৫৫ | ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

উপক্রমণিকা

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী জাতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানিগণ যেসব মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিয়া ভারতবর্ষের জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণায় আসিবার চেষ্টা করা হইবে।

খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সহিত ইরাণের রাজনৈতিক সংযোগের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। এই সময়ের পর হইতে যে সকল বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক বিবরণ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানিগণ যে সকল মতবাদ প্রচার করিয়াছেন সেই সংমিশ্রণ এই সময়ের বহু পূর্ব্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষে আর্য্যজাতির আক্রমণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংমিশ্রণের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়। বর্ত্তমান আলোচনার প্রথম অংশে বহুবর্ষব্যাপী প্রাগৈতিহাসিক যুগের জাতি-সংমিশ্রণের প্রথম হইতে শেষ অধ্যায়ের কথা সংক্ষেপে বলা হইবে। ভারতীয় জাতি বলিতে যাহা বুঝায় প্রাগৈতিহাসিক যুগেই তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ভারতবর্ষে নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানের দুইটি বিভাগ আছে, ফিজিকাল এন্থ্রোপোলজি ও কালচারাল এন্থ্রোপোলজি। প্রথম বিভাগের কাজ জাতিতত্ত্ব ও জাতিসংমিশ্রণ সম্বন্ধে আলোচনা। দ্বিতীয় বিভাগের কাজ কৃষ্টিতত্ত্ব ও কৃষ্টি-সংমিশ্রণ সম্বন্ধে আলোচনা। ভারতবর্ষে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের গবেষণার কাজ আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাংলার রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির চেষ্টায় এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্যর উইলিয়াম জোন্সের উৎসাহে। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেরণায় যে গবেষণা ও অনুসন্ধান আরম্ভ হয় তাহার প্রথম ফল কর্ণেল ডাল্টনের Descriptive Ethimology of Bengal (১৮৭২) ইহার পরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে Anthrowlogial socity স্থাপিত হয়। ডাল্টনের গ্রন্থ এবং তাহার পরে প্রকাশিত স্যার হেনরি ইয়েটস্‌ন, স্যার উইলিয়ম জুর ও স্যার হারবার্ট

রিজলের প্রসিদ্ধ (Tribes and castes of Bengal) আলোচ্য বিষয় নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত। এই সকল গ্রন্থে দেশের বিভিন্নশ্রেণী, বিশেষ করিয়া অনুন্নত শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা, সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রথা, বিধি-নিষেধ, কিংবদন্তী, রূপকথা, ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইবেটসন, ক্রুক ও রিজলের পরে মধ্যভারত, দক্ষিণ ভারত ও আসামের Castes and Tribes সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলের মুণ্ডাগোষ্ঠীর কতকগুলি জাতি সম্বন্ধে রাঁচীর শরৎচন্দ্র রায়ের গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

অনেকে হয়ত' জানেন না যে, এই কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-নীতির প্রয়োজন ও প্রেরণা হইতে। অধীন, অনুন্নত দেশগুলির অধিবাসীদিগের জীবনের সকল অঙ্গের পরিচয় সংগ্রহ করা শাসকজাতিগুলির পক্ষে প্রয়োজন—যাহাতে তাহাদের সামাজিক জীবনের ব্যবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া ও অহেতুক বিক্ষোভের সৃষ্টি না করিয়া "সহানুভূতির সঙ্গে" শাসনকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চালাইতে পারা যায়। Colonial Administration-এর এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এশিয়া, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, পলি-নেশিয়া ও মেলানেশিয়ার বিভিন্ন অনুন্নত মনুষ্যগোষ্ঠি সম্বন্ধে নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানিগণ (প্রধানতঃ সাম্রাজ্যভোগী জাতির) বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষ্টিমূলক নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা প্রধানতঃ ঐরূপ প্রেরণা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের Castes and Tribes সম্বন্ধে যে-সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ইংরাজেরা যে সেই সকল গ্রন্থ রচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে শাসনকার্য্যের সুবিধা করা এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু গোড়ার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক অনুরাগ পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের অনেকে যে-সকল প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সে-জন্য তাঁহাদের প্রাপ্য প্রশংসার ভাগ দিতে কৃপণতা স্বীকার করিতে এদেশবাসীরা কৃপণতা করেন নাই।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের প্রথম বিভাগের (Physical Anthropology) কাজও আরম্ভ হয় স্যর হারবার্ট রিজলের হাতে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় সেন্সাস কমিশনার নিযুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার রিপোর্টের শেষে যে Ethnographic Appendix জুড়িয়া দেন তাহাই The people of India নামে পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্ব ও তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ সম্বন্ধে তাঁহার সংগৃহীত তথ্য ও নিজস্ব মতামত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই প্রথম প্রামাণ্য বিবরণ।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের পরে এই বিভাগের কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। এই কাজে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মাণ, আমেরিকান, ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় পণ্ডিত আছেন। নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানের উত্তর বিভাগের কাজে ভারতীয় পণ্ডিত-গণের মধ্যে রমাপ্রসাদ চন্দ, শরৎচন্দ্র রায়, অনন্তকৃষ্ণ আয়ার, ডাঃ বিরজা গুহ, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন মনুষ্য-গোষ্ঠীর বা জাতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে আলোচনার অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানীর কাজের প্রণালীর একটু ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানিগণ কতকগুলি নির্ব্বাচিত দৈহিক লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করিয়াছেন। এই সকল লক্ষণ হইল মস্তকের আকৃতি বা গঠন, নাসিকার গঠন, মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের গঠন, কেশের রং ও প্রকৃতি, চক্ষুর রং ও গঠন, গাত্রবর্ণ, দেহের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি। গাত্রবর্ণ, কেশের প্রকৃতি, মস্তকের গঠন ইত্যাদি প্রধান কয়েকটি লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় কিন্তু এই প্রকারে ভাগের যে ফল দাঁড়াইবে তাহা হইতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে

পার্থক্য বুঝা যাইবে না। দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। গাত্রবর্ণ শ্বেত, পীত, শ্যাম বা কালো হইতে পারে। মস্তকের গঠন লম্বা (dolichocephalic), গোল (brachycephalic) বা মধ্যাকৃতি (mesaticephalic) হইতে পারে, চুল পশমের মত (wooly) সরল (straight), কুঞ্চিত বা ঢেউখেলানো (curly or wavy) হইতে পারে, নাসিকার গঠন সরল ও উন্নত (leptorrhine), মধ্যাকৃতির (mesorrhine) বা চেপ্টা (platyrrhine) হইতে পারে। পশমের মত চুল সাধারণতঃ নিগ্রোদের গোষ্ঠীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এই গোষ্ঠীর মধ্যে গোল ও লম্বা মুণ্ডের লোক আছে। এই গোষ্ঠীর রং কালো কিন্তু কালো রং ভারতবর্ষের প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বা নিষাদগোষ্ঠীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মস্তক লম্বা, চুল কুঞ্চিত বা ঢেউখেলানো। মোটকথা, পৃথিবীতে এখন যে সকল মনুষ্যগোষ্ঠী দেখা যায় সেই গোষ্ঠীর কতকগুলি বিশিষ্ট ও নিজস্ব দৈহিক লক্ষণ আছে। এই লক্ষণগুলিকে সেই টাইপের বা গোষ্ঠীর পরিচয় লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

তাহার পরের কাজের প্রণালীর ব্যাখ্যা করা হইতেছে। দেহের দৈর্ঘ্য, মস্তক, নাসিকা, মুখমণ্ডল প্রভৃতির নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট সূত্রমতে মাপ ও গাত্রবর্ণ, চক্ষু, কেশ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের দৈহিক লক্ষণ সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাহা পরীক্ষা করিতে বসিলে প্রথমে দেখা যায়, প্রত্যেক লোকের দৈহিক লক্ষণগুলির পরিমাপের ও পর্য্যবেক্ষণের ফলের অল্পবিস্তর পার্থক্য রহিয়াছে। যে সকল ফলের মধ্যে মোটামুটি মিল দেখিতে পাওয়া যায় সেইগুলিকে সাধারণ মানরূপে ব্যবহার করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে মূল বা প্রধান টাইপ স্থির করা হয়। এই সাধারণ মান হইতে ব্যতিক্রমগুলি সংমিশ্রণের ফল বলিয়া অনুমান করা হয় এবং লক্ষণগুলি মিলাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী কোন টাইপের সঙ্গে সংমিশ্রণ হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ করমূল ধরিয়া অঙ্ক কষিয়া জাতিলক্ষণের দিক দিয়া সাদৃশ্য বা পার্থক্যের পরিমাণ স্থির করিতে চেষ্টা করেন। এই সাদৃশ্য বা পার্থক্যের পরিমাণ অনুসারে সংমিশ্রণের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানীর এই যে কার্য্যক্রম ব্যাখ্যা করা হইল এই কার্য্যক্রম সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানী যে প্রণালীতে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করেন সে প্রণালী কোন জীবিত মনুষ্যের বেলায় খাটে। এখন প্রশ্ন উঠে, মৃত মনুষ্যের বেলায় ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনুষ্যের বেলায় এই প্রণালী কি করিয়া অনুসরণ করা যাইতে পারে? ভারতবর্ষীয় জাতি প্রাগৈতিহাসিক যুগে গঠিত হইয়া গিয়াছিল—উপরে বলা হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের বিশেষ সার্থকতা আছে। মৃত ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনুষ্যের বেলায় মাত্র কয়েকটি বা কঙ্কাল বা কঙ্কালের অংশ লইয়া টাইপ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা হয় এবং এই কাজে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীকে বিশেষভাবে এনাটমিষ্ট ও প্রত্ন-জীববিজ্ঞানীর (Palaeontologist) উপর নির্ভর করিতে হয়। কঙ্কাল বা কয়েকটি হইতে টাইপ নির্ণয় করিবার ভারমূলে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর আছে কিন্তু উহার প্রয়োগ এনাটমির উপর নির্ভর করে। একথা বলা বাহুল্য যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটি পরীক্ষা করিয়া এই টাইপ স্থির করিতে হইলে কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই অনুমান বৈজ্ঞানিক মনোভাব-প্রসূত হইতে পারে কিন্তু অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে ব্যাখ্যা তাহা কতকটা ব্যক্তিগত মতামত বটে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকেযে মূল্য দেওয়া হয় উহাকে সে মূল্য দেওয়া যায় না।

আর একটা ত্রুটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই ত্রুটি জীবিত মনুষ্যের টাইপ নির্ণয়ের ব্যাপারেও দেখা যায়। নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানের সূত্রমতে মাপ ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে টাইপ ও সংমিশ্রণ নির্ণয় করা যায় কি না এ প্রশ্ন আজকাল নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানীদের মধ্যে উঠিয়াছে। এই সন্দেহের কারণ রেসিয়াল টাইপ যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে হইতেছে তাহা স্বীকার

করিতে হইয়াছে। পরিবেশের পরিবর্তন, সংমিশ্রণ ইত্যাদির ফলে টাইপের বা জাতির পরিবর্তন হইতেছে। কাজেই পৃথিবীতে কোন অমিশ্র জাতি বা গোষ্ঠী আদৌ আছে কিনা এবং টাইপ স্থির করিবার ফরমুলা করিয়া যে জাতির শ্রেণীবিভাগ (Racial classification) করা হইয়া থাকে, তাহার কতটা বিজ্ঞানসম্মত এই প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে। কেহ কেহ Anthropometry-র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

উদ্বেগ প্রকাশ করিবার আর একটা বিশেষ কারণ আছে। নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছুটা অনুমানের অবকাশ আছে একথা একটু আগে বলা হইয়াছে। এই অনুমানের উপর ব্যক্তিগত মনোভাবের প্রভাব আসিয়া পড়া অসম্ভব বা আশ্চর্য্য নহে। সমস্যা এই যে, বৈজ্ঞানিক ঠাট আগাগোড়া বজায় থাকে বলিয়া বৈজ্ঞানিক অনুমান কখন ব্যক্তিগত মতে রূপান্তরিত হয় এবং রূপান্তরের মূলে কি প্রকার উদ্দেশ্য কাজ করে তাহা ধরিতে সময় লাগে বা হয়ত প্রায় অসম্ভব হয়। মোটামুটি এ কথা বলা যাইতে পারে যে, racial thlory খাড়ার ব্যাপারে নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত নানা ভাবে প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। সুতরাং এই জাতীয় সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার পূর্ব্বে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সম্পর্কে আলোচনায় এই সতর্কতার মাত্রা বাড়াইবার প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সম্পর্কে racil theryর অপপ্রয়োগ এবং কোন কোন নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানীর অবৈজ্ঞানিক কার্য্যকলাপ যে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানীর দৃষ্টি এড়ায় নাই, তাহা একজন বিদেশী নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানীর কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইতেছে :—

"Our science has been debased in the interest of false racial theories……Anthropology is regarded with some suspicion in India. There are several reasons for this. The attempt of certain scholars and politicians to divide the aboriginal tribes from the Hindu Community at the time of the census created the impression that science could be diverted to political and communal ends. (Dr. Verrier Elwin Presidential address, Section Anthropology and Astrology, Indian Science Congress, 1944.

অর্থাৎ নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানকে মিথ্যা রেসিয়াল থিওরী প্রচারের কাজে ব্যবহার করিয়া তাহার সুনাম ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। ইহার কতকগুলি কারণ আছে লোকগণনার সময়ে কয়েক জন পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ্ আদিবাসীদিগকে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যে চেষ্টা করেন তাহার ফলে এই ধারণার উৎপত্তি হয় যে, বিজ্ঞানকে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সুতরাং ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্বের আলোচনায় সতর্কতার মাত্রা যথেষ্ট বাড়াইতে হইবে। চল্লিশ কোটি লোকের বাসভূমি এই বিরাট দেশ। চীন হইতে ভারতবর্ষ আয়তনে প্রায় ৩ লক্ষ বর্গমাইল বড়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে শাদা, কালো, পীত নানা জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগে উত্তর-পশ্চিম পর্ব্বতপ্রাকারের মধ্যের পথগুলি দিয়া মধ্য এশিয়া হইতে নানাজাতির নূতন নূতন প্রবাহ আসিয়া ভারতবর্ষের জনসমুদ্রে পড়িয়াছে। উত্তর-পূর্ব্ব হইতে পীত জাতির প্রবাহ এই সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। এই বিশাল জনসমুদ্রকে বেওয়ারিশ ও অজ্ঞাত ধরিয়া বসিয়া থাকা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব ও সংমিশ্রণ সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচার করা হইয়াছে, সেই সকল মতবাদকে অজ্ঞাত ও বেওয়ারিশ ধরিবার ঐতিহাসিক অভিধানের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এ কথা বলাবাহুল্য যে, এই প্রকার অভিধান ছাড়া অজ্ঞাত ধরিবার সঙ্গে পরিচিত হইবার সহজ উপায় নাই। কাজেই ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্বের ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায়ে এইরূপ অভিধানের কাহিনী পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে যে সকল মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে আমাদিগের পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য সেই সকল মতবাদের প্রকৃত ভিত্তি কিরূপ তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানিগণের মতে ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠী সংমিশ্রণের ফলে যে স্তরবিন্যাস (ethnic stratification) দেখিতে পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি এইরূপ।

নেগ্রিটো

প্রোটো অষ্ট্রালয়েড (অন্যান্য নাম বেদ্যাইক, প্রাক্-দ্রাবিড়, নিষাদ ইত্যাদি)

মোঙ্গলয়েড

কৃষ্ণবর্ণাগরীয়

পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড (অন্যান্য নাম আলপাইন, পামীরী আর্মেনয়েড, আর্দ্র আর্মেনয়েড, দিনারিক অবৈদিক আর্য ইত্যাদি)

আর্যসম্পর্কিত লম্বা মুণ্ড (অন্যান্য নাম ইন্দো-এরিয়ান ইন্দো-আফগান, নার্ডিক, প্রোটো নার্ডিক, বৈদিক আর্য ইত্যাদি)

এই সকল শ্রেণী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার আগে নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানিগণ কিভাবে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করিয়াছেন এবং সেই সকল গোষ্ঠীর আদি বাসভূমি ও প্রসারের ক্ষেত্র সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

স্বপ্ন-মিলন

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আমার হারানো প্রিয়া—
কালি এসেছিল শেষ রজনীর স্বপন-সরণী দিয়া।
আকাশ-বাসরে তারকার দল
তখনো নব-বধূ-চক্ষু সজল,
জোছনা-রূপসী রজনীগন্ধা-বনে ছিল মুখরিত।
এ কি অপরূপ ভাতি!—
নিদ্রালোকে ফুটিয়া উঠিল অমল কমলপাতি!
এ কি যৌবনচঞ্চল ছন্দে
কেলি করে তার পেলব অঙ্গে!—
কুন্তলপাশে জেগেছে আকুল মণির মাধবী-রাতি।
"মোরে কি চিনিতে পারো?"—
বহুদিন পরে আ মরি, প্রিয় শুনিনু কণ্ঠ তার ও!
সেই মুখ, সেই চকিত চাহনি,
সকল উতল—সোহাগের খনি,
ভুবন-ভুলানো সেই হাসিটুকু জীবনের সুধাসার ও।

এ জীবনে আর যার—
পলাতক প্রেম মায়াকাঠি যেন বুলাইয়া দিল তার
এলো শ্যামলিমা সাহারার বুকে,
এলো কলতান ম্লান মূক মুখে,
বেদনাবদ্ধ হৃদয়ে এ কি এ পুলকের উৎসার!
কহিলাম তারে "সই,
আজিও তেমনি তোমারি প্রেমের পরশ মাখায় বই।
আজো এ জগতে কিবি আমি একা,
এ জীবনশেষে তব সনে দেখা
কবে হবে,—সেই উতল অধীর আশায় জাগিয়া রই!
সে দিন তুমি কি এসে
বৈতরণীর কূল পাড়াইয়া আমারে ডাকিবে হেসে?
কানে কানে কথা, মান-অভিমান,
ভুলে-যাওয়া যত সুখ, হাসি-গান
উঠিবে কি জাগি'—যাবো তবে আমি মরণপারের দেশে?"

টুটিল নিদ্রাঘোর—
যাত্রাপথের প্রভাত-সমীর পরশে কপোল মোর।
কোথা সেল মোর স্বপনের সাথী?—
ডাকে বিহগ—নাহি আর রাতি,
আবার জাগিল নয়ন-সমুখে বাস্তব সুকঠোর।

মধ্যবিত্তের ছেলে

শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্ত্তী

সারাদিন কত কাজ করতে পারে হরেন! কাজের মধ্যে যেন ডুবে আছে—মিশে আছে। একটা নেশার মত কাজ যেন তাকে পেয়ে বসেছে।—মদের নেশার চেয়েও তা যেন ভেজালো-জোরালো।

দশটা বাজার পনেরো মিনিট আগেই সে অফিসে আসে। তখনি কাজে বসে। এদিকে বাবুও সকলের পরে। আবার টিফিনেও বেরোয় না। যখন নিজের হাতে কাজ থাকে না, অন্যের হাতের কাজ চেয়ে নিয়ে করে। সহকর্মীটি আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে একটা বিড়ি ধরায়।

হরেনের এই কাজে-পাওয়া মন আকৃষ্ট করেছে ছোট, মেজো, বড়—সব ওপরওলাকেই। মুখ বুজে মাথা গুঁজে নির্ব্বিবাদে এভাবে কাজ করে যাওয়া সত্যই অস্বাভাবিক।

বড়বাবু মাঝে মাঝে বলেন, আপনার কথা ছোট সাহেবকে বলেছি।

কখনো-সখনো ছোট সাহেবও বলেন, বাঃ! বেশ—চমৎকার! মন দিয়ে এভাবে কাজ করে যান। প্রমোশনের মধ্যে নাম চাইলে আপনার নাম আমি রেকমেণ্ড করবো বড় সাহেবের কাছে।

হরেন কোন কথা বলে না। শুধু শুনেই যায়। একটা যেন পরম নির্ব্বিকার ভাব। হলে ভালো, না হলে কিছু না। জীবনে পাকাপোক্ত বনেদের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি সে করেছে। কিন্তু ব্যর্থকাম হয়েছে বড় নিষ্ঠুর ভাবে। অবশেষে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সে ছেড়ে দিয়েছে। যা হবার হোক। তাই আজ তার এই স্পৃহাহীনতা।

ঈর্ষ্যাপরায়ণ কোন কোন সহকর্ম্মী মাঝে মাঝে ব্যঙ্গোক্তিও করে, নে নে, আর কাজ দেখাতে হবে না। বড়বাবু ছোটসাহেব এতেই সন্তুষ্ট।

কেউ কেউ আরো কয়েক ডিগ্রি ওপরে ওঠে, কী, কবে হচ্ছে প্রমোশনটা?

কেউ কেউ আবার প্রশংসাও করে, আমাদের মধ্যে হরেনই ভালো। কারো সাতে পাঁচে নেই। মুখ বুজে কাজটি করে—ছুটী হলে বাড়ী চলে যায়।—এক কথায় যাকে বলে ভালো মানুষ।

এ সব উক্তিতেও হরেন নিস্পৃহ। তবে সহকর্ম্মীরা কেউ প্রশংসা করলে মাঝে মাঝে মুখ তুলে একটু হাসে।

নোঙরহীন নৌকার মত হরেন ভেসে চলেছে জন-সমুদ্রে। রবিবার, অফিস বন্ধ। কাজ নেই। অন্যদিনের মত রবিবারেও খাওয়া দাওয়া করে দশটার সময় সে বেরোয়। তার পর ঘোরে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়। চেনা পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে দু'দণ্ড গল্প করে। না হলে ঘুরতে ঘুরতে কোন পার্কে এসে বসে। জীবনের স্রোত চলে রাজপথ দিয়ে—সেদিকে সে চেয়ে থাকে।

বৌবাজার হয়ে চলেছে হরেন। কোথায় যাবে কোন ঠিক নেই। রাতের কথাগুলো মনে বাজছে: তুমি কেমনতর মানুষ বলো ত? একটা দিনও কি বিশ্রাম করতে নেই? সকাল ন'টায় বেরোও—রাত দশটায় ফেরো। দু'টা দিন এ ভাবে খেটে একটা দিন বিশ্রাম নিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? রোববার দিন বেরোও কোথায় তুমি?

হরেনের আজকাল কী যে হয়েছে, স্ত্রীর কোন কথা সে শুনতে পারে না।

চটে মটে বলেছে, কী, বৈকিয়ৎ চাও নাকি?

তুমি এতদূর ছোট লোক? আমি বৈকিয়ৎ চাইলাম? কী ভাব তুমি আমাকে? সারাদিন ভেবে ভেবে মরে যাই—আর আমাকে বললে কি না বৈকিয়ৎ চাই?

অশ্রু-উদ্গত চোখে রুদ্ধ কণ্ঠে রাণী বেরিয়ে গেছে।

হরেনও বেরিয়ে পড়েছে।

কিন্তু তার কী দোষ? সপ্তাহে একটা দিন বিশ্রাম নিতে তার দেহ-মন কি চায় না? তার কি ইচ্ছে করে না বিছানায় শুয়ে একটু আমীরী ক'রে—ভুলে যায় সপ্তাহের কর্ম্মক্লান্ত দিনগুলো? কিন্তু সে ভাগ্য নিয়ে কি সে এসেছে? একটী মুহূর্ত্তের জন্যে কি বাড়ীতে তার শান্তি আছে?

বাংলা সরকারের যে সাময়িক সরবরাহ-বিভাগের নিম্নতম কেরাণী সে। মাইনে আর মাগ্‌গী ভাতা মিলিয়ে শ' খানেকের মত মাস গেলে পায় বটে। কিন্তু অতি সাধারণ ভাবে পেট পুরে দু'বেলা খেয়ে থাকতেই মাসে তার সংসারের জন্যে দরকার করলকে সেড়শো টাকা। তার ওপর অন্যান্য খরচা ত আছেই। আর অসুখ-বিসুখ ত নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ীতে যে সময়টা সে থাকে, সেই সময়টুকুর মধ্যেই জীবন তার অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

ছোটকাকার বয়েস হয়েছে। আফিঙ খান। হয় ত ছুরোয় নি। কয়েকদিন চলবে। তবু হরেন বাড়ী এলেই ঘণ্টায় তিনবার করে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যান—আফিঙ একেবারে নেই। দুধের বরাদ্দ বাড়াবার তাগিদটাও তখন তাকে শুনতে হয় সেই সঙ্গে।

বিধবা মাসীমা এসে বলেন, অমুকদিন একাদশী। বৎসরান্তে যা যা আনতে হবে, তার একটা মৌখিক ফর্দ দিয়ে যান।

অবিবাহিতা পিঠে পিঠে বোন তিনটি যেন এ ওকে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। তাদের দেখলে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে হরেনের। কী গতি করবে সে তাদের? ভাবতে সে আর পারে না। মনে হয় পাগল হয়ে যাবে। তার পর তাদের "এটা নেই, ওটা নেই" এর ঠেলায় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত। একটু যদি বোঝে তারা তার অবস্থা।

যে বোঝে—সে রাণী! একটি কথাও সে বলে না। সারাদিন মুখ বুজে কাজ করে। কোন অভাব-অভিযোগ তার নেই। হরেনের ভার যদি সে কিছুটা লাঘব করতে পারে, নিজেকে হাল্কা বোধ করে। কিন্তু হরেন তাকে বোঝে না। কথায় কথায় তার ওপর রেগে ওঠে। কতদিন যে না খেয়ে অফিসে আসে তার ঠিক নেই।

আর হরেনেরই বা দোষ কী? রাণী ছাড়া আর কার ওপরই বা সে রাগ করবে? কাকা, মাসীমা, বোন, ছোট ভাই। কার ওপর?

রাণীর ওপর সে যে অনর্থক রাগারাগি করে তা সে বোঝে। তাই সে বাড়ী থাকে না। রাতে বিছানায় শুয়েই সে ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ঘুম আসে না, ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে। রাত্রিটাকে তার বড় ভয়। ঘুমোট বেরের মত যদিই হঠাৎ রাণী ফেটে পড়ে অভিমানে, শ্রাবণ ছোটে তার চোখে, সে তো তা সইতে পারবে না। রাণীর মনঃকষ্ট সে বোঝে। কিন্তু কি করবে সে? একদিকে সংসার—অন্যদিকে রাণী—কোনদিক সে দেখে? সুতরাং নিরপেক্ষই সে থাকে। তাতে সে খানিকটা নির্ঝঞ্ঝাটে থাকে বটে, কিন্তু রাণীর আশা বাড়ে। আর সে কি তা বোঝে না? বোঝে।

কাজের মধ্যে যে সে ডুবে থাকে—কেন? এই সব কারণেই নয় কি? শান্তি যখন কোথাও নেই, তখন সব কিছু ভুলে থাকাই একমাত্র শান্তি। মাতাল মদ খেয়ে যেমন সব কিছু ভুলে থাকে, হরেনও তেমনি কাজের নেশায় মশগুল হয়ে ভুলে থাকে বিশ্ব-সংসার।

লালদীঘির একটি বেঞ্চে এসে সে বসলো। গাছের ছায়া পড়েছে। ক্লান্তিতে ছড়িয়ে দিলো পা দুটো সামনের দিকে। রাণীর কথাগুলো এখনও তার মনে বাজছে! অত রূঢ় কেন সে হলো? রাণীকে ত সে জানে—কেন তবে অমন করে আঘাত দিলো তাকে? চোখ ফেটে জল আসে হরেনের।

মাইনে পেয়ে বাড়ী ঢুকতেই প্রতিবারের মত এবারও অভাব-অভিযোগের ফর্দ এলো তার কাছে। কিন্তু এবারের ফর্দটা বেশ বড়।

ছোট কাকার আফিং নেই। গায়ের কম্বলটি একেবারে ছিঁড়েছে। নতুন একটি না হলে তিনি কিছুতেই বেড়াতে যেতে পারবেন না। আর না বেড়ালেও তাঁর ধারণা তিনি বাঁচবেন না বেশীদিন। সুতরাং নতুন একটি কম্বল চাই।

মাসীমার জন্যে থানধুতি এক জোড়া না হোক অন্ততঃ একটা কিনতেই হবে।

ছোট বোনদের শাড়ী-ব্লাউজ সব ছিঁড়েছে।

রাণীরও যদিও এই একই অবস্থা, সে নিজের জন্যে কোন কথাই বলে নি। বরং হরেনের যে একটা পাঞ্জাবীর দরকার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

হরেন মাথায় হাত দিয়ে বসলো। এতগুলি বাড়তি খরচা মেটাবার টাকা কোথায় তার? মাসের পনেরো

তারিখে অবশ্য টিউশনের তিরিশ টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু বাইরে আর টিউশনের টাকায় সংসারের খাই-খরচাই যে কোন রকমে চলে। কোথায় পাবে সে এত-গুলি টাকা?

আর কোনটা না হলে চলে মনে মনে সে সেই হিসেব করলো। নিজের জন্যে পাঞ্জাবী—সে এ মাসে নয় নাই করলাম। কিন্তু রাণী আর তিন বোনের জন্যে চারটে শাড়ী না কিনলেই নয়! মাসীমার জন্যে থান ধুতি একটা কিনতেই হবে! আর ছোট কাকার কম্ফর্টার। কিন্তু আফিংয়ের কথাটা মনে হতেই মন-মেজাজ তার খারাপ হয়ে গেল। কেন এই বাজে খরচ? কী হয় ঐ বিষ খেয়ে? এটা না খেলে ত দুধের খরচটাও বাঁচত! বলবে কি একবার সে ছোটকাকাকে আফিংটা ছেড়ে দিতে?

হঠাৎ রাজীব বাবুর কথাটা মনে পড়ল। তাঁর ছোট ছেলেটিকে পড়াবার জন্যে তিনি ব'লে-ছিলেন হরেনকে! কিন্তু তার সময় দেখে সে না করেছে! সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত পালেদের বাড়ীর ছেলেগুলোকে পড়াতেই তার সময় কেটে যায়। ছোটকাকা ত' সারাজীবন মাষ্টারীই করেছেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত বয়েসে ছোটখাট একটা টিউশন নয় করলেনই। ক্ষতি কী? বরং লাভ। অন্ততঃ গোটা দশেক টাকা ত' পাবেন। আফিঙ আর দুধের টাকাটা উঠে যাবে। বলবে কি ছোটকাকাকে টিউশনটা নিতে? না—না—না। তার অন্তরাত্মা সায় দিল না তার এই প্রস্তাবে। ছোটকাকাকে সে এ-কথা বলতে পারে না কোনমতেই। যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন। তাকেই চালাতে হবে তাঁর সব খরচ। ছোটকাকা বলেই না এ-কথা সে ভাবতে পারলো। যদি ইনি ছোটকাকা না হয়ে বাবা হতেন, তাহ'লে কি সে এ-কথা কল্পনাও করতে পারতো? ছোটকাকার সঙ্গে কোথায় পার্থক্য তার বাবার? বাবার মৃত্যুর পর ছোটকাকাই ত' তাদের মানুষ করেছেন। বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়ে পাশ করিয়েছেন তাকে। একটু পাগলাটে ধরণের ছিলেন বলে বয়েসে তিনি বিয়ে করেন নি। হয়ত বেশী বয়েসে বিয়ে করতেন। কিন্তু দাদার মৃত্যুতে সংসারের ভার যখন তাঁর ঘাড়ে পড়লো, তিনি আর বিয়ে করলেন না। তিনি যদি ঠিক সময়ে বিয়ে করতেন, একটি উপযুক্ত ছেলে যদি তার থাকতো, তাহ'লে ত' তিনি আজ অনেক সুখে থাকতেন। অথবা যদি তিনি দাদার সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে না নিতেন, টাকা জমাতেন বুড়ো বয়েসের জন্যে, তাহ'লে ত' আজ তাঁর কোন ভাবনাই ছিল না। না, তাই সে ছোটকাকাকে ও-কথা বলতে পারবে না। দুস্তরতাকে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে।

মাসীমাকেও মাঝে মাঝে তার ভারস্বরূপ মনে হয়। কিন্তু বিবেকের কড়া চাবুক তখনি পিঠে পড়ে। মাসীমা বেচে আসেন নি। হরেনই নিয়ে এসেছে মার মৃত্যুর পর। তার অল্পবয়সী বউ, ছোট তিনটি বোন আর দুটি ভাই—এদের যদি মাসীমা দেখাশুনা না করতেন, তাহ'লে কী অবস্থা হতো তার সংসারের? এখন যদি মাসীমা চলে যান, তবে কি সে অথৈ জলে পড়বে না? বিশেষতঃ অবিবাহিতা বোন তিনটিকে নিয়ে?

সংসারের কারো বিরুদ্ধেই তাই তার কোন অভিযোগ নেই—কোন নালিশ নেই। দায়িত্ব যখন ঘাড়ে পড়েছে, বহন তাকে করতেই হবে।

কে যেন ঠেলা দিলো। ধড়মড় করে জেগে উঠলো হরেন। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলো হরেন। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলো গোলদীঘির বেঞ্চির পিঠে পিঠ দিয়ে। দেখলো পরিতোষ পাশে বসে হাসছে। রোদ তখন নিষ্প্রভ। সূর্য হেলে পড়েছে। বিকেল উৎরে গেছে।

কী রে, পার্কে বসে ঘুমোচ্ছিস, কেউ যদি পকেট মারে?

পরিতোষ বললো। তার সমপাঠী—এখন একই ডিপার্টমেন্টের হেড অফিসে কাজ করে। হরেনের মতই কেরাণী।

পকেটে কিছু থাকলে ত' মারবে।—চোখ রগড়ে হাসতে হাসতে বললো হরেন।

তা' বটে। ভালো কথা, শুনেছিস অনিল আমাদের ডিপার্টমেন্টে স্পেশাল অফিসার হয়ে এসেছে।

কে অনিল? ও কোথায় না ছিলো?

মেদিনীপুরে। সেকেণ্ড অফিসার।

অনিল দাস। তাদেরই সমপাঠী। একসঙ্গে বি, এ, প'ড়েছে। পড়াশুনায় অনিল সব সময়ই ছিলো ভালো। বি, এ, পাশ ক'রেই বি, সি, এস-এর নমিনেশন পেয়ে পরীক্ষা দেয়—পাশও করে।

যাক, একজন জানাশোনা লোক এলো—ভালোই হলো।

বললো হরেন।

পরিতোষ বললো, চল না একদিন, ওর বাড়ী যাই।

ওর বাড়ী যেতে চাস? ও কি আর সেই অনিল আছে? আমরা কেরাণী—আর ও হাকিম। এখানে এসেছে সেক্সসন্তান হেড হয়ে। যদি চিনেও না চেনে? তখন যে অপমানের একশেষ হবে।

কেরাণীর আবার মান-অপমান।

তা অবশ্য ঠিকই ব'লেছিস। আমাদের আবার মান-অপমান। লাথি, জুতো, ঝাঁটা খেয়েও মুখ বুজে থাকতে হয়। তবু সেধে কেন অপমান নিতে যাই।

কিন্তু আমি বলি—পরিতোষ যুক্তি দেখালো—একটা ট্রাই নিয়েই দেখা যাক না? ও যে আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে না, তা আমরা আগে থেকে ধ'রে নিই কেন? আর জানিস ত, ঘরেই দুই ঘাটিস না কেন, চেনাশুনা না থাকলে প্রমোশন কস্মিন্ কালেও হবে না। তা না হ'লে, দুই বি, এ, পাশ, কাকে ভালো। ওপর-ওলারা সবাই খুশী, তবু তোর প্রমোশন হয় না। আর তোর পরে ঢুকে একটু একটু সব ছেলে ডবল টি্প্‌ল প্রমোশন পেয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার হয়ে মাতব্বরী করে!

সবই বুঝি রে ভাই—হরেন বললো—কিন্তু কী করি। যতক্ষণ প্রাণটা আছে আত্মসম্মানটা খোয়াতে রাজী নই। ঐ জন্যে পাছে ওপরওলারা কখনো কোন কথা বলে, তাই মুখ বুজে কাজ ক'রে চ'লে আসি। সবার চেয়ে একটু বেশী কাজই করি। ওপরওলারা কোন কথা বলার সুযোগ পায় না। আমিও আত্মসম্মান নিয়ে কাজ ক'রে আসছি। আর এই অসহায় অবস্থা আমার একার নয়—ঘরে ঘরেই। সুতরাং কাজ দেখিয়ে যদি প্রমোশন না পাওয়া যায়, তবে অফিসারদের তেল মাখিয়ে প্রমোশন নিতে আমি রাজী নই। কপালে যতদিন দুর্গতি আছে, ততদিন এ রোগও আছে।

তুই দেখি আজকাল তখনকার ভাগ্যবাদী হয়ে উঠেছিস।—

পরিতোষ বললো।

না হয়ে আর করি কী? কপালে থাকলে আজ আমিও অনিলের মত স্পেশাল অফিসার হ'তে পারতাম।

পরিতোষ আর কোন কথা তুললো না। পড়াশুনায় সে-ও খারাপ ছিলো না। অনিলের মত বি, সি, এস, পাশ ক'রে হাকিম না হ'লেও, সুযোগ-সুবিধা পেলে সে যে কেরাণীর চেয়ে অনেক ভালো কোন কাজে নিযুক্ত থাকতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ভাগ্যের অদৃশ্য হাত যে গোপনে গোপনে কাজ করে, তাতে পরিতোষও আজকাল আর অবিশ্বাস করে না। জীবনে অনেক ঘা সে পেয়েছে।

ওপর থেকে নাম চেয়ে পাঠালো। বড়বাবু ও ছোট সাহেব, দু'জনের নাম রেকমেণ্ড করলেন। তার মধ্যে হরেন একজন। বড় সাহেব দু'জনের নাম পাঠিয়ে দিলেন। যথাসময়ে ইণ্টারভিউ-এ ডাক পড়লো।

ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে হরেন শুনলো, অনিল দাস প্রমোশন বোর্ডের অন্যতম সদস্য। সে-ও আজ উপস্থিত থাকবে।

একটা দুরাশা মনকে তার নাড়া দিলো। বোর্ডে দু'একজন চেনা লোক না থাকলে প্রমোশন হয় না। অনিল কি তাকে চিনতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে, কতদিন তারা একসঙ্গে কাটিয়েছে। এক ছোটেলে পাশা-পাশি সীটেও থেকেছে তারা কিছুদিন। সেই অনিল কি তাকে ভুলে যেতে পারে? পরিতোষের কথা শুনে একবার অনিলের সঙ্গে আগে দেখা করে এলে ভালই হতো—মনে হলো হরেনের।

ইণ্টারভিউ-এর দাবলা সুন্দর আর্ট চেহারার ওপর নির্ভর করে অনেকখানি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হরেনের চেহারাখানা এমন ছিল না, যা প্রথম দর্শনেই কারো মনে কোন ছাপ ফেলতে পারে। সুতরাং ইণ্টারভিউ হলো তার সাধারণ ভাবে। দু'একটি কথার শেষ।

চেয়ারম্যান দু'একজন সদস্যকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এখে আর কোন প্রশ্ন করতে চান?

কিন্তু বোর্ড কোন কথা বললেন না। এমন কি অনিলও না। অনিলকে আকৃষ্ট করবার জন্যে হরেন দু'একবার তাকালো তার চোখে করুণ দৃষ্টিতে। কিন্তু অনিল এমন একটা মুখের ভাব করে চোখ ফিরিয়ে নিলো, যেন সে হরেনকে চেনেই না।

অবশেষে চেয়ারম্যান বললেন, আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।

মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলো হরেন। মনটা তার ভয়ানক দমে গেলো। নিজের উপর রাগও হলো তার ভীষণ। কেন সে অনিলের ওপর এতখানি ভরসা করতে গেলো? আর ভরসা নয় করেইছিলো, কিন্তু অমন অসহায়ের মত সে অনিলের কাছে আবেদন জানাতে গেল কেন? আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন হবার ভয়ে অনিলের বাড়ীতে সে গেল না—অথচ তারই কাছে কী ভাবে ছোট করলো নিজেকে। লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে সমস্ত অন্তরটা রীরী করে উঠলো।

সে যা ভেবেছিল তাই। তার হলো না। বড়-বাবু, ছোটসাহেব দুঃখ করলেন সবাই। ঈর্ষাকাতর সহকর্মীরা একটু মুচকি হাসলো। কেউ বা চুচারটে সান্ত্বনার কথাও বললো ব্যঙ্গের সুরে। দরদী সহকর্মীরা সমবেদনা প্রকাশ করলো। হরেন তার মন আগেই শক্ত করেছিলো। সুতরাং সে কাউকে বুঝতে দিলো না তার মনোবেদনা।

বাজেটে ঘাটতি পড়েছে বাংলা-সরকারের। কি সরকার পক্ষ,কি বিরোধী দল, সকলেরই কোপদৃষ্টি পড়লো অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ওপর। রব উঠলো ছাটাই কর—ছাটাই কর।

দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে যেসকে বাঁচালো যে যুবকদল, তাদের একএক জনের নামে আসতে লাগলো নোটীশ : তোমাকে আর আমাদের দরকার নাই।

সরকার পক্ষ থেকে সাফাই গাওয়া হলো : আমরা বাজে লোক তাড়িয়ে ডিপার্টমেন্টটাকে ভালো করতে চাই। তাই অবাঞ্ছিত লোকদের সরিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু এই অবাঞ্ছিতের দলে এমন অনেক যুবক পড়লো, যাদের নামে কোন অভিযোগই নেই। অফিসাররা সবাই লিখে গেছেন—খুব ভালো—খুব ভালো। সুতরাং চাকরী গেলো তাদেরই যাদের রক্ষা করবার জন্যে পেছনে কোন খুঁটি ছিল না।

হরেনদের অফিসেও নোটীশ এলো। তিন জনের নামে। তার মধ্যে হরেন একজন।

তাজ্জব বনে গেলো সবাই। হরেনের মত লোকের চাকরী যদি এ ভাবে যেতে পারে, তবে তাদের চাকরী আর কতদিন? রীতিমত ভয়ও খেলো সকলে।

হরেনের নামে নোটীশ আসার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা চালালেন বড়বাবু ও ছোট সাহেব। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। কী কারণে যে চাকরী গেলো হরেনের, কেউ তা বলতে পারলো না। তবে একটা কথা শোনা গেলো, স্পেশাল অফিসার অনিল দাসও নাকি লিষ্ট তৈরী যাঁরা করেছিলেন তাঁদের একজন। এ কথা শুনে হরেনের ধারণা হলো। অনিলদাসের সঙ্গে সে কোন দিন দেখা করে নি বলেই হয় ত সে রাগ করে তার নামটা চুকিয়ে দিয়েছে, নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করবার জন্যে। হরেন বড়বাবুকে জানালো তার ধারণার কথা। সব শুনে বড়বাবু গম্ভীর মুখে বললেন, তা হ'তে পারে। লোকটা শুনেছি ভয়ানক ধার্ষ্টিক আর খোসামোদপ্রিয়।

যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত হরেনকে নিতে হলো সেই নোটীশ। খানিকটা কাষ্ঠ হেসে, খানিকটা সমবেদনায়, আর খানিকটা দুঃখের বিকৃত মুখভঙ্গীতে, বড় সাহেব নোটীশটা এগিয়ে দিলেন হরেনের হাতে।

নির্ব্বাক্ ষ্ট্যাচুর মত হরেন দাঁড়িয়ে ছিলো বড় সাহেবের সামনে। শীর্ণ হাতখানা এগিয়ে নোটীশটা নিয়ে বেরিয়ে এলো।

কাজ—কাজ—কাজ। কোথায় কাজ? কে দেবে কাজ?

হরেন সকালে বেরোয়—বাড়ী ফেরে রাত দশটায় এগারোটায়। পাঁচ ছ' দিনের মধ্যেই সে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে। সারাদিন টো টো করে ঘোরার পর রাতে ছেলে পড়িয়ে বাসায় যখন সে ফেরে, তখন

সে যেন আর নিজের মধ্যে থাকে না। শ্রান্তিতে-শ্রান্তিতে দেহ-মন তার অবশ হয়ে আসে।

রাণী একদিন বলেছে, শুনো, আমার মুখের দিকে চেয়ে নিজের দিকে একবার তাকাও। শরীরটাকে এ ভাবে পাত কোরো না। আমার স্বপ্নগুলো এখনো আছে।

হরেন কোন কথা না বলে পাশ ফিরে শুয়েছে। পরদিন বেরিয়েছে আরো সকালে। ফিরেছে আরো রাতে।

তার পর থেকে রাণী আর কোন কথা বলে না। মুখ ভার করে থাকে। হরেন বোঝে সে রাগ করেছে। কিন্তু কী করবে সে। ঘরে বসে থাকলে চাকরী ত আর তার কাছে নিজে থেকে আসবে না। তাকে বেরুতে হবে—দেখতে হবে—খুঁজতে হবে। তবেই যদি মেলে।

কিন্তু চাকরী জোটাতে হবে বলে এ ভাবে শরীর পাত করার অর্থ কী? নিজের প্রতি, শরীরের প্রতি কেন তার এই নিদারুণ ঔদাসীন্য? রাণি এর কারণ খুঁজে না পেলেও, হরেনের দিক থেকে এর পেছনে সবল যুক্তি আছে। একা রাণীকে নিয়ে যদি তার সংসার হতো, তা হলে সে ভাবতো না মোটেই। অন্ত একটা চাকরী না পাওয়া পর্যন্ত কোন রকমে কষ্টেসৃষ্টে টিউশনের টাকায় সংসার চালিয়ে নিতো। আর একটা টিউশন পাওয়াও শক্ত হতো না। কিন্তু দেড়শো পৌনে দুশো টাকা যে সংসারে আসে সে সংসার সে চালায় কী করে বিনা টাকায়? সুতরাং চাকরীর জন্যে পাগলের মত সে যদি রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, তা দেখতে অস্বাভাবিক হলেও হরেনের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে ছোটকাকা একদিন বলেছেন, আমাকে একটা টিউশন যোগাড় করে দে বাবা। তোর কষ্ট আর দেখতে পারি না।

হরেনের চোখ ফেটে জল এসেছে। তার অক্ষমতার জন্যেই না ছোটকাকা ছেলে পড়াতে চান। পরদিন থেকে দ্বিগুণ তেজে সে চাকরী খুঁজতে বেরিয়েছে।

চেনা পরিচিত কারো সঙ্গে হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যায়, হরেনকে দেখে সে চমকে ওঠে। চেহারা ও বেশভূষার আমূল পরিবর্তন হরেনকে যেন রূপান্তরিত করেছে শ্রেতাত্মায়। চোরমুখের তীব্র রুক্ষতায় আদর মহাবিপদের একটা আতঙ্ক যেন পরিস্ফুট—বন্যার দুর্বার বেগ বাঁধ ভেঙে আসবার পূর্বমুহূর্তে অসহায় নর-নারীর চোখে মুখে যে আতঙ্ক দেখা যায়।

তবে চলে যাই

সন্তোষকুমার অধিকারী

আমাকে বিদায় দাও,
দীর্ঘদিন রাত্রির আড়ালে
শীতের পাণ্ডুর চাঁদ অবসন্ন শ্রান্ত মুছাপায়;
করার্ত্ত রুমাল মুছে নাও,
ভুলে যাও গান,—
কুহেলী আচ্ছন্ন পথে শুধুমের স্বপ্নের সাথে
তবে চলে যাই।
রাত্রির বিবর্ণ মুখে অস্পষ্ট আঁধার,
হিমেল বাতাসে মোর পৃথিবীর শেষোক্ত নিশ্বাস
রাত্রির স্তব্ধতা ভরি'
নিঃসীম হাহার বেখা মুছে নিলো আলোর সংশয়।
আমাকে বিদায় দাও—
মর্মরিত বনান্ত উত্তরি'
নিঃসীম প্রান্তর ভরি' অকস্মাৎ কুটিল হাওয়ার
মনে গেলো ধ্বনি;
স্বপ্নহীন অবশ্য কুয়াশা চারি'
ঢেকে দাও আমার স্মৃতির রেখা।
তোমাদের আনন্দের পরিপূর্ণ অবকাশ হ'তে
তবে চলে যাই।

আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের কথা

শ্রীপ্রভেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আইসল্যাণ্ডের রাজধানী রেক্‌ভাভিক্ নগরী

বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর কোন স্থানই আর দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না। সুদূরের তুলনা দিতে গিয়া কবিরা যে আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের কথা উল্লেখ করিতেন, তাহা আজ আমাদের অতি নিকটে আসিয়া গিয়াছে। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের এই দ্বীপ দুইটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও সম্পদ আজ আর ভৌগোলিকদের গবেষণার বিষয় নহে। এই দ্বীপ দুইটীতে খাঁটি করিয়া কতটুকু সামরিক সুবিধা পাওয়া যাইবে, পৃথিবীর শক্তিমান্ জাতিরা আজ তাহাই ভাবিতেছে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের কাহিনী চিত্তাকর্ষক বলিয়াই মনে হইবে।

আইসল্যাণ্ড : ভৌগোলিক পরিচয়

মেরুবৃত্তের ঠিক দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত আইসল্যাণ্ড ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তের সর্ব্বশেষ দ্বীপ। ইহার আকৃতি প্রায় গোল, ওভ্যালও বলা যাইতে পারে। প্রায় সমগ্র আইসল্যাণ্ডই আগ্নেয়গিরি ও নাতি-বৃহৎ পাহাড়-পর্ব্বতে পূর্ণ। ইহার মোট ৩৯,৭০৯ বর্গ মাইল আয়তনের মধ্যে মাত্র ৬০০০ বর্গমাইলে চাষ-বাস করা চলে এবং লোক-বসতি আছে।

আইসল্যাণ্ডে বার মাস শীত থাকে। আবহাওয়া ২৭° ডিগ্রী হইতে ৩৯° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠানামা করিয়া থাকে।

১৯৩১ সালের লোকগণনায় দেখা যায় যে, সমগ্র আইসল্যাণ্ডে ১২১, ৬১৮ হাজার অধিবাসী আছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে সভ্য-জগতের কেহ আইসল্যাণ্ডে পদার্পণ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সুইডেন ও ডেনমার্কে রাজত্ব লইয়া এক গৃহ-বিবাদের ফলে রাজবংশের কেহ কেহ প্রাণদণ্ডের ভয়ে পলাইয়া আইসল্যাণ্ডে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন আইসল্যাণ্ডের অবস্থা কিরূপ ছিল সেই বিবরণ তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তবে দেখা যায় যে, বারশ শতাব্দীর মধ্যে প্রায় সকল ইউরোপীয়ান জাতিরই কেহ না কেহ গিয়া আইসল্যাণ্ডে হাজির হইয়াছে। ইহারা প্রায় সকলেই অজ্ঞাত ধন-সম্পদের আশাতেই এই বিপদসঙ্কুল ভ্রমণে ব্রতী হইয়াছিল। তৎকালে ইউরোপে মধ্যযুগীয় প্রথানদের অত্যন্ত আধিপত্য ছিল। ইহাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়াও বহু সাধারণ লোক আটলান্টিকের এই সুদূর দ্বীপে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এইভাবে আইসল্যাণ্ডে এক উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। সকলের পরিশ্রমের ফলে আইসল্যাণ্ডে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয় এবং নগর বন্দরাদি গড়িয়া উঠে। কিন্তু এই দ্বীপটির উপর ডেনমার্কের রাজারই আধিপত্য থাকিয়া যায়। কারণ, ডেনমার্কের লোকেরাই প্রথম এই দ্বীপে গিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে এক তীব্র জাতীয়তা-বোধ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং স্বদেশে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। ডেনমার্কের রাজা আইসল্যাণ্ডবাসীদের এই সঙ্ঘবদ্ধতায় বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং ইহাকে বীজে মারিয়া ফেলিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু স্বাধীনতার স্পৃহা এমনি জিনিষ যাহাকে কখনও কোনমতেই উৎখাত করা যায় না। অত্যাচারের জ্বালায় সাময়িকভাবে হয় ও ইহা শুষ্ক

হইয়া থাকে। আইসল্যাণ্ডেও তাহাই হইল। এই-ভাবে উনবিংশ শতাব্দী আসিয়া গেল।

১৮১৪ সালে সম্রাট নেপোলিয়ন সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হইয়া যান। ডেনমার্ক নেপোলিয়নের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে নরওয়ের উপর আধিপত্য হারাইতে হয়। আইসল্যাণ্ডবাসীরাও দাবী করিয়া বসিল যে, যেহেতু নরওয়ে ও ডেনমার্ক দুই পৃথক দেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে সেই জন্য ডেনমার্কের রাজা আর তাহাদের উপর আধিপত্য দাবী করিতে পারেন না। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। আইসল্যাণ্ডবাসীদের উপর নির্যাতন আরম্ভ হইল। আইসল্যাণ্ডবাসীরাও মরণ পণ করিল। এইভাবে টানাহ্যাচড়ায় প্রায় পঞ্চাশ বছর কাটিয়া গেল।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক জন সিগুরোসনের নেতৃত্বে আইসল্যাণ্ডে এক প্রবল বিদ্রোহ হয়। ডেন সম্রাট ইহা থামাইতে পারিলেন না এবং বাধ্য হইয়া আইসল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন। তবে সর্ত হইল এই যে, আইসল্যাণ্ডকে ডেন সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থান করিতে হইবে। প্রতিদানে ডেন মন্ত্রিসভার মধ্যে একজন আইসল্যাণ্ডবাসী মন্ত্রী থাকিবেন। সমস্ত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আইসল্যাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল।

১৯৪০ সালে জার্মানী-কর্তৃক ডেনমার্ক অধিকৃত হওয়ার ফলে আইসল্যাণ্ড ডেনমার্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কিছুদিন এক বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী আইসল্যাণ্ড অধিকার করিয়া রয়। তবে একা আইসল্যাণ্ড রক্ষা করা সম্ভব হইবে কিনা এই উদ্বেগে পড়িয়া বৃটিশ মার্কিণ দিগকেও ডাকিয়া আনে। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। ডেনমার্কও আইস-ল্যাণ্ড নামে মাত্র ফিরিয়া পাইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে আইসল্যাণ্ডের হর্তাকর্তা।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য

আইসল্যাণ্ডের প্রধান সম্পদ হইতেছে কড মৎস্য। এই মাছের তৈল পৃথিবীবিখ্যাত। এই ব্যবসাকে কেন্দ্র করিয়াই আইসল্যাণ্ডে বহু কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

আইসল্যাণ্ডে কোন খনি অথবা অরণ্য-সম্পদ নাই। কৃষিকার্য কিছু কিছু হইয়া থাকে।

আইসল্যাণ্ডে পক্ষাধিক বিভিন্ন রকমের পক্ষিপক্ষী পাওয়া যায়। ইহাদের দ্বারাও আইসল্যাণ্ডের কিছু কিছু অর্থ আসে।

ভাষা ও সাহিত্য

আইসল্যাণ্ডের নিজস্ব একটি ভাষা আছে। ইউরোপীয়ান ভাষাসমূহের মিশ্রণে এই ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। আইসল্যাণ্ডের সাহিত্য মোটেই দরিদ্র নহে। বহু ইউরোপীয়ান ও মার্কিন সাহিত্যিক আইস-ল্যাণ্ডের সাহিত্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া আইসল্যাণ্ডের পল্লীগাথাগুলি বড়ই মনোরম। ও হেনরী, কোনান ডয়েল, মেটার লিঙ্ক প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিকদের রচনায় আইসল্যাণ্ডের সাহিত্যের অনেক উপাদান আছে।

বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ আইসল্যাণ্ডের সাহিত্যকে খুবই সমৃদ্ধ করিয়াছে। প্রায় সকল ইউরোপীয় ও মার্কিন

গ্রীনল্যাণ্ডের প্রধান সহর জুলিয়ানেহাবের দৃশ্য। পশ্চাদ্ভিকে ৬-৮ হাজার ফুট উচ্চ পর্বতের স্তূপ দেখা যাইতেছে।

সাহিত্যিকদের রচনার অনুবাদ আইসল্যাণ্ডের সাহিত্যিক-গণ করিয়াছেন। অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, মহাত্মা

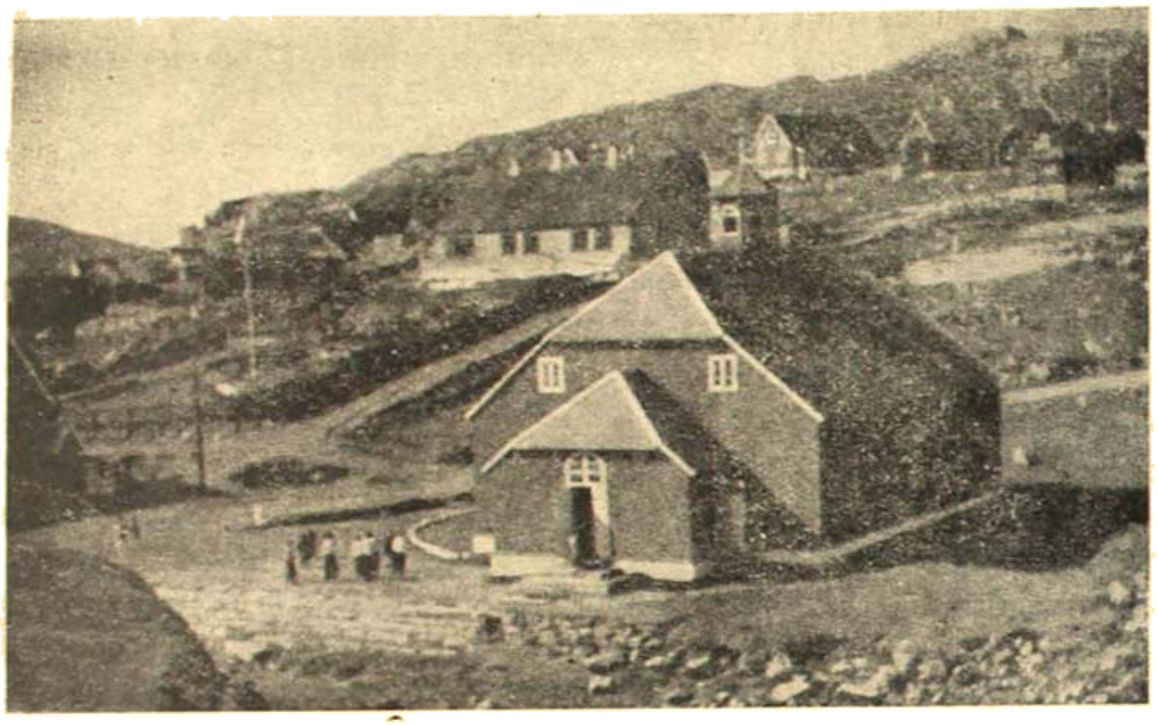

গ্রীনল্যাণ্ডের (গ্রীনল্যাণ্ড) নগরীর একটি দৃশ্য

গান্ধী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনীও আইসল্যাণ্ডের সাহিত্যিকগণ রচনা করিয়াছেন। সকল প্রকার বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকেরও অনুবাদ দ্রুতগতিতে আইসল্যাণ্ডের সাহিত্যে হইতেছে।

আধুনিক আইসল্যাণ্ড

আইসল্যাণ্ড আজ পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশেরই মত জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ। বড় বড় সহর, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, কলকারখানা, রেডিও, টেলিফোন, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি সব কিছুই আজ আইসল্যাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়।

আইসল্যাণ্ডের রাজধানী হইতেছে রেকজাভিক্। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। আইসল্যাণ্ডবাসীরা প্রায় সকলেই সহরে বাস করিয়া থাকে। অর্থাৎ লোক-বসতি সহরকে কেন্দ্র করিয়াই হইয়াছে। আইসল্যাণ্ডে শতকরা একশত জনই শিক্ষিত। নিরক্ষরতার অস্তিত্ব সেখানে নাই।

সকল দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে আইসল্যাণ্ড পৃথিবীর অন্যতম সুখশান্তিপূর্ণ দেশ। তবে তাহার উপরও শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।

গ্রীনল্যাণ্ড : ভৌগোলিক পরিচয়

গ্রীনল্যাণ্ড পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ দ্বীপ। ইহা আমেরিকার পূর্ব্বপ্রান্তের শেষ সীমায় অবস্থিত। গ্রীনল্যাণ্ডের আকৃতি অনেকটা ত্রিভুজের মত। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি হইল ৬৯০ মাইল। গ্রীনল্যাণ্ডের আয়তন ৭৩৬১৫৯৮ মাইল। তন্মধ্যে মাত্র ১৩১,৯২৪ মাইল অঞ্চলে লোক-বসতি হইতে পারে। বাকী সবটাই অর্থাৎ সমগ্র দেশের শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগই বরফাবৃত। গ্রীনল্যাণ্ডের বরফের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ইহার এক এক স্থানে বরফের স্তূপ দশ হাজার ফুটেরও অধিক।

গ্রীনল্যাণ্ডে বার মাসই প্রচণ্ড শীত। ইহার সর্ব্বনিম্ন আবহাওয়া ৯০ ডিগ্রী। উত্তর মেরু হইতে গ্রীনল্যাণ্ডের দূরত্ব মাত্র চারশত মাইল। এখানকার অধিবাসীরা ছয়ের ছয় মাসই সূর্য্য দেখিতে পায় না।

সীলমাছের মত একপ্রকার মাছ। উহাদের হাতীর মত দুইটী দাঁত আছে। আইসল্যাণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্র উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক পরিচয়

নবম শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম গ্রীনল্যাণ্ডের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। কিন্তু মধ্যজগৎ হইতে কেহ ঐ দ্বীপে তখন যায় নাই। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই লোকে গ্রীনল্যাণ্ডের কথা ভুলিয়া যায়। ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে নরওয়ের রাজা প্রথম পৃষ্টিয়ান ভাইডিক পিনিং নামক এক অসম সাহসিক নাবিকের নেতৃত্বে গ্রীনল্যাণ্ড আবিষ্কারের জন্য এক অভিযাত্রী বাহিনী প্রেরণ করেন। ঐ অভিযাত্রী বাহিনী ১৩৭৩

জাতীয় পোষাকে সজ্জিত আইসল্যাণ্ডের তিনটী বালিকা।

খৃষ্টাব্দে গিয়া গ্রীনল্যাণ্ডে হাজির হয়। কিন্তু তাহারা তথাকার স্থানীয় অধিবাসী এস্কিমোগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত

হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কারক কলম্বাস গ্রীনল্যাণ্ড যান। অনেকের মতে কলম্বাস পূর্ব্ববর্ত্তী অভিযানের খবর রাখিতেন।

অতঃপর বহু ইউরোপীয় অভিযানকারী গ্রীনল্যাণ্ডে যান। তবে তন্মধ্যে ডেনমার্কের অধিবাসীরাই অগ্রণী ছিল এবং তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম গিয়া গ্রীনল্যাণ্ডকে ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত করেন। অদ্যাবধি গ্রীনল্যাণ্ড ডেনমার্কের অধীনেই আছে।

গ্রীনল্যাণ্ডে বিশেষ কোন খনিজ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ নাই। তদুপরি কৃষিকার্য্যও সেখানে ভাল চলে না। এইজন্যই এই বিরাট দ্বীপ উপনিবেশে পরিণত হইতে পারে নাই।

গ্রীনল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা মাত্র ১৮৫০০শত। তন্মধ্যে ১৮ হাজারই এস্কিমো। বাকী প্রায় সকলই ডেন।

গ্রীনল্যাণ্ডেও স্কুল, চার্চ্চ, সহর, বন্দর এবং আমোদ-প্রমোদাদির ব্যবস্থা আছে। তবে উল্লেখ করিবার মত এমন কিছুই এখানে নাই। সম্প্রতি এই দ্বীপটির প্রতি মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের নজর পড়িয়াছে।

নন্-ভায়োলেন্স্

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

শকুন্তলার কুন্তলে ধরে ছোট ভাই দিল টান
কি-জানি কেন যে কিশলয় আজ হঠাৎ উঠিল রেগে
দিদির উপরে অতি ক্রোধভরে অহেতুক অভিমান
মারিবে বলিয়া—ধাইয়া আসিল বীরবর মহাবেগে।

কি জানি সহসা শকুন্তলার কোথা গেল আজ রাগ
ছোট বাহু দুটী বাড়াইয়া দিল স্নেহের অগ্রভাগ
সর্ব্বংসহা পৃথ্বীর মত ক্ষমা-সুন্দর রূপে
কচি কিশলয় সজল নয়নে ধরা দিল চুপে চুপে।

প্রশ্ন

শ্রীশীরেন রায়

পুলিশ কোর্টে ওকালতি করি, নিজের স্বার্থের খাতিরেই থানায় যাতায়াত করতে হয়, মাঝে মাঝে অবসর বিনোদনের জন্যও সন্ধ্যাবেলাটা থানায় বসে কাটাই। অর্থাগমের পথ সহজ করবার পক্ষে পুলিশ বিভাগের কর্মচারীদের সহযোগিতা তথা কৃপা (অবশ্য কৃপাবর্ষণ সর্ব্বক্ষেত্রেই মুদ্রাযোগ-সাপেক্ষ) আমাদের উকীলদের একান্ত কাম্য বস্তু। তাই পারমার্থিক আড্ডা দিতে গিয়ে আর্থিক দিকটা সুদৃঢ় করার দিকে রীতিমত নজর রাখি। কথার ফাঁকে ফাঁকে যথাসম্ভব ধর্ম বজায় রেখে খোসামোদের ডোজ দেই। বড় দারোগা থেকে আরম্ভ করে নায় কনেষ্টবলটি পর্য্যন্ত সবার সঙ্গে সমান হেসে কথা বলি, ফলাফলও যে কিছু না করেছি, তা নয়।

সে দিন বিকেলবেলা কোর্ট থেকে ফিরে এসে অন্য কোন জরুরী এন্‌গেজমেণ্ট না থাকায় থানার দিকেই পা বাড়ালাম।

গিয়ে দেখি সেখানে বেশ চাঞ্চল্যকর অবস্থা। থানার ছোট বড় সবাই অফিস-ঘরে এসে জমা হয়েছে। তাদের মুখ-চোখের ভাব দেখেই অনুমান করা শক্ত নয়, এমন কিছু একটা ঘটেছে যা একাধারে অভাবিত এবং বিস্ময়কর।

আমি ভিতরে ঢুকতেই চণ্ডীবাবু বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললেন—এই যে বিমলবাবু, আসুন। আপনাকে যে দেখিই না আজকাল! ব্যাপার কি?

আমিও তো ভাবছি—ব্যাপার কি। না হলে আমার দিন কয়েক অনুপস্থিতির জন্য দারোগা বাবুর এতটা উৎকণ্ঠার তো কোন বিধিসম্মত কারণ নেই। তবে কি আজকের কোন অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমার ক্ষণিক সৌভাগ্যের জন্য দায়ী।

দারোগাবাবুর আপ্যায়নকে রীতিমত সম্মান দেখিয়েই সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম।

আপনাদের সবাইকে যে আজ একটু un-official moodএ দেখছি, কিছু কারণ ঘটেছে নিশ্চয়ই।

"হ্যাঁ, কারণ আছে তো বটেই; তবে ব্যাপারটা আমাদের un-official moodএর চাইতেও বিস্ময়কর, —বেশ একটা রহস্যময় আবহাওয়া টেনে এনেই কথাটা শেষ করলেন চণ্ডীবাবু।

আমার কৌতূহল ঠেকিয়ে রাখতে পারছিলাম না, অথচ অনধিকারচর্চ্চার ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও কেমন বাধ বাধ লাগছিল। এমন সময় দারোগাবাবুই আমার কৌতূহল নিরাস করলেন। বল্লেন—আজ একটা dangerous criminal ধরা পড়েছে, বেশ পেতে হয়নি কিছুই, নিজেই surrender করেছে,—সঙ্গে সঙ্গে কৃতিত্বের সলজ্জ হাসি।

ওদের আস্তানা raid করেছিলেন বুঝি? মানে খুব ভারী ছিল কি? ওরা কোন রকম resist করেনি? —একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেলি। উৎসাহের আধিক্যে চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসি।

"না, ওরকম কিছুই করতে হয়নি। ও নিজেই থানায় এসে ধরা দিয়েছে। যাক আশ্বস্ত হওয়া গেল। পুলিশ নিজের কর্ম্মকুশলতায় সত্যিকার অপরাধী ধরেছে এ ঘটনা প্রচলিত বিশ্বাসের পরিপন্থী। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও যে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি তাতে আমি এক রোমহর্ষক বিবরণ থেকে বঞ্চিত হলেও আমার সত্যবিশ্বাসী মনটা অস্বস্তির হাত থেকে বেঁচেছে।

আমাকে নির্বাক্ দেখে চণ্ডীবাবুই বলে চল্লেন—কত শত লোক যে ওর হাতে প্রাণ হারিয়েছে তার ঠিক নেই। ধরবার জন্য কি পুলিস থেকে কম চেষ্টা করা হয়েছে মশাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকবারেই কলকে পালিয়েছে।

কিন্তু আজ হঠাৎ নিজে এসে ধরা দিল কেন? —যে কথাটা মনে মনে এতক্ষণ আওড়াচ্ছিলাম তাই বলে ফেলি।

দারোগাবাবু মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়ে বল্লেন—তার কারণ কি মনের অবস্থা হয়

কিছু কি বলা যায় বলুন। মানুষের এক বিচিত্র জগৎ। criminologyতে তো এ রকম ঘটনার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে একই কারণ বর্তমান তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এমন দেখা গেছে যে—

অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠ নিতে মনের আদৌ সম্মতি পাচ্ছিলাম না। বরং যে সাংঘাতিক গুণ্ডাটা কোন এক অজ্ঞাত মানসিক অবস্থার প্রেরণায় স্বেচ্ছায় এসে পৃথপ পরেছে তাকে দেখবার জন্যই মনটা ছটফট করছিল। তাই দারোগাবাবুকে অর্ধপথে থামিয়ে দিয়েই বললাম—চালান করে দিয়েছেন নাকি?

না এখনও এখানেই আছে। দেখবেন?

সানন্দে সায় দিলাম দারোগাবাবুর কথায়, চললাম তাঁর সঙ্গে হাজত-ঘরের দিকে।

হাজতের সামনে এসে দেখলাম অন্ধকারের ভেতর হাঁটু মুড়ে মাথা কুঁকে বসে আছে একটি লোক। মাথার চুলগুলো তৈলবিহীন অবস্থায় ওট পাকিয়ে আছে।

দরজা খোলার শব্দে মাথা সোজা করে তাকাল আমাদের দিকে। বারান্দার আলোর কিছুটা অংশ এসে পড়েছে ঘরের ভেতর, সেই আলোতেই দেখলাম dangerous criminalকে। মানুষের চোখ দেখেই নাকি চরিত্র অনুধাবন করা যায়; কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টিতে ভয়াবহ কিছু খুঁজে পেলাম না। দৃষ্টিটা যেন বড় ক্লান্ত, অবসন্ন। অনেক দূরের যাত্রী, যাত্রাপথের মাঝখানেই যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে, বিশ্রামের আশায় আশ্রয়-প্রত্যাশী।

কপালের উপর আড়া-আড়িভাবে একটা শুকনো ক্ষতের দাগ। তার অমানুষিক নিষ্ঠুর জীবনযাত্রার প্রতীক। লোকটা সত্যিই criminal তার ঐ ক্ষত চিহ্নের মত নিষ্প্রভ চোখ দুটিও রাতের অন্ধকারে নিরীহ পথিকের প্রাণনাশের জন্য অমনি উদ্‌গ্র হয়ে উঠত। পেশীবহুল হাতের নিষ্পেষণে চিরকালের মত স্তব্ধ করে দিত তাদের আর্তনাদের ভাষা! কত শত লোকের জীবননাশে ওর হাত কলঙ্কিত কে জানে।

ভাবছি আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি ওর সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে। চেহারা দেখে বয়স বোঝবার উপায় নেই। হয়তো পঁচিশ নয়তো পঁয়তাল্লিশ। স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে মনে হয় ওর যৌবনের অধ্যায় এখনও চলেছে। আবার মুখমণ্ডলের কুঞ্চিত রেখাগুলোর ভেতরে মনে হয় অনেক বছরের পদচিহ্ন আঁকা রয়েছে।

কি ভেবে ও উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে এগিয়ে এল দরজার সামনে। দারোগাবাবুকে একটু বিচলিত মনে হয়। কিন্তু ওটা অমূলক, যে স্বেচ্ছায় ধরা দেয় সে আর পালিয়ে যায় না।

আলোতে ওকে আরও স্পষ্ট করে দেখলাম—সমস্ত অবয়বের মাঝে ওর দেহমাত্র ছাপও নেই। একটা অদ্ভুত কাঠিন্য দিয়ে গড়া সারা দেহটা। রণক্লান্ত সৈনিকের সব অবসাদ এসে জড় হয় শুধু ওর ঐ ক্লিষ্ট চোখ দুটিতে। নির্ভয়, কিন্তু শ্রান্ত।

দারোগাবাবু আমাকে ইসারায় জানিয়ে দিলেন আমার দেখবার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। নিছক কৌতূহল বশেই জিজ্ঞেস করলাম—তোমার নাম কি?

স্পষ্ট বাংলায় উত্তর করলে—বংশী

যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালাম—বংশী!

অনেকদিনের এক বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা হঠাৎ অবচেতন মনের রুদ্ধদ্বার খুলে বেরিয়ে এল, হ্যাঁ, ঠিক এমনি করেই আমাকে বলেছিল। তবে একটা পরিষ্কার বাংলায় নয়, আধ বাংলা আধ হিন্দিতে বলেছিল—বন্‌সি।

চোখের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওর দিকে তাকালাম। ওর ঐ ক্ষতচিহ্নিত মুখের পাশে ভেসে উঠল আর একখানি মুখ। তার চোখের গোড়ায় ছিল ভবিষ্যতের আশার উজ্জ্বলতা—মুখমণ্ডলে ছিল স্নিগ্ধতার প্রলেপ—সারা শরীরে ছিল কৈশোরের কোমলতা। কুড়ি বছর পৃথিবীর বাস্তবতার বিষাক্ত হাওয়া লেগে রূপান্তর ঘটেছে। আশার উজ্জ্বলতা নেই, আছে ব্যর্থতার নৈরাশ্য, স্নিগ্ধতা হারিয়ে মুখে চোখে ফুটে উঠেছে নিষ্ঠুর প্রতিশোধস্পৃহা, কৈশোরকে অনেক দূরে ফেলে রেখে যৌবনকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে প্রৌঢ়ত্বের বর্বরতা।

প্রায় কুড়ি বছর আগেকার ঘটনা। সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছি। ওকালতি পড়বার ইচ্ছা, অথচ আর্থিক সামর্থ্যে কুলোচ্ছে না। ভাবছি একটা কোন রকম চাকুরী যোগাড় করে রাত্রে ক্লাশ করব। এই আশাতেই ডালহাউসি অঞ্চলে যাতায়াত করতে লাগলাম, আর প্রায় বারগা থেকেই No vacancyর ধাক্কায় ফিরে আসতে হ'ল।

ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে গোলদিঘীর বেঞ্চে গিয়ে বসি। মুচড়ে পড়া মনটাকে আবার চাঙ্গা করে নেবার চেষ্টা করি। হাতের খবরের কাগজটা খুলে কর্মখালি বিজ্ঞাপনটার উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নেই।

এমনি একদিন দুপুরে পাম গাছের নীচেকার এক বেঞ্চে বসে, সবে পেপারটা খুলে নিয়ে বসেছি, কানে এল—সু-সেন বাবু!

পেপার থেকে দৃষ্টি তুলতেই দেখি একটি বছর সাতেকের ছেলে। ময়লা একখানা কাপড় পরা। খালি গা। হাতে ছোট্ট একটি কাঠের বাক্স, তার ভেতরে জুতা বুরুশ করার সরঞ্জাম। এ পাড়ায় ওদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ওরা দলবদ্ধ হয়ে বসে থাকে ধূলিমলিন পাদুকাযুগলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনতে। তাই ব্যক্তিনির্বিশেষে সবাইকে ডেকেই বলে—সু-সেন বাবু—Soee Shineএর অপভ্রংশ।

ওর ডাকে কোন আগ্রহ না দেখিয়েই আবার কাগজের পাতার দিকে চোখ নামিয়ে নিলাম।

ছেলেটি কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তাকিয়ে দেখলাম আমার কালিবিহীন জুতাজোড়ার দিকে ওর দৃষ্টি আবদ্ধ নয়, ওর আকর্ষণীয় বস্তু আমার কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার একটা কার্টুন। দলের আর সব ছেলেদের বারবার ডাকা সত্ত্বেও ও দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলেটির দিকে এবার একটু খোলাখুলি ভাবেই তাকালাম। দেখলাম চেহারাটা ঠিক রাস্তার ছেলেদের মত নয়। মুখের ঘরের ছাপ বেশ পরিস্ফুট। যদিও রোজগারের জন্য পথে বেরিয়েছে তবুও কৈশোরের চপলতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই অর্থপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা না থাকলেও তার আকর্ষণ ছাড়তে পারে নি ছেলেটা।

কেমন একটু মায়া হ'ল। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম আনা তিনেক পয়সা আছে। জুতোটা একবার রং করে নিলে হয়। কেনার পরে আর কালীর মুখ দেখেছে বলে তো মনে পড়ে না।

জিজ্ঞেস করলাম—Polish করতে কত নিবি রে?

ছেলেটি হয় তো অন্য কিছু ভাবছিল। কথাটা কাণে যেতেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দিল—ছে পয়সা বাবু।

ছয় পয়সা কি রে! চার পয়সা পাবি।

আর কোন কথা না বলেই ওর সরঞ্জাম নামিয়ে নিল। সযত্নে আমার জুতাশুদ্ধ একটা পা তুলে নিল ওর কাঠের বাক্সটার উপরে। নিপুণতার সঙ্গে অবয়বসঞ্চিত ময়লা তুলে ফেলতে লাগল।

আমিও চার পয়সার বিলাসিতা পরিপূর্ণ ভাবেই উপভোগ করতে লাগলাম। ভাবলাম ছেলেটির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে সময়টা কাটালে মন্দ হয় না।

—তোর নাম কি রে?

—বন্সী।

—তোর আর কে আছে?

—মা আছে, বাপ আছে।

প্রশ্ন করে করে অনেক কথাই ওর জেনে নিলাম। ওর বাপ জুতা সারাই করে, কিছুদিন হল তার অসুখ, খুব নাকি কাশি হয়। তাই আজকাল ঘরেই শুয়ে থাকে। ওর মা পাঁপর বেলে আর ও নিজে পথে পথে জুতো বুরুশ করে বেড়ায়। এতেই বংশীদের সংসার কায়ক্লেশে চলে। বংশীর বাপের ইচ্ছে নয় ছেলে পথে ঘাটে রোজগারের জন্য ঘোরে, তাই ওর বাপ সেরে উঠলেই ও আবার ইস্কুলে ভর্তি হবে।

—আমারও খুব পড়তে সাধ হয় বাবু, আচ্ছা বাবু যারা কেতাব লেখে তারা বুঝি অনেক পড়ে?

—হ্যাঁ, তা বৈকি, অনেক না শিখলেই কি আর লিখতে পারে? তুমি যদি অনেক লেখ তা হলে তুমিও

লিখতে পারবে,—"তুই" থেকে কখন যে "তুমি" হয়ে গেছে, নিজেই টের পাইনি।

—আমিও অনেক শিখব বাবু।

তখনও সংসার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করি নি, যদিও চাকরির উমেদারী করে কিছুটা বাস্তব জ্ঞান পেয়েছি এবং পাচ্ছি, তবু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে তা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর. তাই বংশী যে লেখাপড়া শিখে কালক্রমে পণ্ডিত ব্যক্তি হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। প্রতিভার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী এ কথা তখনও আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। ওকে উৎসাহিত করার জন্যই শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে ওর কাছে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেলাম।

বংশী আমার সহানুভূতি পেয়ে, অনেকটা সহজভাবেই কথা বলতে লাগল।

—আমাদের পাড়ার আর সব ছেলেরা পড়াশুনা করে না বাবু, মা তাদের সাথে মিশতে মানা করে দিয়েছে, ওরা ভাল না বাবু, লোকের জিনিস চুরি করে নেয়, চুরি করা তো পাপ, পাপ করলে কেউ বড় হ'তে পারে না, তাই না বাবু?

অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম বংশীর দিকে। যে শিক্ষা ও পেয়েছে আর যে বিশ্বাস ওর নিষ্পাপ অন্তরে দানা বেঁধেছে তার কাছে সব উৎসাহবানীই তুচ্ছ।

ছেলেটার মা-বাবা সত্যিই শ্রদ্ধার্হ। অভাব-অনটনের মধ্যেও ছেলের ভবিষ্যতের কথা তারা ভোলেনি।

বংশীর পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বললাম—হ্যাঁ, বংশী তুমি ঠিকই বলেছ, অন্যায় ক'রে কেউ বড় হ'তে পারে না। লেখাপড়া শিখলে, সত্য পথে চললে তবেই লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করা যায়।

সব কথার অর্থ বংশী না বুঝলেও ভবিষ্যতের সফল স্বপ্নের আনন্দে ওর দৃষ্টি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বংশী কি জানি কেন হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল—আচ্ছা বাবু, লোকে চুরি করে কেন?

অদ্ভুত প্রশ্ন যা হোক। এর সহজ উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই কোন রকম ক'রে বংশীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে, দুষ্ট লোকের ও একটা স্বভাব। চুরি করাও একটা রোগবিশেষ। বংশী আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েই চ'লে গিয়েছিল।

মাসখানেক পরে বংশীর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল। বংশী আমাকে পেয়ে মহা খুশী। আমাকে প্রথমেই তার ইস্কুলে ভর্তি হবার সংবাদ জানালে। আরও জানালে, তাকে আর রোজগার করতে যেতে হয় না। বাপ তার সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও, এক রকম কাজ চালিয়ে নেয়।

বংশী আমাকে জোর ক'রেই ওদের ঘরে নিয়ে চলল।

ওর মা রাস্তার উপর ব'সেই কাঠের পিঁড়ি পেতে পাপর বেলছিল। আর রাস্তার বিছান একটা চটের উপরে সেগুলো রৌদ্রে দিচ্ছিল। বংশী বলল—মা, বাবুজী। বুঝলাম আমার কথা বংশী তার মাকেও বলেছে। মনে মনে অনেক যে না পেলাম তা নয়।

বংশীর সাথে ওর ঘরে ঢুকলাম। ঘরটি অতি খোলার। তার ভেতরেও যথাসম্ভব গোছগাছ করা। একপাশে একটা প্যাকিং বাক্সের উপরে খানকয়েক বই সাজান। দেয়ালের গায় কয়েকখানা ছোট ছোট পেন্ট বোর্ডের উপরে কালো কালো দিয়ে বাঁকাচোরা অক্ষরে লেখা—চুরি করা মহা পাপ; সদা সত্য কথা বলিবে; পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে। কিশোর তপস্বীর সাধন-পীঠ।

মনে মনে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানালাম এই নীরব সাধককে। প্রার্থনা করলাম শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে এই তাপস বালকের পূজা গ্রহণ করতে, সিদ্ধির বরমাল্য এই তরুণ বিদ্যার্থীর কণ্ঠে। হয়ত এই খোলার বস্তির ভাঙ্গা ঘরের ভেতর থেকেই ভবিষ্যত ভারতের এক মহাজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটবে। তপস্যার সিদ্ধিলাভ ক'রে ঐ হরিজন বালকই একদিন ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবে।

আনন্দের আতিশয্যে বংশীকে জড়িয়ে ধরলাম বুকের ভেতরে। আবেগ-বিহ্বল স্বরে বললাম—বংশী আশীর্বাদ করি, তোমার আকাঙ্ক্ষা সফল হ'ক তোমার জ্ঞান-পিপাসী মাতাকে যেন জাগিয়ে তুলতে পার।

বংশীদের ঘর থেকে আনন্দান্বিত অন্তরে বেরিয়ে এলাম। মেসে ফিরে এসে বন্ধু-বান্ধব অনেকের কাছেই আমার এই আবিষ্কারের সম্পর্কে বর্ণনা করলাম।

তার পর অনেকদিন বংশীদের ওদিকে আর যাওয়া হয়নি। চাকরী আর পড়া—দুটো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছিলাম। একদিন যেয়ে বংশীর সাধনার ক্ষেত্র দেখে আসব ভেবেছি, নানা কাজে আর হয়ে ওঠেনি।

ট্রামে যেতে যেতে একদিন দেখি বংশী ফেরি ক'রে মনোহারী জিনিষ বিক্রী করছে। তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম ট্রাম থেকে। কাছে যেয়ে দেখি বংশীর চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। এই কয়েক মাসেই হয়ে গেছে অনেক রোগা আর লম্বাটে। মুখের সেই কমনীয়তা আর নেই, কেমন একটা রুক্ষ ভাব। ডাকলাম—বংশী।

বাবুজি!—গলার স্বরে চপল উৎসাহলেশ নেই, আছে গম্ভীর বেদনার ছাপ। ওর মত বয়সে যা অত্যন্ত বেমানান।

বংশী আমার দিকে ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিস্তেজ কণ্ঠে বলল—বাবুজি, বাবা ম'রে গেছে। মা'ও খুব বেমারিতে ভুগছে। তাই এই ফেরি করছি। চুরি জুচ্চুরির চাইতে তো ভাল।

আমি ওর কাছে বেশী কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম, তাই কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গীতেই শেষের কথাটুকু বলল।

বংশীর লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস করতে আর সাহস হ'ল না। একটা কিছু বংশীর কাছ থেকে কিনে দৌড়ে ট্রামে উঠলাম, দেখলাম না যা কিনলাম ওটা দরকারী কি অ-দরকারী।

ট্রামে উঠে মনটা বড় খারাপ লাগতে লাগল বংশীর জন্য। অভাবের তাড়নায় ছেলেটার সমস্ত ভবিষ্যতটা নষ্ট হয়ে গেল।—কিন্তু আশ্চর্য্য চুরি করা মহাপাপ, এ সত্য ও আজও বিশ্বাস করে।

এখনও করে কি? না, এখন আর বিশ্বাসের অস্তিত্বও ওর মনের ভেতর নেই।

প্রথম দিনের প্রশ্ন ও আজ আর কারও কাছে করবে না। নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়েই ও প্রশ্নের সদুত্তর পেয়েছে। ও বুঝতে পেরেছে, এক অদৃশ্য পরিণতির টানেই লোকে হয় চোর, গুণ্ডা, খুনে। কিন্তু যারা এই পরিণতির সৃষ্টিকর্ত্তা তাদের সন্ধানও কি বংশী পেয়েছে।

হয়তো পেয়েছে। সমাধানের পথ ভুল ক'রে এতদিন গোলক-ধাঁধাঁয় ঘুরেছে তাদেরই হাতের পুতুল হয়ে। তাদের আঘাত করবার শক্তি বংশী আজ হারিয়ে ফেলেছে। তাই বোধ হয় চরম পরাজয়ের গ্লানি লুকাতে আশ্রয় নিয়েছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

সেখান থেকেই ও প্রতীক্ষা করবে সেই দিনের জন্য, যেদিন ওর মত শত শত বংশী রাতের অন্ধকারে নিরীহ পথিকের সর্ব্বস্ব ছিনিয়ে নেবার জন্য হিংস্র দৃষ্টি মেলে শুঁৎ পেতে ব'সে থাকবে না—তারা আসবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে, বিচার দাবী ক'রবে সেইসব ঘৃণ্য পশুদের—যারা অভাবের সুযোগ নিয়ে বংশীদের সাধনা ব্যর্থ ক'রে দেয়, নামিয়ে নিয়ে আসে আবর্জ্জনাময় ক্লেদাক্ত জীবনযাত্রার মাঝে।

P30235

বউঠাকুরাণীর হাটে—সুরমা

শ্রীনন্দিতা গুহ, বি-এ

বউঠাকুরাণীর হাটের চরিত্রগুলির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সূচনায় বলিয়াছেন—"প্রাচীর ঘেরা মন যেমনি পরের বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তাঁর লেখনী গল্পরাজ্যে নূতন ছবি নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা দিল বউঠাকুরাণীর হাট গল্পে—একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে··· চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের বর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিষ একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে।" সুরমা-চরিত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে, সুরমা পতিগতপ্রাণা রমণীর প্রতিমূর্তি, কিন্তু সুরমা ভীরু নয়—যে প্রতাপাদিত্যকে সকলে ভয় করিয়া চলিত তাঁহাকেও সুরমা স্পষ্ট কথা বলিতে পেছপা হন নাই। সুরমা পতিগতপ্রাণা হইয়াও স্বামীকে সর্বদা নিজের আঁচলের তলায় লুকাইয়া রাখিতেন না, তাহাকে বিপদের মুখে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুরমার চরিত্র অনবদ্য। প্রতাপাদিত্য-চরিত্র একটি পিশাচ-চরিত্র, দয়ামায়ার লেশমাত্র নাই, নিষ্ঠুর, অহঙ্কারী, যদমেজাজী, বসন্তরায়ের সন্তানবৎসল স্নেহপরায়ণ হৃদয়সত্তা চরিত্র, উদয়াদিত্যের অন্তিমের কোমল ও স্নেহপ্রবণ হৃদয়, রামচন্দ্র রায় লঘু ও সঙ্কীর্ণমনা লোভী, কিন্তু ভ্রাতৃবৎসল, স্নেহপরায়ণা রমণী। এমন প্রতিটি চরিত্রই একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে। মনে হয় সুরমাচরিত্র পুতুলের বর্ম ছাড়াইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, সুরমা-চরিত্রে সাহসিকতা ও নম্রতা দুইটী গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে। এই পুস্তকের প্রতিটি চরিত্র প্রতাপাদিত্যের ভয়ে ভটস্থ, বৃদ্ধ বসন্ত রায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতাপের মহিষী বিভা সকলেই প্রতাপাদিত্যের ভয়ে যাহা কর্তব্য কর্ম তাহা করিতেও ভয় পাইয়াছে, একমাত্র সুরমাই যাহা ন্যায় বলিয়া জানিয়াছে তাহা হইতে বিচ্যুত হয় নাই আবার তাহার চরিত্রে নম্রতার অভাব নাই। যাশুড়ী ও রাজবাটীর দাসী যখন তাহার বিরুদ্ধে কটুকথা বলিয়াছে তখন সে নীরবে সে কথা সহ করিয়াছে স্বামীর মুখ চাহিয়া। এখানে তাহার নম্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হই এখানেই সুরমা-চরিত্র মানব বলিয়া মনে হয়, বাংলা দেশের মেয়ে যত দুর্ধর্ষ হউক না কেন, শাশুড়ী-ননদের বাকাবাণ তাহারা চিরদিন নীরবে সহ্য করে।

সুরমা যদিও যশোহরপতির পুত্রবধূ ছিল, তবুও সে কোন সম্মানই রাজবাটীর কাহারও নিকট হইতে পায় নাই। শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাকে মোটেই স্নেহ করিতেন না কিন্তু ইহাতে সুরমার একটুও দুঃখ ছিল না, স্বামীর ভালবাসায় তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ ছিল। কিন্তু তাঁহার স্বামী উদয়াদিত্যের জীবনেও সুখ ছিল না, পিতা তাঁহাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন না, রাজসভার সভাসদগণ তাঁহাকে একপ্রকার কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন। স্বামীর দুঃখ দূর করিতে পারে না বলিয়াই সুরমার একমাত্র দুঃখ,না হইলে শাশুড়ী যে তাহাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিতেছেন, দাসদাসীরা পর্যন্ত তাহাকে মানে না, তাহাতে রাজার মেয়ে রাজবধূ হইয়াও তাহার কোন দুঃখ নাই। স্বামীর জন্য সমস্ত দুঃখই সে হাসিমুখে সহ্য করিত। দুর্বল স্বামীকে সে বলীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই উদয়াদিত্য আত্মীয়-স্বজনের উপেক্ষা দর্শন করিয়া নিজেকে তাহার নির্বোধ ও ভীরু মনে হইত। কোন কাজ করিতেই তিনি সাহস পাইতেন না। যে যেরূপ ব্যবহার করিত তাহাই যুবরাজ সহ্য করিতেন। সুরমাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার জীবনের অন্ধকার দূর হইল, যুবরাজ তাই উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছেন—"এতদিনের পর আমি যথার্থ-ই আশ্রয় পাইলাম। তোমার কাছে প্রথম শুনিলাম যে, আমি নির্বোধ নই, তাহাই বিশ্বাস করিলাম, তাহাই বুঝিতে পারিলাম। এতদিনের পরে আমার মনে হইল আমি কিছু, আমি কেহ। এতদিন আমি অগোচর ছিলাম, তুমি আমাকে বাহির করিয়াছ, সুরমা তুমি আমাকে আবিষ্কার করিয়াছ, এখন আমার মন যাহা ভাল বলে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমি সাধন করিতে চাই।"

স্বামীকে এমনভাবে বশীভূত করিতে কয়জন রমণী পারে। অন্তঃপুরে থাকিয়া তাঁর স্বামীকে বশীভূত করা সোজা কথা নয়। সুরমা নিঃশেষে নিজেকে স্বামীর জন্য বিলাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীকে বিপদের মুখে অগ্রসর হইতে বাধা দেন নাই,বরং তাহাকে কর্ত্তব্য কার্য্যে সর্ব্বদাই উৎসাহ দিয়াছেন। বসন্ত রায়ের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এক মুহূর্ত্তের জন্য না ভাবিয়া স্বামীকে কর্ত্তব্য কার্য্যে পাঠাইয়াছেন। ভগবানে তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাহার হৃদয়ে এইটুকু বল ছিল যে সংসারে যাহার কেহই সহায় নাই, নারায়ণ তাহার অধিক সহায়।

সুরমার দুর্ভাগ্য যে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাকে কোনদিন ভালচোখে দেখেন নাই। যে প্রতাপাদিত্য মেয়েদের বিষয়ে নিতান্ত আনাড়ি ছিলেন, তিনিও সুরমার পিতার উপর রাগ করিয়া তাহার সম্বন্ধে সর্ব্বদা অকথ্য বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেন। তাঁহাদের ধারণা সুরমাকে বিবাহ করিয়াই উদয়াদিত্য অধঃপাতে গিয়াছেন। উদয়াদিত্য যে কাজই করিয়াছেন, তাহার জন্য দোষ দিয়াছেন শ্রীপুরের ভট্টাচার্য্যের মেয়েকে অর্থাৎ সুরমাকে। শাশুড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজবাটীর দাসীগুলি পর্য্যন্ত সুরমার মুখের উপর তাহার বংশের খোঁটা দিয়াছেন, এমন কি রাক্ষসী বলিতেও দ্বিধা করেন নাই। প্রতাপমহিষী প্রতাপাদিত্যের উগ্রক্রোধ হইতে পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য পুত্রবধূর স্কন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়াছেন। পুত্রবধূও যে তাঁহার কন্যাতুল্য সে কথা একবারও ভাবেন নাই। উদয়াদিত্যের নিকট সুরমার নিন্দা করিয়া মন ভাঙাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শাশুড়ী পর্য্যন্ত মহিষীর প্ররোচনায় রাজপুত্র-বধূকে অপমান করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। সুরমা স্বামীর জন্য সমস্ত দুঃখ-বেদনা নীরবে সহ্য করিয়াছেন। স্বামীর ভালবাসাই তাঁহাকে দুঃখ-বেদনা বহন করিবার শক্তি দিয়াছে। এত দুঃখ-বেদনায় সুরমা কোনদিনই কাতর হন নাই, রাজপুরীতে তিনি হাসিমুখে বাস করিতেন এবং রাজপুরীর প্রত্যেকটী জনপ্রাণীকেই তিনি ভাল বাসিতেন। ননদিনী বিভার প্রতি তাহার স্নেহ ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হই। বিভার দুঃখ সুরমা যেমন বুঝিয়াছিলেন এমন তাহার মাতাপিতাও বোঝেন নাই। বিভার মুখ একটু মলিন হইলেই অমনি সুরমা তাঁহার কাছে আসে, তাহার গলা ধরে, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সুরমার চেষ্টাতেই বিভার স্বামী রামচন্দ্র রায় যশোহরে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ননদিনীর বেদনা দূর করিবার জন্য সুরমা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। সুরমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও দূরদর্শী ছিল। রামচন্দ্র রায় যখন প্রতাপাদিত্য রায়ের রোষাগ্নিতে পড়িয়াছিল তখন সুরমা যে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়াছিল তাহা অপূর্ব্ব। রামচন্দ্র রায়কে রক্ষার জন্য বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য, বিভা প্রভৃতি যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে রামচন্দ্র রায় রক্ষা পাইতেন না। সুরমা যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাহা অপূর্ব্ব। প্রতাপাদিত্য রায়ের স্বভাব তিনি ভালরূপে বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে পরামর্শ দিয়াছিলেন—"আমাদের এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে যে—কোন ফল হইবে তাহা তো বোধ হয় না, বরং উল্টা। পিতা যতই বাধা পাইবেন ততই তাঁহার সঙ্কল্প আরো দৃঢ় হইবে। আজ রাত্রেই কোন মতে প্রাসাদ হইতে পালাইবার উপায় করিয়া দাও।"

সুরমার এ পরামর্শে যে কতদূর সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায়ের কথোপকথনেই বুঝিতে পারা যায়। প্রতাপ লছমন সর্দ্দারকে রামচন্দ্র রায়ের মুণ্ড আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন, বসন্ত রায় গিয়াছিলেন প্রতাপকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে। কিন্তু ইহাতেই হিতে বিপরীত হইল, বসন্ত রায়ের অনুরোধ শুনিয়া প্রতাপের সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইল, একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রতাপের মনে হইয়াছিল লছমন সর্দ্দারকে ফিরিয়া ডাকিবেন কিন্তু বসন্ত রায়ের অনুরোধ শুনিয়া সে সঙ্কল্প তৎক্ষণাৎ মন হইতে দূর হইয়া গেল। সুতরাং মনে হয়, সুরমা যদি এই পরামর্শ না দিত তবে রামচন্দ্র রায়ের নিস্তার ছিল না প্রতাপের রোষাগ্নিতে তাহার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইত। রামচন্দ্র রায়ের প্রাণ

রক্ষার জন্য স্বামীকে সুরমা দৃঢ়তার সহিত পাঠাইয়াছেন একমাত্র ভগবানের উপর তাহার ভরসা। যখন রামচন্দ্র রায়কে বাঁচাইবার অন্য কোন উপায় ছিল না, তখন বিভা বলিয়াছিল যে, রামচন্দ্র রায়কে সে ঘর হইতে বাহির হইতে দিবে না, রামচন্দ্র যেখানে যাইবে তাহার আগে আগে বিভা যাইবে। উদয়াদিত্যও বলিল, "আমাকে বধ না করিয়া কেহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" সুরমা কিছু বলিল না, বৃথা বাক্যব্যয় সুরমা করে না, সে স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীকে কর্ত্তব্য কার্য্যে সুরমা নিজে পাঠাইয়াছেন, রামচন্দ্র রায় রক্ষা পাইলে স্বামীর বিপদের কথা ভাবিয়া তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাঁদিবার সময় নাই, তাহা হইলে বিভা দুঃখিত হইবে। সুরমার ধৈর্য্যশীলতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। স্বামীর বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, তবুও স্থির ভাবে সে বিভার সেবা করিতেছে। সুরমার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আস্তে আস্তে মুছিয়া ফেলিল, পাছে বিভা জানিতে পায়। যে বিভাকে সুরমা প্রাণের সহিত ভালবাসিত, সেই বিভার নিকট সুরমা সম্বন্ধে রাজমহিষী যে বক্তব্য করিয়াছেন তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। "তিনি (প্রতাপের মহিষী) স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন সুরমা ছিনো করিয়া বিভার চুল বাঁধা খারাপ করিয়া দিয়াছে। সুরমার হীন উদ্দেশ্যের প্রতি বিভার চোখ ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন।" শুধু তিনি নন, রাজবাটীর দাসীর তাহার সম্বন্ধে ধারণা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাতক দাসী সুরমা সম্বন্ধে বলিয়াছে—"তিনি (সুরমা) আমাদের দিদি-ঠাকরুণের নামে আমাইয়ের কাছে কি সব লাগাইয়াছিলেন, তাই আমাই রাতারাতিই দিদি-ঠাকরুণকে ফেলিয়া চলিয়া গেছেন।" এই সমস্ত বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে সুরমার প্রতি মন মমতায় ভরিয়া ওঠে, যে বিভাকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসিত যাহার জন্য প্রিয়তম স্বামীকে বিপদের মধ্যে পাঠাইয়া দিল, তাহার এত বড় বিশ্বাট দুরভের পরিচয় রাজবাটীর কেহই পাইল তাহাকে কেহই কোন সহায়তা দিল না, যাবজ্জীবন সে লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই ভোগ করিয়া গেল।

সুরমা নিজেকে দিয়া উদয়াদিত্যকে চাহিয়া রাখিতে চায়। উদয়াদিত্য যে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন সে-গুলি প্রায় সমস্তই তাহার পিতার বিরুদ্ধে। অথচ সে সমস্ত কার্য্য সমস্তই তাহার পিতার কর্ত্তব্য কর্ম। সুরমার মত স্ত্রী বলিয়াই উদয়াদিত্য নিষ্ঠুর পিতার বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য কর্ম করিতে সাহস পাইয়াছিলেন। সুরমার মৃত্যুর পর উদয়াদিত্যের সৎকার্য্য করিবার মত মনের সাহস আর ছিল না। বিপদকে তৃণজ্ঞান করিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে এখন আর পারেন না। সকল কাজেই ইতস্ততঃ করেন, সকল বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হয়। সুরমা ছিল তাহার সমস্ত সৎকার্য্যের সহায়। সুরমা বলিতেন—"তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না, আমি সমস্ত করিব। আমার উপর ভার দাও।" স্বামীকে কর্ত্তব্য কর্ম হইতে সুরমা কখনই নিরস্ত করেন নাই, সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মে যত বিপদই থাকুক না কেন। সুরমা তেমন স্ত্রী নহে। স্বামী যখন ধর্ম্মযুদ্ধে যান, তখন সুরমা নিজের হাতে বর্ম বাঁধিয়া দেন, তাহার পর ঘরে বসিয়া তিনি (সুরমা) কাঁদেন। সুরমার প্রাণ প্রতিপদে ভয়ে আকুল হইয়াছে, অথচ উদয়াদিত্যকে সে প্রতিপদে ভরসা দিয়াছে। উদয়াদিত্য ঘোর বিপদের সময় সুরমার মুখের দিকে চাহিয়াছেন, দেখিয়াছেন সুরমার চোখে জল, কিন্তু সুরমার হাত কাঁপে নাই, সুরমার পদক্ষেপ অটল। আদর্শ স্ত্রী যেরূপ হওয়া উচিত, সুরমার চরিত্র আলোচনা করিলে মনে হয় ঘরে ঘরে এমন স্ত্রীই পুরুষের দরকার। স্ত্রী শুধু বিলাসের দ্রব্য নয়, দুঃখের সময়ই স্ত্রীর একান্ত দরকার। সুরমাও এই কথা বলিয়াছেন—"এই সময়েই তো (দুঃখের সময়) সুরমাকে আবশ্যক। সুখের সময় আমি তোমার কি করিতে পারিতাম। সুখের সময় সুরমা বিলাসের দ্রব্য, খেলিবার জিনিষ। সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া আমার মনে এই সুখ জাগিতেছে যে, আমি তোমার কাজে লাগিতেছি, তোমার জন্য দুঃখ সহিতে যে অতুল আনন্দ আছে, সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছি। কেবল দুঃখ এই, তোমার সমুদয় কষ্ট কেন

আমি বহন করিতে পারিলাম না।" বিধাতা সুরমার কপালে সেই সুখটুকুও কাড়িয়া লইলেন—উদয়াদিত্য হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য শ্বশুর-শাশুড়ী দুই-জনেই একমত, তাহাদের ধারণা—সুরমাই উদয়াদিত্যকে পরামর্শ দিয়া নষ্ট করিতেছে। যদিও সুরমা উদয়াদিত্যকে পরামর্শ দিয়াছিল কিন্তু সে কোন মন্দ পরামর্শ নয়—ভাগবত ও সীতারামের যখন রাজবাটীর চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইল তখন উদয়াদিত্য তাহাদের কিছু সাহায্য করিতেন কিন্তু প্রতাপাদিত্য তাহা জানিতে পারিয়া উদয়াদিত্যকে বলিলেন যে, উহাদের সাহায্য করিলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী বলিয়া গণ্য হইবে। প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ আগুনে হস্তক্ষেপ করা কিন্তু সুরমা স্বামীকে এই কর্তব্যকার্য্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না, শ্বশুরের রোষাগ্নিতে স্বামীকে নিক্ষেপ করিতে তাঁহার প্রাণ কাঁপিল, তিনি নিজেই সমস্ত ভার লইলেন। উদয়াদিত্যের সমস্ত দুঃখের ভার এই ভাবে তিনি বহন করিতেন। সুরমার এই গোপন সাহায্যের কথা প্রতাপাদিত্যের কানে উঠিল, তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিলেন, প্রতাপাদিত্য আদেশ করিলেন সুরমাকে পিত্রালয়ে যাইতে হইবে। কিন্তু সুরমা সাধারণ রমণী নয়—যে প্রতাপাদিত্যকে যশোহরের সমস্ত লোক ভয় করিতেন তাহার আদেশের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কথা বলিতে সুরমা ভয় পান নাই। সুরমা প্রতাপাদিত্যের আদেশ শুনিল, তখন কহিল, "আমি পিত্রালয়ে যাইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। সেখান হইতে আমাকে লইতে লোক আসে নাই, আমার স্বামীরও এ-বিষয়ে মত নাই। অতএব বিনাকারণে সহসা পিত্রালয়ে যাইবার আমি কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না।" রাজবাড়ীতে সুরমা খুব সুখে ছিল—তা' নয়, দুই সন্ধ্যা সে উৎপীড়ন সহিয়াছে, দুঃখ পাই, সে অঙ্গ আভরণ করিয়াছে কিন্তু স্বামিসঙ্গই তাহার সমস্ত দুঃখ সহিবার ক্ষমতা দিয়াছে। অবশেষে সুরমার সঙ্গে যখন প্রতাপাদিত্য পারিলেন না, তখন বলিলেন,—"সুরমা যদি না যায় তো আমি উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিব।" আমাদের মন তখন দুঃখ-বেদনায় ভরিয়া ওঠে। সুরমার কি যশোরাধিপতি ও যশোহর-মহিষীর সহিত কোন সম্পর্ক নাই, সে কি ভিখারী অতিথি—যখন খুসী রাজবাড়ী হইতে বিতাড়িত করা হইবে। স্বামীর প্রেমেই সুরমা গর্ব্বিতা ছিল, সেই স্বামীকেও যখন তাহার জন্য কারারুদ্ধ করা হইবে বলা হইল, তখন সুরমা তাহার সর্ব্বস্ব অর্থাৎ স্বামী ত্যাগ করিয়া যাইতে রাজী হইল। সুরমা জানিত প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে দিবেন না, সেইজন্যই সে রাজবাড়ী ত্যাগ করিতে চাহে নাই—স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ তাহার চিরকালের। যখন প্রাণান্তিক ইচ্ছা হইবে তখনও উদয়াদিত্যের সহিত এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখা হইবে না। তখন সুরমার মনে হইল ঐ পা-দুখানি ধরিয়া এমনি করিয়া বুকে চাপিয়া এই মুহূর্ত্তেই মরিয়া যাওয়াতেই সুখ! সতীসাধ্বীর কামনা বোধ হয় ভগবান শুনিয়াছিলেন রাজবাড়ী হইতে বিদায় হইবার আগেই স্বামীর পা-দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া মৃত্যুর দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। রাজমহিষীও সকল বিবাদ ভুলিয়া শেষসময়ে সুরমার গুণগরিমা বুঝিতে পারিয়া আকুল ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সুরমা তাহার অসীম গুণগরিমার জন্য চিরজাগ্রতভাবে স্বামীর ও ননদিনীর মনে বিরাজ করিতেন। সুরমার মৃত্যুর পর বিভা ও উদয়াদিত্য দুই জনেরই জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। উদয়াদিত্য নিজের কর্ম্মশক্তি সমস্ত হারাইয়াছিলেন।

শ্রীঅধিভূষণ ভট্টাচার্য্য

জয়নাল ইতস্ততঃ করে, বাড়িসংলগ্ন জমিখানিতে যেরূপ ভাবে দখিনাতে মরদাভির দিকে হাত বাড়াতে আর কতক্ষণ। এই বিকালে বাড়ি ছাড়িয়া দূরে যাওয়া কি উচিত হইবে? সাহাজিদা ত কম দূর নয়—কমসে কম তিন মাইল।

আবার মনে পড়িয়া যায় তিনবারে মেহেরীর মরণ কাহরানি—সেই হাড় কাঁপানি ঠক্ ঠক্ কাঁপন, না—একবার যাইতেই হয় কেরামত ফকীরের বাড়ি—একটুখানি জলপড়া—মেহেরির জন্য।

জয়নাল বাড়িখানি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল—বাড়ির কোন দিকে বড় কোন ফাঁক হইয়াছে কি না। তারপরে আবার ঘরের ছুয়ারে আসিয়া বুধনাকে ডাকিয়া বলিল—একটু সাবধানে থাকিস্ কিন্তু—নদীর অবস্থা তেমন ভাল না।

ঘরের ভিতরে লুংফার বুক আরও দুরদুরিয়া যায়, ঘরে বাহিরে এ কি বিপদ!

গামছাখানা মাথায় বাঁধিয়া ঘটি হাতে দ্রুতপদে চলিতে থাকে জয়নাল—ওরলা শুধু বিসমিল্লা।

বাপুর নদীর স্বাভাবিক নির্ভীকতার সহিত আসিয়া যোগ দেয় জয়নালের অনুপস্থিতিতে কেমন একটা নিঃসঙ্কোচ।

অন্ধকার বাড়িয়া যায়—জলের ঝাপটা বাড়িয়া যায়—আর বাড়ে বাতাসের বেগ—বাপুর নদীর পাগলাটে চিৎকার।

জমির মাটিটুকু এরকমে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

এইবারে আঘাত লাগে কলাবাগেরে মূলে।

ছেঁড়া পাতাগুলির মর্মর শব্দে জাগে অস্তিত্বের অব্যক্ত যন্ত্রণা, একটা নিরুপায় করুণ কাহিনি।—

ঘরে বাইরে এ কি অদ্ভুত সঙ্কট। সে সঙ্কট আজকারের এই সন্ধ্যা-রাত্রিতে বিশ্বের হইয়া পড়িয়াছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল সুর হইতে কোথায়—কত দূরে। কেউ কি কিছু জানে? নীচে না, উপরে?

কেরামত ফকীরের বাড়িতে পৌঁছিয়া জয়নাল দেখে, ফকীর আজ মহা ব্যস্ত। পাশের ঘরে বসিয়া ফকীর প্রাণপণে কাহার ভূত ছাড়াইতেছে।

অনুসন্ধানে জয়নাল জানিল, ভূতগ্রস্তা রোগিণী বেচু হালদারের বউ। এই চার বৎসর হয় বিবাহ হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই কিছুই। বেচু কাজ করে মাদারীপুরের পাটকলে, বাড়িতে থাকিত বেচুর পিসীমা ও তাহার বউ।

বেচুর পিসীর ভিনকুলে আর কেউ নাই, কোলে পিঠে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে পিতৃমাতৃ হারা বেচুকে, নিজে মেয়ে পছন্দ করিয়া বিবাহ করাইয়াছে। কিন্তু কপালে সুখ নাই, বিবাহের কিছুদিন পর হইতেই মাঝে মাঝে বউ কেমন মুখ থিটিমিটি করিয়া পড়িয়া থাকে অজ্ঞান হইয়া।

পাড়াপড়শী একবাক্যে বলিল, অত বড় জয়লা বাড়িতে বউ গিয়া কোন সন্ধ্যা বাতিতে নিশ্চয়ই

(শেষ অংশ সংখ্যার পর)

ওর পাইয়াছে, ফকীরের চাহা চিকিৎসা নাই। সুতরাং বেচুর পিসী শরণাপন্ন হইয়াছিল কেরামৎ ফকীরের।

দুপুর হইতেই মেঘ-বৃষ্টি, তাহা মাথায় করিয়াই আসিয়াছে বেচুর পিসী বউ লইয়া, কারণ কিছুদিন ধরিয়া ফকীরের পায়ে বাত, বাড়ির বাহির হইতে পারে না। সারাটা বিকাল চেষ্টা করিয়াছে কেরামৎ ফকির, যোগিনী কিন্তু নামিবার নামও করে না।

অগত্যা বেচুর পিসী বলিল, আজ তবে থাক ফকীর, আর একদিন আবার দেখা যাবে।

কিন্তু ফকীরের আজ যেন জেদ চাপিয়া গিয়াছে, আজ আর কিছুতেই তাড়াহুড়ি নাই, যোগিনীর সঙ্গে আজ শেষ বোঝাপড়া।

সারা বিকালের সন্তাসন্তিতে যোগিনীও সত্যসত্যই যেন ক্রমে ত্রাস্ত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিতেছে; অর্থাৎ বেচুর বউ কুণ্ডলীর ভিতরে লাভঝাঁকা সেঁওতার কাঠি দিয়া আঘাত করিলে 'যাব না যাব না' বলিয়া এতক্ষণ যেমন দাঁত কিঁচাইত, এখন আর তেমন পারিতেছে না। বেচুর বউ যত দুর্বলতা প্রকাশ করিতেছে, ফকীর ততই উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে।

জয়নাল যখন গিয়া ফকীরের বাড়ি পৌঁছিয়াছে তখন সে শুনিতে পাইল, বেচু হালদারের বউর মধ্যগতা যোগিনী এখন লাঠির আঘাতে 'যাব যাব' বলিয়া উঠিতেছে। মাটির দাওয়ার এককোণের একটা কুণ্ডলীর ভিতরে আছে বেচুর বউ, অন্য কুণ্ডলীর উপরে সঘন আঘাত করিতেছে ফকির, মুখে তাহার অর্থহীন বিকৃত ধ্বনির সঘন চিৎকার।

এতক্ষণে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে প্রবল ঝড়, ঝড়ের ঝাপট বাহিরের পৃথিবীটাকে ঠেলিয়া যেন ছোট ছোট ঘরগুলির ভিতরে ভরিয়া দিতে চায়। নিতান্ত চকল মনে অপেক্ষা করিতেছিল জয়নাল ফকীরের জন্য।

ঝড়ের মাতনের সঙ্গে ফকীরও যেন মাতিয়া উঠিয়াছে, লাঠি দিয়া কেবলই আঘাত হানিতেছে কুণ্ডলীর উপরে, বেচুর বউর দেহ উলিতেছে, চিৎকার করিতে পারিতেছে না, অস্ফুটস্বরে কি বলিতেছে।

ফকির বলিল,—'কি, এইবারে যাবি ?'

—হ যাব।

—তবে যা, আবার এ মেয়েরে আসছিস ত খাঁটায় বাড়ি, যাবি যে তার চিহ্ন কি ?

—কি চিহ্ন চাই ?

—যাবার কালে একটা গাছের ডাল ভাঙবি।

বাহিরে সত্যই মড় মড় করিয়া প্রকাণ্ড গাব গাছটার একখানা ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে ধপ করিয়া পড়িয়া গেল বেচুর বউ মাটির উপরে। হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল কেরামৎ ফকীর নিজের কেরামতির গর্বে। বেচুর পিসীকে বলিল, বউকে এখন সুস্থ কর, যোগিনী গেছে।

পিছনের বারান্দা ছাড়িয়া কেরামৎ ফকীর এইবারে পোঁড়াইতে পোঁড়াইতে তাহার বাঁকা লাঠিখানি ভর করিয়া সামনের বারান্দায় আসিল এবং জয়নালকে যেন দেখিতেই পায় নাই এমনই ভান করিয়া রহিল।

বারান্দার সুপারীগাছের একটা মাচা—তাহারই উপরে দেহভার বিকীরণ করিয়া অর্ধনিমীলিত নেত্রে অর্ধ-শায়িত হইয়া রহিল কেরামৎ।

বাহিরের দুর্যোগ যত বাড়িতেছে জয়নাল তত অস্থির হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহার সামনে ফকীর এমন একটি রহস্যময় গম্ভীর মূর্তি ধারণ করিয়া শায়িত আছে যে, টুঁ শব্দটি করিবার সাহস যোগাইতেছিল না জয়নালের, শুধু ফকীরের একটিবারের কৃপাদৃষ্টির জন্যই জয়নাল বার-বার সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইতে লাগিল ফকীরের মুখের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে ফকীর চোখ মেলিল, জয়নালকে লক্ষ্য করিয়াই বিড় বিড় করিয়া সে বলিয়া চলিল তাহার ফকিরালী জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বলিতে বলিতে ফকির হঠাৎ চোখ দুইটা লাল করিয়া মাচার উপরে উঠিয়া বসে—গায়ে বাঘছালের কাঁথা দিয়া সুপারীর মাচায় কড়াৎ কড়াৎ শব্দ করিতে থাকে লাভঝাঁকা সেঁওতার লাঠিখানি মাচার কোণা হইতে হাতে তুলিয়া লয়—উর্ধ্বে কয়েকবার পাক দেয়—আবার লাঠি রাখিয়া ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া আকাশে যেন কাহার সহিত কথা বলে।

অন্যান্য দিন জয়নাল ফকীরের এই সকল ভাব-ভঙ্গীই অতিশয় ভয় ও বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিতে থাকিত—জলপড়ায় বিশ্বাস আরও প্রগাঢ়তা লাভ করিত। আজ আর মন উঠিতেছে না—সবই যেন কেমন ভণ্ডং বলিয়া লাগিতেছে।

মন তাহার অস্থির সেই নদীর কূলের অসহায় বাড়ী-খানিও তাহার ভিতরকার অসহায় জীব কয়েকটির জন্য। কাছাকাছি পাড়াপ্রতিবেশীও নাই কেহ—ডাকিয়া পাওয়া যাইবে না কাহাকেও। সেই মেয়েটার ঠক্ ঠক্ কাঁপুনি—শুধু মরেটা কেন—জয়নালের মনে হইল তাহার সব বাড়ী-খানিই যেন অমনি করিয়া ঠক্ ঠক্ কাঁপিয়া মরিতেছে। একটা প্রচণ্ড ভয়ে বুকটা যেন মোচড়াইয়া উঠিতেছে।

ফকীর এতক্ষণে হাত দু'খানি আয়নার মতন মুখের সামনে ধরিয়া বিড় বিড় করিয়া কি সব বলিতেছে—আর তাহারই ভিতরে লক্ষ্য করিতেছে, জয়নাল তাহার এই সকল কবিরালি সম্বন্ধেই আজ একান্ত উদাসীন।

অসম্ভব চটিয়া যায় ফকীর। জীবনভর ফকিরালি করিয়াছে বিনা পয়সায়। সময় নাই অসময় নাই—দিনের দুপুর নাই—রাতের দুপুর নাই—শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা নাই—লোকের জন্য ফকিরালি করিয়া বেড়ায়—ঘর-দুয়ারের পাশে হাঁটিয়া গিয়া ফকিরালি করে—বিনিময়ে চায় তাহার ফকিরালিতে জয়বিহ্বল অন্ধ বিশ্বাস—সকল অপদেবতা—সকল আধি-ব্যাধির—সকল দৈবদুর্বিপাকের সহিত তাহার যে একটা গোপন জানাজানি আছে—ইচ্ছা মতন সে ইহাদের যাহাকেই যেমন ইচ্ছা সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতে পারে, তাহাতে আপামর জন-সাধারণের অটুট বিশ্বাস।

জয়নালের ঔদাসীন্য চটাইয়া দিল বেচ্ছু ফকীরকে, মুখ বিষচাইয়া বলিয়া উঠিল—বিশ্বাস নাই ত আসস্ ক্যান রে শালার ব্যাটারা? বাগ্‌না ফকীরের পানি বুঝি? বলিয়াই মাচা হইতে উঠিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল ফকীর।

জয়নাল দুয়ারের আগলটা ধরিয়া ঠায় বসিয়া থাকে। কি ভাবিয়া ফকীর আবার আসিয়া জল পড়িয়া দিয়া যায়।

কয়ের বেগ খানিকটা কমিয়া আসিয়াছে। এখনও ঘরের বাহির হইবার মতন অবস্থা হয় নাই, তবু জয়নাল আর দেরী করিতে পারে না। গামছাটা ভাল করিয়া নিঙড়াইয়া সে জলপড়া ঘটিটার মুখ ভাল করিয়া আটকাইয়া লইল—যেন বৃষ্টির জলের সহিত সংমিশ্রণ ঘটিয়া পড়া জলের মাহাত্ম্য নষ্ট না হইয়া যায়। তারপরে আগল খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল অন্ধকারে। ফকীরকে আর ডাকিতে ইচ্ছা হইল না, শুধু ডাকিয়া বলিল কাঁপ-খানা আটকাইয়া দিতে।

সাতাজিয়া হইতে ভুতুরদিয়া তিন মাইলের অধিক পথ ঘোড়াইয়াই আসিয়াছে জয়নাল। মাঝখানে নৌকা ধরিয়া খাল পার হইতে লাগিয়াছে যেটুকু সময়।

ঝড় এতক্ষণে থামিয়া গিয়াছে—শুধু ঝুঁড়ি ঝুঁড়ি বর্ষা।

ঘোড়াইয়া আসিয়া জয়নাল শুধু এদিক ওদিক তাকায়—তাইত! অন্ধকারে দুশ্চিন্তার পথ ভুল হইল না কি? এ কোথায় আসিল সে? এ ত ভুতুরদিয়া নয়। আবার চারিদিকে তাকায়—কিছুই বুঝিতে পারে না। মাথাটা কিম্ কিম্ করে—কিছুই বুঝিতে পারে না। পাগলের মতন ছুটাছুটি করে জয়নাল—হ্যাঁ, এইত ইচু মিঞার পাট ক্ষেত—গলা সমান পাট হইয়াছে—হ্যাঁ, এই ত তাহার ডাইনে কচু ক্ষেত—কচু এক বিঘৎ ডাগর হইয়াছে—এইত তারপরে মেহেরের ভুঁই—অল্প দিন ধর ধান দিয়াছে, তবে—তবে—তাহার বাড়ী-ঘর কই—সামনে যে শুধু থৈ থৈ করে নদীর জল—! তবে—? সব গ্রাস করিয়াছে—? ঘরবাড়ী—মানুষজন সব?

জয়নাল—জয়নাল—

গলা ছিঁড়িয়া চীৎকার করে জয়নাল।

পাটক্ষেত হইতে ভূংকার কণ্ঠ শোনা গেল—সব মেছে মেঞা—সব—।

এঁ্যা—এঁ্যা—সব?

শব শুনিয়া পাটক্ষেতের ভিতরে ঘোড়াইয়া ঢোকে জয়নাল।

—কোথায়—কোথায়—?

—এই যে—।

কাছে আসায় জয়নাল—দেখে পাটক্ষেতের ভিতরে কাঁথার পুঁটলিতে মেয়ে জড়াইয়া বসিয়া আছে লুৎফা; জয়নাল কাছে আসিতেই কাঁথার পুঁটলিটি নীচে ফেলিয়া দিয়া কাঁদিয়া ওঠে লুৎফা—ঘর-বাড়ী ছেলে-মেয়ে কিছু নাই মেঞা, কিছু নাই।

—এ্যাঁ—নাই।—কাঁথার পুঁটলিটা খুলিয়া কঙ্কালটিকে নাড়াচাড়া করে জয়নাল—স্থির-শীতল।

—আমার ময়নাল কোথায়—ময়নাল?

—কিছু জানি না মেঞা।

অসম্ভব কাঁপিতে থাকে লুৎফা, কাহার সে ভাঙিয়া পড়ে।

থাড়া হও—এইখানেই আর একটু থাড়া,—আমি একবার দেখি।

আশপাশের মাঠে মাঠে ডাকিয়া ডাকিয়া পাগলের মতন ছুটাছুটি করে জয়নাল—কোথায়ও কোন সাড়া নাই। অনেকক্ষণ চলিল এই ভাবে। তারপরে মাঠ ছাড়িয়া তাকাডাকি আরম্ভ করিল প্রতিবেশীদের বাড়ীর কাছে কাছে।

ক্ষীণ কণ্ঠে যেন দূর হইতে একবার সাড়া আসিল, —বাজান। জয়নাল আবার ডাকে,—ময়নাল—

হ্যাঁ, এইবারে স্পষ্ট সাড়া আসে,—বাজান—

শব্দ শুনিয়া দৌড়ায় জয়নাল। দুই হাতে গোরুর গলায় দুই দড়ি ধরিয়া দু'পাশে দুই গোরুসহ আগাইয়া আসে ময়নাল। জয়নাল ক্ষিপ্তের মতন বুকে চাপিয়া ধরে ময়নালকে,—যতখানি জোর আছে গায়ে ততখানি জোরে। মাঠের পাশে শিমুল গাছের তলায় গোরু দুইটি লইয়া বসিয়াছিল এতক্ষণ ময়নাল। আকস্মিক বিপদের কাপটা তাহার সকল ভয় যেন ঠেলিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।

—মরু কই—মা কই—? উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করে ময়নাল।

—আছে বাজান, সবই আছে—ভয় নাই, চল।

ময়নালকে কোলে লইতে চায় জয়নাল।

—গোরু?

—থাক গোরু বাজান, চল।

—গোরু একা থাকবে কাননে?

—তবে আর এখানে এই গাছের সঙ্গেই বাঁধি—।

—রাত্তিরে চোরে নেবে যে।

—নেয় নিক—তুই চল।

ভয়কম্পিত কণ্ঠে ময়নাল বলে,—না।

—তবে চল্—চল্—নিয়াই চল।

সে রাত্রিটা জয়নাল লুৎফা ও ময়নালের হাত ধরিয়া ঠাঁই লইল গিয়া জমিদারের কাছারীতে। তুতুরদিয়ার দাস উত্তরের গ্রাম কাপুরঘাট, মাঝখানে নদী হইতে একটা বড় খাল। এই খালের পাড়েই কাপুরঘাটে জমিদারের কাছারী।

তুতুরদিয়ার অধিবাসী বাসিয়া জয়নাল, বাড়ির কাছাকাছি তেমন কোন প্রতিবেশী ছিল না, ঘুরে ঘুরে যাহারা ছিল তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল কম।

কাছারীর নায়েব ছিলেন বৃদ্ধ পাল মহাশয়। বড় ভাল মানুষ। জমিদারের গোমস্তা হইলেও ধর্মভীরু। আর এই তাপবিড়ম্বিত নিরীহ চাষী জয়নালের প্রতি তাঁহার কেমন একটা স্নেহের টান ছিল। সুতরাং সকল শুনিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল, সে রাত্রির জন্য কাছারী-ঘরের ভিতরেই তিনটি প্রাণীকে ঠাঁই দিলেন।

মৃত মেয়েটাকে রাত্রির অন্ধকারে জয়নাল কাপুরনদীর জলেই ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছে। ভীরু মনের অন্তরালে কোথায় যেন নাড়া দিয়া ওঠে একটা গোপন-নীতি। নদীকে বাহা দিয়া প্রশ্ন রাখা যায়! সে জানে কি আছে তার ক্রূর মনে?

গোরু দু'টিকে জয়নাল কিছুতেই হাতছাড়া করে নাই, কারণ ও দুইটি জীব যে তাহার সারা দিনের খেলার সাথী। অতএব কাছারী-বাড়ীর বড় তেঁতুল গাছটার নীচে সে প্রাণী দুইটিও সারারাত বাঁধা রহিল।

ভোর হইলে পাল মহাশয় আসিয়া কাছারী-ঘরে বসিয়া দৈনন্দিন কর্মারম্ভের পূর্বে চিরাভ্যস্ত রীতিতে গুড়্-গুড়্ করিয়া তামাক টানিতেছিলেন। আজ কর্মারম্ভে উৎসাহ কম, তাই তামাকের টানগুলিও প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবেই দীর্ঘ হইয়া চলিয়াছে।

বহু প্রাচীন দুইখানি কাঠের চৌকি পাশাপাশি

ভোলা রেওয়া ; দু'একটা পায়া ভাঙিয়া গিয়াছে, বাঁশের দ্বারা সেখানটায় ঠেকা দেওয়া আছে। তাহারই উপরে একখানি চিকণ হোগলাপাতা ; তদুপরি উপবিষ্ট পাল মহাশয়, সামনে কাঠের একটি হাত-বাক্স।

চৌকির পাশে নীচে একখানি হোগলার উপরে শুইয়াছে তিনটি প্রাণী। অয়নাল এখনও গভীর ঘুমে। পুংফা কণে কণে কোঁপাইয়া উঠিতেছে। দুই পাশে হাত দিয়া লালচোখ দুইটাকে বাহিরের দিকে স্থির করিয়া তাকাইয়া আছে অয়নাল, সমস্ত রাত্রির সমস্ত বিপর্যয় আসিয়া বেড়াইতেছে তাহার চোখের সামনে একটা দুঃস্বপ্নের তীব্র স্মৃতির মতন।

মায়ের চোখ পড়িয়া যায় অয়নালের দিকে : কি গভীর নিশ্চিন্ত ঘুম! পায় কাদা শুকাইয়া আছে,—আস্তে আস্তে খুঁটিয়া তোলে।

তিনটি প্রাণীর মুখের দিকে তাকাইয়া বৃদ্ধ পাল-মহাশয়ের মনটি গলিয়া যায়। অনেকক্ষণ ভাবিতে থাকেন এদিক ওদিক অনেক কথা। তার পরে স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলেন,—অয়নাল, যা হবার ত হ'ল, এখন মাথা গুঁজিবার ঠাঁই ত একটু করে নিতে হয়।

আবার সেই সমস্যা! এই জীবনের ভিতরেই কত নতুন করিয়া সংসার পাতিল-মুহূর্তে ভাসিয়া গেল, আজ আর যেন উৎসাহ নাই। অয়নাল চুপ করিয়া শোনে—জবাব দেয় না।

—আর গাঙের কিনারে নারে অয়নাল, একটু বেশী খালজল লাগলেও এবারে একটু ভিতরের দিকে ঢোক।

কথাটা ভাল লাগে অয়নালের। কেমন একটা নতুন আশা জাগে।—ভাবছিলাম কি জানিস্ অয়নাল, —ছোট একটা ভিটা পড়ে আছে সেই বাদুর মিঞার বাড়ির পেছনে। যাবি নাকি সেখানে?

—যেখেন ভেবে।—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে অয়নাল।

—সেলামী তোর কিছু লাগবে না, সে আমি ব্যবস্থা করে নেব। আরও উৎসাহিত হয় অয়নাল।

—দু'পাঁচটাকা তোর লাগে ত ধার নে, তারপরে পারিস্ যখন শোধ করবি।

কৃতজ্ঞতায় জল আসে অয়নালের চোখে। পুংফাও শোনে উৎসুক হইয়া। অয়নাল ঘুমের চোখে মোড়ামুড়ি দেয় হোগলার উপর।

—একবার একটু দাঁড়াবার ঠাঁই ত ক'রে নে,—তারপরে আর সব দেখা যাবে।

নীরবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে অয়নাল।

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হইল। পাল মহাশয়ের দাক্ষিণ্যে এবং আনুকূল্যে অয়নাল বাদুমিঞার বাড়ির পিছনের ভিটাতেই আবার স্ত্রীপুত্র লইয়া একটু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই করিয়া লইল।

[ক্রমশঃ

আত্মহারা

শ্রীমঙ্গলনাথ সরকার

ওগো! যা আমি চাই চাইবো না তা
তোমার কাছে মুখ ফুটে,
তবু পাবার আশা আকুল বাগে
দু'কূল ভেঙে যায় ছুটে।
যদি বুঝে না পাও আপন প্রাণে
প্রিয়, না চেয়ে তায় কি চাই পানে
তবে দিও না তাও চাইলে কভু
ভিখারী মন যাক্ টুটে।

তবুও যদি গভীর প্রেমে
আপন-ভোলা ভুলে
তোমার জলে আমার বলি
যা কিছু নিই তুলে;
প্রিয়, তেবো না মোর এ ভুল যেন
আমা বিপুল হয়ে যাক্ না কেন
ওগো তোমায় নিয়ে তোমারে দিই
তা ছাড়া মোর কই সুখে।

প্লাস্টিক শিল্প ও ভারত

শ্রীকৃষ্ণবিহারী পাল

বর্তমান যুগকে প্লাস্টিকযুগ বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না, বস্তুতঃ এ যুগের প্রায় সকল বস্তুতেই—তাহা আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যই হউক বা যুদ্ধের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যই হউক না কেন—প্লাস্টিক ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কি কি ভাবে প্লাস্টিক ব্যবহার হইতেছে সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া অপেক্ষা কোন কাজে প্লাস্টিক লাগিতেছে না, তাহার জবাব দেওয়া সহজতর। দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ব্যতীত যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ যন্ত্রাদি প্লাস্টিক ব্যতিরেকে তৈয়ার করা একপ্রকার অসম্ভব হইত তাহার নামস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাস্তায় ও প্রক্সিমিটি ফিউজ একমাত্র প্লাস্টিক সাহায্যেই তৈয়ার করা সম্ভবপর। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে প্লাস্টিক ব্যবহার বিশেষ সুবিধাজনক। এতদ্ব্যতীত কৃত্রিম চোখ, অস্ত্রচিকিৎসা ও দন্তচিকিৎসার যন্ত্রপাতি, লেন্স ও প্রিজম্, মস্কুইটো বিমানের বিভিন্ন অংশ, প্লাইউড শিল্প, কৃত্রিম গাঁন বা তন্তু, গ্যাস্ মুখোস্, বিদ্যুৎ বাতি, গ্রামোফোনের পিন্ প্রভৃতি প্লাস্টিক সাহায্যে বিশেষ চমৎকার ভাবে নির্ম্মিত হইতেছে।

প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন, প্লাস্টিক বলিতে আমরা কি বুঝি। পদার্থবিদের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, প্লাস্টিক মানে আকারপ্রদানক্ষম পদার্থ। এই সংজ্ঞা অনুসারে রবার, কাদামাটি, মোম, কাচ, ইস্পাত প্রভৃতিকে প্লাস্টিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন পদার্থই প্লাস্টিকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত নহে। কাজেই এক কথায় প্লাস্টিক কি তাহা বলা কতকটা অসম্ভব। মনে হয়, মাত্র ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্লাস্টিক ব্যবসায়িগণ যখন এই ব্যবসা সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের ধারণা ছিল সম্ভবতঃ—প্লাস্টিক হইবে এমন কতকগুলি কৃত্রিম পদার্থ যাহাকে তাপ ও চাপ প্রয়োগে ঢালাই করিয়া যে কোন আকৃতিবিশিষ্ট করা যাইবে। কিন্তু ব্যবসায়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত ধারণার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

প্লাস্টিক রসায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যতপ্রকার প্লাস্টিক আছে তাহার মধ্যে প্রধানতঃ রহিয়াছে অক্সার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে তিনটী মৌলিক পদার্থ—প্রথমটী কঠিন এবং বাকী দুইটী গ্যাসীয়। প্লাস্টিক রসায়ন জৈব রসায়নের অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন যে, একটী অক্সার-পরমাণুর চারিটী অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে রাসায়নিক উপায়ে সংযুক্ত করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান। কাজেই একটী অক্সার-পরমাণুকে চারিদিকে পরমাণুগ্রহণক্ষম চারিটী হস্তসম্বলিত করিয়া চিত্রিত করা যাইতে পারে। এখন যদি চারিটী হস্তে চারিটী হাইড্রোজেন পরমাণু গ্রথিত হয় তবে যে অণুর সৃষ্টি হইবে তাহা হইল মার্শ গ্যাস্ বা মিথেনের (methane) অণু। জৈব রসায়নে বেন্‌জিন্ নামে যে তরল পদার্থটি আছে, তাহার প্রতি অণুতে ছয়টী অক্সার ও ছয়টী হাইড্রোজেন-পরমাণু বিদ্যমান। একটী ষড়ভুজের একটী অন্তর একটী বাহুর সহিত অন্য একটী সরলরেখা কল্পনা করিয়া প্রতি শীর্ষবিন্দুতে একটী করিয়া অক্সার-পরমাণু স্থাপন করা হইলে দেখা যায় যে, প্রতি অক্সার-পরমাণুর তিনটী হস্তই আবদ্ধ থাকে। প্রতি মুক্ত হস্তে যদি একটী হাইড্রোজেন পরমাণু সংযুক্ত হয়, তবে আমরা পাইব বেন্‌জিনের অণু। কারণ অক্সার-পরমাণুর সহিত সংযোগক্ষম পরমাণুর মধ্যে এক বা ততোধিক অক্সার পরমাণু হইতেও কোন বাধা নাই। তাহা ছাড়া, যে কোন মুক্ত হস্তে পরমাণুপুঞ্জও সংযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অতি সরল প্রকৃতির অণু লইয়া রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা অতি বৃহৎ এবং জটিল অণুর সৃষ্টি করাও অসম্ভব নহে। প্লাস্টিক প্রস্তুত করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক এই উপায়েরই সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। একটী সাধারণ উদাহরণ লওয়া যাউক।

১৯০৯ সালে আমেরিকার রসায়নবিদ্ লিও বেকল্যাণ্ড 'বেকেলাইট' নামে প্লাস্টিকটী তৈয়ার করেন। তিনি ফেনল ও ফরমালডিহাইড নামে দুইটী জৈব রাসায়নিক পদার্থ লইয়া উপযুক্ত অবস্থায় রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটান এবং ফেনল-ফরমালডিহাইড নামে একটী রজঃ-জাতীয় পদার্থ

পান। বিশ্লেষণে দেখা গেল যে, প্রতি দুইটী কেসল অণুর সাথে একটী ফরমালডিহাইড অণুর রাসায়নিক মিশ্রণে একটী কেসল-ফরমালডিহাইড অণু ও এক অণু জলের সৃষ্টি হয়। অনেকগুলি কেসল-ফরমালডিহাইড অণু একত্রিত হইয়া যে বৃহৎ অণুর সৃষ্টি হইল উহাই বেকেলাইটের অণু। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শুধু কৃত্রিম উপায়েই যে বৃহৎ অণু সৃষ্টি করা যায় তাহা নহে। প্রকৃতি ভাণ্ডারেও এতাদৃশ অতিবৃহৎ অণুগঠিত পদার্থের অভাব নাই। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উদ্ভিদদেহাভ্যন্তরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ নামে সহজ-জাতীয় অণুর সৃষ্টি হইয়া উহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের একত্রীকরণ ক্রিয়া ঘটিতে থাকে এবং অতি বৃহৎ সেলুলোজ অণুর উৎপত্তি হয়। বৈজ্ঞানিকগণ যে এই বৃহৎ সেলুলোজ অণুও প্লাষ্টিকশিল্পের কাজে লাগাইয়াছেন 'সেলুলয়েড'ই হইল তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহা সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত করা হইয়াছে ১৮৬৯ সালে সেলুলোজ, নাইট্রেট ও কর্পূর সাহায্যে। বর্ত্তমানযুগের কৃত্রিম রেশম ও 'সেলোফেন' এই জাতীয় প্লাষ্টিক। আমরা জানি, জীবদেহে ও উদ্ভিদদেহে জীবন্ত যে পদার্থ থাকে, তাহাকে বলা হয় প্রোটিন। প্রোটিনও অতিবৃহৎ অণুকর্তৃক গঠিত বলিয়া প্লাষ্টিকশিল্পে বিশেষ কাজে লাগিতেছে। দুগ্ধ হইতে কেসিন্ নামে যে প্রোটিন পাওয়া যায় তাহা দ্বারা নানাপ্রকার প্লাষ্টিক তৈয়ারী হইতেছে। সুতরাং প্রোটিন-গঠিত চুল, প্রাণিজ রেশম ও পশমকে প্রাকৃতিক প্লাষ্টিক বলা যাইতে পারে।

যতপ্রকার প্লাষ্টিক আছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়—(১) থারমোসেটিং এবং (২) থারমোপ্লাষ্টিক। সাধারণ আবহাওয়ার যে সমস্ত পদার্থ তরল অবস্থায় থাকে এবং তাপ ও চাপ প্রয়োগে যাহাকে ঢালাই করিয়া কোন বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট করা যায় কিন্তু পরে আর উত্তাপ দ্বারা দ্রবীভূত করা সম্ভব নহে, তাহাকে থারমোসেটিং প্লাষ্টিক বলা হয়। পক্ষান্তরে থারমোপ্লাষ্টিক নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যাদির উত্তাপ প্রয়োগে আকৃতির পরিবর্ত্তন করা সম্ভব।

পূর্ব্বে যে কেসল-ফরমালডিহাইড রজনের প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণনা করা হইয়াছে উহা হইল থারমোসেটিং প্লাষ্টিক। উহা সাধারণতঃ গুঁড়ার আকারে তৈয়ারী হয়। উপযুক্ত ফিলার সহযোগে (যেমন করাতের গুঁড়া, অভ্র, এসবেস্টাস্) তাপ ও চাপ প্রয়োগ করিয়া উহা শক্ত ও অগলনীয় প্লাষ্টিকে পরিণত করা হয়। এইজাতীয় প্লাষ্টিক নানাপ্রকার আধুনিক রং হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত এই প্লাষ্টিক দ্বারা কাগজ, কাঠ, বস্ত্র প্রভৃতি অনুসিক্ত করিয়া বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য তৈয়ারী হইয়া থাকে। জগতে যত পরিমাণে প্লাষ্টিক উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা পঁচাত্তর ভাগই কেসল-ফরমালডিহাইড জাতীয় প্লাষ্টিক। 'বিটেল' নামে যে প্লাষ্টিকটী প্রচলিত আছে তাহা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে ইউরিয়া ও ফরমালডিহাইড-এর রাসায়নিক মিশ্রণে। এইজাতীয় প্লাষ্টিকের বিশেষ গুণ হইতেছে যে ইহাদের নিজস্ব কোন রং নাই, সুতরাং প্রয়োজনানুসারে যে কোন রং করা সম্ভব। 'মেলামিন' নামে আর একপ্রকার প্লাষ্টিক বিশেষভাবে ব্যবহার হয় রঞ্জনদ্রব্য ও কলাই করিবার বস্তু হিসাবে। 'পেনিলাক্স', 'বেকেলাইট' প্রভৃতি প্লাষ্টিক তৈয়ারী হয় এনিলিন ও ফরমালডিহাইড হইতে। রং ও বার্ণিশ হিসাবে আমেরিকায় সম্প্রতি যে একপ্রকার প্লাষ্টিক ব্যবহার হইতেছে তাহার বৈজ্ঞানিক নাম এলকাইড রেজিন—ইহা প্রস্তুত হয় গ্লিসারিন ও থেলিক এসিড সহযোগে। উপরোক্ত সকল প্রকার প্লাষ্টিকই থারমোসেটিং জাতীয়।

থারমোপ্লাষ্টিকের মধ্যে সেলুলয়েডই হইল সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন প্লাষ্টিক। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উদ্ভিদদেহের সেলুলোজ সাহায্যেই এই প্লাষ্টিক তৈয়ার করা হয়। প্রথমে যে কোন খাঁটি সেলুলোজকে নাইট্রিক ও সলফিউরিক এসিড সাহায্যে সেলুলোজ ডাই-নাইট্রেটএ পরিণত করা হয়, তৎপর বিশেষ যন্ত্রে কর্পূর একত্রিত করিলেই সেলুলয়েড পাওয়া যায়। সেলুলয়েডের বিশেষ অসুবিধা হইল যে ইহা অগ্নিপ্রজ্বলনশীল। সেলুলয়েডের পর নাম করা যাইতে পারে পলি-ইথিলিন নামে প্লাষ্টিকের। ইথিলিন নামে একটী জৈব গ্যাসীয় পদার্থই হইল এইজাতীয় প্লাষ্টিকের মূল বস্তু। একটী ইথিলিন—অণুর ভিতর দুইটী

অক্সিজেন-পরমাণু এবং চারিটী হাইড্রোজেন-পরমাণুর বর্ত্তমান, আণবিক ওজন মাত্র ২৮। একটী উপযুক্ত ক্যাটালাইটিক্ এজেণ্ট সাহায্যে উচ্চ তাপ ও চাপ প্রয়োগ করিয়া ইথিলিন অণুগুলিকে অতি বৃহৎ অণুতে পরিবর্ত্তন করা হইয়া থাকে। যাহার আণবিক ওজন ৫০ হাজারেরও উর্দ্ধে। পলি-ইথিলিন শ্বেতের মত একটী শ্বেত পদার্থ, কাজেই ইহা ব্যবহার করা হয় বিশেষভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে। ডিনাইল-বেনজিন্ হইতে প্রস্তুত পলি-ষ্টাইরিন নামে প্লাষ্টিকটী কাচের মত স্বচ্ছ বলিয়া আলো-বিজ্ঞানের নানাপ্রকার যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করা হয়। ব্রটিশ রাজত্বে ইহা 'ডেস্ট্রন্' নামে পরিচিত।

ডিনাইল-ক্লোরাইড নামে রাসায়নিক পদার্থটীকে নানা প্রক্রিয়ার সাহায্যে পলি-ডিনাইল-ক্লোরাইড-এ (P. V. C.) পরিণত করা হইলে উহার আণবিক ওজন হয় ৮০ হাজারের উর্দ্ধে। এই প্লাষ্টিক হইতে কৃত্রিম রবার ও কৃত্রিম পশম তৈয়ারী হয়। P. V. C. উৎপাদনে জার্ম্মানী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। 'এসট্রোলোন' নামে যে পদার্থটী তাহারা অস্ত্র-চিকিৎসক যন্ত্রাদিতে ব্যবহার করে, তাহা এইজাতীয় প্লাষ্টিক। যুদ্ধকালীন কয় বৎসরে রবারের প্রচুর চাহিদাহেতু যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে P. V. C. উৎপন্ন করিয়াছে। কোন বস্ত্রের উপর উচ্চ-চাপে P. V. C. প্রয়োগ করিয়া কৃত্রিম চামড়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া অতি দৃঢ় পদার্থক ফিল্ম, কৃত্রিম সুতা, নানাপ্রকার বার্ণিশও P. V. C. হইতে তৈরী হইতেছে। বিলাতের ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ 'পারস্পেক্স' নামে এক প্রকার প্লাষ্টিক তৈয়ার করে, যাহার বৈজ্ঞানিক নাম এক্রিলিক-এষ্টার। ইহা ব্যবহার হয় বোমারু বিমানের অগ্রভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অনুদায়ী ক্যামেরার লেন্স পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে।

'নাইলন' হইল বস্ত্র প্রস্তুত করিবার একপ্রকার কৃত্রিম আঁশ বা তন্তু। ইহাও একপ্রকার প্লাষ্টিক। এডিপিক এসিড ও হেক্সামিথিলিন-ডাই-এমিন নামে দুইটী জৈব পদার্থের মধ্যে জটিল রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলে বৃহৎ অণুসমন্বিত নাইলন দ্রব্যাদির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিলে ইহাতেই একটী প্রবন্ধ হয়। যুদ্ধ সময়ে প্যারাসুটের কাপড়, নানাপ্রকার দড়ি, টুথব্রাস প্রভৃতি নাইলন দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।

উপরে যে সামান্য আলোচনা করা হইল, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিলাত, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্লাষ্টিক ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে নিত্য নূতন প্লাষ্টিক-শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতেছে প্লাষ্টিক সম্বন্ধে গবেষণার নিমিত্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ভারতবর্ষ অতি আধুনিক এই শিল্পটীতে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে প্লাষ্টিক দ্রব্য আমদানী হইয়াছে, কিন্তু ভারতের নিজস্ব শিল্প অদ্যাবধি স্বয়ং পূর্ণ হইতে পারে নাই। এখানে ভারতে প্লাষ্টিক শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা ও প্রকৃতক্ষেত্রে যে কথঞ্চিৎ সাফল্য অর্জ্জিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

প্লাষ্টিক শিল্পকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :— (১) প্লাষ্টিক হইতে নানাপ্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা, (২) যে সমস্ত সরল রাসায়নিক দ্রব্য সাহায্যে প্লাষ্টিক তৈয়ার করা হয় তাহার প্রচুর উৎপাদন, (৩) চাপ ও তাপ প্রয়োগ করিয়া রাসায়নিক দ্রব্যাদি সাহায্যে প্লাষ্টিক তৈয়ারী করা।

বিদেশ হইতে প্লাষ্টিকের গুঁড়া আমদানী করিয়া নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে ভারতবর্ষ কিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে ভারতবর্ষের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। তবে দিল্লীতে অবস্থিত কাউন্সিল অব্ সায়েন্টিফিক্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ এ সম্বন্ধে যে মূল্যবান গবেষণা চালাইতেছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক রজনজাতীয় পদার্থ প্রচুর বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং এই সমস্ত পদার্থ হইতে যথেষ্ট প্লাষ্টিকদ্রব্য তৈয়ার করাও সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, লাক্ষা ভারতে প্রচুর উৎপন্ন হয়, সুতরাং

লাক্ষা কৃত্রিম রজনের পরিবর্তে প্লাষ্টিকশিল্পে ব্যবহার্য্য। তদ্ব্যতীত কেন্দুয়া ফল ও বিলাতম ফলের নির্য্যাসও প্লাষ্টিক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈয়ারীর নিমিত্ত লাক্ষাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্লাষ্টিক। প্লাষ্টিকের ন্যায় বিদ্যুৎ-অপরিবাহী বলিয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতেও লাক্ষা ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে লাক্ষা ব্যবহারের বিশেষ অসুবিধা হইল যে, উহা বেশী উত্তাপ সহ করিতে পারে না। দেরাদুনে অবস্থিত ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ করাতের গুঁড়া, নানাপ্রকার খড়কাতীয় পদার্থ হইতে প্লাষ্টিক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিশেষ গবেষণা-কার্য্য চালাইতেছেন। তাহা ছাড়া লোয়াবিন, কফিবিন ও আরও অন্যান্য পদার্থ হইতে প্লাষ্টিক প্রস্তুতের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্লাষ্টিকশিল্পে ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে ফরমালডিহাইড্, ফেনল, ইউরিয়া, গ্লেসিক এসিড, কার্বলিক এসিড, নানা প্রকার এলকোহল ও এষ্টার প্রধান। কলিকাতার সালিমার পেণ্ট ওয়ার্কস্ কিছু পরিমাণে গ্লেসিক এনহাইড্রাইড উৎপন্ন করিয়া থাকে। ভারতের অনেক ফ্যাক্টরীতে এসকোলন ও অন্যান্য মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার গবেষণাও চলিতেছে। কলিকাতাতে অবস্থিত গভর্ণমেণ্ট ইলেক্‌ট্রিক ফ্যাক্টরী মাসে ১টন করিয়া প্লাষ্টিকের গুঁড়া উৎপাদন করিয়া থাকে।

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্লাষ্টিক হইতে ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত বিষয়ে ভারতবর্ষ কিছু পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে। যন্ত্রপাতির মধ্যে হাইড্রলিক প্রেস্ প্রধান। তাহা ছাড়া অনেকগুলি ছোটখাট যন্ত্রেরও বিশেষ প্রয়োজন। বিদেশ হইতে প্লাষ্টিকগুঁড়া আমদানী করিয়া প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি তৈয়ার কার্য্যে কেম্‌টোলাইট্ মোল্‌ডিং কোং, ইণ্ডিয়া মোল্‌ডিং কোং, ইণ্ডিয়ান্ প্লাষ্টিক কোং, প্লাষ্টিক প্রোডাক্ট লিমিটেড্, কে. ইঞ্জিনিয়ারিং কোং এবং গভর্ণমেণ্ট ইলেক্‌ট্রিক ফ্যাক্টরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে যদি বৎসরে গড়ে জনপ্রতি এক পাউণ্ড প্লাষ্টিক দ্রব্যও ব্যবহৃত হয় তবে বৎসরে ১৮০,০০০ টন প্লাষ্টিকের প্রয়োজন হয়। ১৯৩৭ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ২৪,০০০ টন প্লাষ্টিক উৎপাদন করিয়াছিল; ১৯৪২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪২০,০০০ টন। ১৯৩৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রতি গড়ে প্রায় দেড় পাউণ্ড প্লাষ্টিক ব্যবহৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই সংখ্যা আরও অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই প্লাষ্টিক ব্যবহার দূরের কথা, প্লাষ্টিক নির্ম্মিত দ্রব্য প্রত্যক্ষই করে নাই; কারণ আর কিছুই নয়, পরাধীনতা ও দারিদ্র্য। অথচ ভারতবর্ষে প্লাষ্টিকশিল্প-সংক্রান্ত কাঁচামালের কোন অভাবই নাই, বরং আধিক্যই পরিলক্ষিত হয়। কাজেই উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং সরকারের আর্থিক সাহায্য লাভ করিলে আশা করা যায় স্বাধীন ভারতের প্লাষ্টিকশিল্প অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর অন্যান্য সমৃদ্ধ দেশের সমকক্ষ হইতে পারিবে।*

---

* এই প্রবন্ধ লিখিতে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে :—

(১) Science at your service. (George Allen & unwin Ltd.), (২) Journal of Scientific and Industrial Research, India—(June, 1946, (৩) British plastics (August, 1946; May, 1946; March 19,6,) (৪) Chemistry and Industry (May 24, 1947), (৫) G. E. C. Journal, (August, 1944) (৬) Nylon yarns (British Nylon spinners Ltd.).

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

আমার প্রতিবেশী কবিরাজ কৃষ্ণ কর ওরফে কালীকৃষ্ণ কর এম্-এর কৌমার পিতা ছিলেন কপোডেশানের কর-সংগ্রাহক। যে ছেলে একদিন হাকিম হয়েছিল সে যে বিদ্বান্ ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। বিদ্বান্ পুত্রের পিতা যে, যাকে তাকে বেহাই বলে কোল দিতে বিবেক সামান্য পাঁচ দশ হাজারের জন্য নিজের ছেলেকে পর করতে পারে না,—তা' সকলেই একবাক্যে না হলেও বহুবাক্যে স্বীকার করবেন।

'পর' এই শব্দটীর টিপ্পনী করতে গিয়ে কুলোক ভট্টের প্রিয় শিষ্য উলুক ভট্ট কি বল্‌ছেন শুনুন: ছেলের বিয়ে দিলে শ্বশুরের পুত্র দু'দিন যেতে না যেতেই বৌমার বাপকে বাবা ডেকে ডেকে পরের ছেলেই হয়ে পড়ে। মেয়ের বিয়ে দিলে কিন্তু ব্যাপারটা হয় ঠিক উল্টো; নিজের মেয়ে নিজেরই থাকে অথচ পরের ছেলেটি ফাউ পাওয়া যায়। তার মানে—আমে দুধে এক হয়, আঁদাড়ের আঁটি আঁদাড়ে যায়। আর এই জন্যই বাংলার মেয়েরা গর্ব্ব করে বলেন—'দশ পুত্রসম কন্যা যদি পাত্রে পড়ে'।

কোন এক সুপ্রভাতে কবিরাজকৃষ্ণ একটা দুর্ভর পণ করে বসলেন—মানে ও নগদে পনরটি হাজার হাতের ঘুঠোয় না পেলে নিজের হাতের টুকরো ছেলেকে পরের ঘুঠোয় তুলে দিবেন না। তাই কালীকৃষ্ণকে চোখ কেলে দুই কাহনা জাতীয় একটা মেয়ের বাপকে বেনিয়ে তোলার মতলবে কিছুদিন থেকে ফন্দি আঁটছিলেন, কিন্তু তাঁর বন্ধুকল্পা পণের কথা শুনে—চুলোর্দ্দি কা কথা—অনেক দূর কাৎলা বাইবা যাই মারতে সাহস পাচ্ছিল না।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে It to-day will not, to mo row may ন আজ না, কাল তা হতে পারে। কবিরাজের কপালেও তাই ঘটলো। অসম্ভব ভদ্দর বসন্তবিলাস বসুর মাটিক পাশ করা কুমারী কন্যা রেবারাণীকে কলেজে পড়াবার জন্যে কলকাতায় এসে কবিরাজ আর আমাদের মাঝখানের বাড়ীটা ভাড়া নিলেন।

আমাদের আর বসন্তবিলাসের ভাড়াটে বাড়ীর মাঝখানে একখানি সরু গলি মাত্র ব্যবধান - এত লাগালাগি বাড়ী দুটি যে, দেখে মনে হয় যেন এক বাড়ীর আলসে অপর বাড়ীর আলসেকে চুমো খাচ্ছে। বসন্তবিলাসের বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই মুহুর্মা ছাদে গিয়ে এক লাফে গলিটা ডিঙিয়ে রেবারাণীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এলেন। এসেই ছোট চোখ দুটি বড় করে বললেন—ওগো শুনছ, পাশের বাড়ীতে এক মস্ত বড় লোক এসেছে। সঙ্গে দুটফুটে একটি মেয়ে আর পরীর মত গিন্নী। হাজোর মালপত্র সঙ্গে। এত বাড়ী, এত ঘর রাখবে কোথায়?

সে ভাবনায় আমাদের কাজ কি? আমি হেসে বললাম। মুহুর্মা এর উত্তর দিয়ে জানালার পাশে

খুলে নূতন ভাড়াটেদের নূতন সংসার পাতা দেখতে লাগলেন।

আমাদের পড়শী করালী বাবু আর যাই হোক, কথার কৃপণ ছিলেন না। দু'দিন না যেতেই গায়ে পড়া হয়ে বসন্তবিলাসের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলেন, করালী-পত্নী সৌদামিনীও একদিন বসন্তবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা-শুনা করে এলো। স্ত্রী বাড়ীতে ফিরতেই করালী জিজ্ঞেস করলেন—কি গো কেমন লাগলো জমিদার-গিন্নীকে?

কেমন আবার লাগবে?—হেসে জবাব দিল সৌদামিনী—জমিদার গিন্নীরা যেমন হয়ে থাকে তেমনি,আবার কি?

তার মানে?

বুঝে নাও।

সেয়াকে বুঝি?

সেয়াকে বলে? ঠেকারে পা' মাটিতে পড়তে চায় না, কী কথাটাই না কইতে পারে! মুখ ত নয় যেন একখানা হই-ভাঙা খোলা।

করালী হেসে বল্লে, তোমার সাথেও জমিদার-গিন্নীর যাতায় দেখেছে দেখছি।

—মরণ আমার! আমি নাকি অমন সাজ-গোজ করে দোকানের পুতুলটি সেজে থাকি। ছিঃ!

—পরের সাজ-গোজ দেখলে মেয়েদের হিংসায় অমনি বুক জ্বালা করে।

—আর পুরুষদের বুকে সুখের ফোয়ারা ছোটে—

—ও-সব কথা যাক এখন; কি আলাপ-সালাপ হ'ল শুনি?

—শুধু আলাপই হ'ল; সালাপ করবার কুরসৎ পেলাম কই? জমিদার-গিন্নীর নিজের কথাই পাঁচ কাহন। তার বাপের বাড়ীর সম্পর্কে অনেক মেয়ে-পুরুষই নাকি বি-এ, এম-এ পাশ করেছে বসন্তপোলের মধ্যে তার বেয়াদবীই এই প্রথম বিদ্যাবিলাসের দেউড়ি ডিঙালো।

মেয়ে, সে-ও মায়ের মত ঠেকারে নাকি?

কাঁধালো নখে নাড়া দিয়ে সৌদামিনী বল্লে—না গো না, বড় ভাল মেয়ে মেয়ে, যেমন রূপে, তেমনি গুণে, আমায় দেখতে পেয়েই পা' ছুঁয়ে পেন্নাম করলে, কত সমীহ করে নিয়ে বসবার ঘরে বসালো: গিন্নী ছিল ওপর তলায়—ছুটে গিয়ে খবর দিয়ে এলো। তা-ই তালো মেয়ে। অমন একটি মেয়ে পেলে আজই বালীর বৌ করে ঘরে আনি। লক্ষ্মী-প্রতিমে, সারাক্ষণ মুখে হাসি লেগেই আছে।

স্ত্রীর মুখে অমন প্রশংসার বাণ ভাসতে দেখে করালীর বুক ধড়-ধড় করে উঠলো, পায়ে বিনা পণেই মেয়েকে বৌ আনতে ঝোঁক ধরে। তাই উপেক্ষার সুরেই বল্লে—কি যে বলো! অমন মেয়ে ন'য়ে ন'য়ে পড়ে আছে ঘাটে পথে, কিন্তু পনর হাজার দেবার ক'জন আছে?

সৌদামিনী স্বামীর হাত নখ নাড়া দিয়ে বল্লে—তোমার ঐ এক কথা—পনর হাজার।

—ভদ্রলোকের এক কথা?

—কেউ যদি হাত হাজার দিতে চায়?

—হাত হাজার কি বলতো? চৌদ্দ হাজার ন' শ' নিরানব্বই পনর আনা এগার পাই দিলেও নয়, হুঁ।

—তবেই হয়েছে বালীর বিয়ে, আমার কপালে 'বিধাতা' ছেলে-বৌ নিয়ে ঘরকন্না লিখেনি।

——বিধাতা না লিখে থাকেন, আমো কালি-কলম আমি লিখে দিচ্ছি—এই বৈশাখ মাসেই বালীর বিয়ে হবে, অমন শাঁসালো জমিদার—পনর হাজার ত' বসন্ত-বাবুর হাতের ময়লা।

সুরে একটু বিষণ্ণতা মাখাইয়া সৌদামিনী বল্লে—কলকাতায় কি টাকাওয়ালার আকাল পড়েছে? কত সম্বন্ধই ত' এসেছিল, টাকার পাইটা একটু কমালে বালীর বিয়ে হয়ে যেতো। কত ভাল ভাল বিলেত-ফেরতা ছেলে থাকতে বালীকে অত টাকা দেবে কেন?

—দেবে গো দেবে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রূপে অমন আর একটি পাবে কোথায়? ইউনিভার্সিটীর তরফ থেকে ডেপুটীর সুপারিশটা এই বের হ'ল বলে। তখন আর দেখা কেল্লা, হুঁ!

সৌদামিনী একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে—আর হয়েছে বালীর বিয়ে!

—হবে, নিশ্চয় হবে, হয়েই রয়েছে মনে কর। চল্লিশ পেরুলে কি হবে এখনও চোখে চালশে ধরেনি। দেখছি ত' সবই, তোমার ছেলের ওপর নজর পড়েছে।

—ও মা, সে আবার কি গো, কোন ভাইনীর আবার অসুখ পড়লো ?

—ভাইনী নয়—বাসন্তী।

—সে আবার কে গা ?

—বসন্ত বাবুর স্ত্রী।

—তার ও-নাম নয়—তার নাম মালতী।

—বসন্তের স্ত্রী যাদুকরীই যাবতীয়-সম্মত। তোমার নামও সৌদামিনী না হয়ে করালিনী হওয়া উচিত ছিল। এমন সময় কালীকৃষ্ণ এসে খবর দিয়ে গেলো বসন্তবাবু এসেছেন। শুনে করালীর মুখটা কোনোরেডের মত একটা লাফ দিল আনন্দে। স্ত্রীকে বললে—নিশ্চয় বিয়ের কথা পাড়তে এসেছে, যাও পয়লাগাটির কর্ম করো গে আমি বাইরে চললাম।

৬

ছেলের বেড়িয়ে বসন্তবাবু যখন বাসায় ফিরল তখন সন্ধ্যে উতরে গেছে। মালতীর সঙ্গে দেখা হতেই বললে বেড়িয়ে আর সুখ হলো না, অন্য দিন দেখা যাবে, তুমি সঙ্গে থাক—বেশ লাগে।

সেবা ত তৈরিই ছিল, আমিও পোষাক-ঘরে ঢুকেছিলাম, করালীবাবুর স্ত্রী এসেন কি না, তাই তোমার সঙ্গে যেতে পারলাম না।

যাক গে সে কথা, করালীবাবুর স্ত্রীকে কেমন লাগল ?

বেশ পাকা গিন্নী, কথাটও খুব ঝরঝরে, কিন্তু ভারী জেঁকো। ছেলের পরদে হাটিতে না পড়ে না।

জাঁক নয়, বাৎসল্যের অতি প্রকাশ, কি রকম ছেলে, হীরের টুকরো।

তা বটে, যেমন রূপ, তেমনি গুণ, সেবার জন্যে পাওয়া যায় না ছেলেটি ?

এখুনি সেবার বিয়ে কি ? বি-এ-টা পাশ করুক।

মালতী নিজের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতার গর্বে সুললিত ভঙ্গী সহকারে—ঐ ত তোমাদের রোগ, আর এরি জন্যে কত মেয়েকে আজীবন আইবড় থাকতে হয়। এম-এ,বি-এ পাশ করা মেয়েরা এম-এ, বি-এ পাশ করা ছেলে চাইবে ত ?

তাই পাবে !

হাঁ পাবে না আরো কিছু, ম্যাট্রিক পাশ করে হাজারে হাজারে, এম-এ বি-এ ক'জন পাশ করে ?

পঞ্চাশটে টাকা মাসলে সেবার জন্যে এম-এ, বি-এর অভাব হবে না।

আর টাকার বড়াই করতে হবে না, টাকাই যদি সব হতো তা'হলে তোমার এই মালতী আজ কইবাজারে কড়ে রাণী হতো, সৌদামিনীর মেয়ে অভিমানের গিন্নী হত না, বলেই চোখের কোণে কৌতুকের ঝলক খেলিয়ে মালতী তার হাসি হাসি মুখখানি অপূর্ব ভঙ্গীতে ঘুরিয়ে নিল।

বসন্তবিলাসও মুখে হাসির তরল একটি তরঙ্গ তুলে বললে, আহাহা কি সুখই করছে নয়া কস্তিনী ঠাকরুণ। বাপকে টাকার প্রলোভনে ভুলিয়ে যে রতনীকে কিনে নিচ্ছিল কইবাজারে রাজা তার কনিষ্ঠ কুমারের জন্যে—তার চিত্ত কি না হলে বলল এর মেয়ে অভিমানের জন্যে বিদ্যাধর-পুত্রে, আর তার নামের বিলেন।

বসন্তবিলাসের মুখ চোখ হবে—বামো বামো 'চন্দ্রমুখর' আর নাম-সুন্দর মশায়। কবে কোন দোকানী করেছি সে পুরাণো বাস্তুকি আর দিতে হবে না। যা বলছি শোন, মেয়ের বিয়েটা দিয়ে ফেলো। এমন ছেলে হাতছাড়া করো না।

কথাটা বোধ হয় ঠিকই বলছ। বিলিতি প্রবাদে বলে Marry your son when you will, your daughter when you can ছেলের বিয়ে যখন খুসি দিও, মেয়ের বিয়ে যখনই পার।

তবে আর কথা কি, অমন ভাল পাত্রের যখন আছে হাত বেরোয় বিয়ে— বলে মালতী একটু হাসলো।

মেখি।

আর মেখে কাজ নেই—এখানেই 'সমস্ত' করা।

দু'দিন সবুরই করো না, মেয়ে ত আর তোমার মত বিয়েপাগলী হয়নি ?

মালতী একটু কপট কোপের প্রহসন করে—যাক গে, দিতে হবে না বিয়ে। বসন্তবিলাস হেসে বললেন—দিতেই হবে বিয়ে, আর এই কালীকৃষ্ণের সঙ্গেই, কারণ তোমার 'না' মানেই 'হ্যাঁ', কি বলো ?

মালতী এক ঝলক হাসির সঙ্গে—ইচ্ছে হয় যাও, কিন্তু জানো ও নগদে পনর হাজার তার চেয়ে ?

তাই, এক পাই কমও নয়, বেশীও না, ভদ্রলোকের নাকি এক কথা।

তাহলে ত,ঘরোঘরি করার চেয়ে এক ঘরে চের সুবিধে।

তা'হলে চলো একটিবার মেয়ার ঘরে।

কেন ? মত নিতে ? আমি বলছি এ ছেলে তার অপছন্দ হবে না।

তবু চলো।

বেশ, চলো।

তিন

করালী বাবু বসন্তবিলাসকে দেখেই যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এই যে বসন্তবাবু, খবর ?

প্রতি নমস্কার করে বসন্ত—এই মন্দিরকল, আপনার কাজের ক্ষতি করলাম না ত ?

বিলক্ষণ, আমার আবার কাজ, হাতে পাঁজি মেরেই যে যাপার কি ?

আর বলেন কেন মশায়, তিনটে বোন চোপতে এই বয়সেই বেরার বিয়ে দিতে হবে। শুনে করালীর বুকখানা আর একবার লাফ দিল অকারণ, কি জানি মনের মধ্যে পাকাপাকি হয়ে গিয়ে থাকে। পাকা যাদুকরের মত মনোভাব গোপন করে কাঁহ হাসির সঙ্গে—অতি সুখবর, দেখবেন আমরা 'ইতরজন' যেন মিষ্টার হতে বাদ না পড়ি। কোথায় ঠিক হলো ?

ঠিক হলো কি বলছেন, বি-এ পাশের আগে বিয়ে দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু মালতী কৌতুকের মত ধরে বসেছেন বিয়ে দিতেই হবে।

উনি যখন বলছেন—দিন না এই অঘ্রাণেই !

পাত্রিতে দিন থাকলে না দিয়ে কি রেহাই পাবো ! এখন কথা হচ্ছে ছেলে যোগাড় করি কোথেকে ?

করালীর বুকটা তৃতীয় বার লাফ দিল আশায়—একটু সন্তর্পণেই বললো—ছেলের অভাব কি মশায় !

অভাব ত নেই জানি ; কিন্তু একটা যে-যাত্রা পণ করে বসেছি যে।

চমৎকৃত হয়ে করালী কি মুস্কিল ! আপনারও একটা পণ আছে নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ !

শুনতে পাই কি ?

আমার পণ নগদে ও দানে ষোল হাজার দিব, এক পাই কমও নয়, বেশীও নয়।

এ ত পণ নয়, এ যে দেখছি টাকার চাঁদ, বয়ের বাজারে বৈ বৈ কাণ্ড মাঝারেন দেখছি, বি-এ, এম-এ, এম-এস্, সিরা হুড়মুড় করে ছুটে আসবে !

আমি মশায় ও-সব পাশ-টাশের ধার ধারিনে ! ছেলেটি সুন্দর আর বংশটি ভাল হলেই হলো। পারেন এমন একটি ছেলে যোগাড় করে দিতে ?

করালীর বুকখানা আশায়, আনন্দে কেঁপে উঠলো, তাড়াতাড়ি চোক গিলে—ছেলে ত আমার ঘরেই আছে, হীরের টুকরো—কলকাতা ইউনিভার্সিটীর ছেলে,কিন্তু—

বসন্তবাবু লাফিয়ে উঠে করালীর হাত ধরে—আর কিন্তু টিন্তু নয় মশায়, দিন আপনার কালীকৃষ্ণকে আমার, অমন হীরের টুকরো ছেলে কি আর কাঁচকাঞ্চা খুঁজি ?

দিতে ত পারতামই কিন্তু আপনার মত আমারও যে একটা যে যাত্রা পণ আছে !

বসন্তবাবু মুখে দুশ্চিন্তার ভাব এনে—আঃ আপনার আবার কি পণ মশায়, সব বাটি করবেন দেখছি, শুনি পণটা ?

আমার পণ হচ্ছে—দানে ও নগদে যে পনর হাজার দেবে তারই মেয়ের সঙ্গে কালীর বিয়ে দিব। দেখুন ত আমাদের কি পরস্পরবিরোধী পণ !

বসন্তবাবু চোখে বিদ্রূপের কৌতুকাভাস মেখে আপনার ত ভালই হলো, পণও রক্ষা হলো, কাঁকতালে হাজার টাকা বেশীও পেলেন ! দিন মেয়ের সঙ্গে কালীকৃষ্ণের বিয়ে।

উহুঁ, তা হয় না' —ভদ্রলোকের এক কথা।

বসন্তবাবু দুঃখিত হওয়ার ভাণ করে গম্ভীরভাবে—তা চ'লে আর কি করা যায়, পারেন কালীকৃষ্ণের মত আর একটি ছেলে যোগাড় করে দিতে ?

কালীর মত ছেলে যোগাড় করা কি চারটিখানি কথা বসন্তবাবু, তার চেয়ে এক কাজ করুন—আপনি পনর হাজারই দিন—হোক দেবার সঙ্গে কালীর বিয়ে।

উঁহুঁ! তা হয় না—ভদ্রলোকের এক কথা।

কী বিপদ! দু'জনই ভদ্রলোক হলে চলে কি করে? আচ্ছা একটু বসুন, চট করে জিজ্ঞেস করে আসি।

করালী অন্দরে যেতেই বসন্তবাবু কৌচার খুঁটটি মুখে চেপে খানিকটা হেসে নিলেন। মিনিট পাঁচেক পরেই সহাস্যে করালী এসে বললে—হাসে কি মা'মার সাহেবরা মেয়ের অত খাতির করে? কী সূক্ষ্ম ওদের বুদ্ধি।

তা হলে ষোল হাজারেই রাজি, কি বলেন?

উঁহুঁ। কালীর মা বললেন, আপনি যানে ও নগদে পনের হাজারই দিন, আর বেয়াই তাঁর স্বাস্থ্যটিকে হাজার টাকা দিয়ে প্রণাম করুক। দেখুন, সমস্যাটা কেমন জল হয়ে গেল।

ঈষৎ হাসি চেপে পরমোল্লাসে বসন্তবাবু করালীকে সাবাস করে—তা হলে আজ উঠি?

করালী নমস্কার করে জিজ্ঞেস করলে—তা হলে এই অঘ্রাণেই পাকা হলো?

কি করে বলি? আপনি ও বছইয়ের হাতে হাই-কোর্ট পেয়ে নিজের কেসটা সওয়াল করে নিলেন, আমিও কালীর 'হেকে' আর কি পেশ করি গে—হাঁ বেয়াই হলে জানিয়ে যাবো। এই বলে বসন্তবাবু বেরিয়ে পড়লো।

চার

করালীকৃষ্ণ যেদিন বসন্তবিলাসকে বৈবাহিক সম্পর্কে লভাইয়া আলিঙ্গন করল, সে থেকে পনরটি বছর কাল-সাগরে আত্মবিসর্জন করেছে, আর জগতেও অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। করালীর লোকান্তর হয়েছে, কালীকৃষ্ণ ডেপুটী হয়েছে, আমার চুল পেকেছে, পেনসন্ হয়েছে, আরো অনেক কিছু হয়েছে। কলকাতায় সিদ্ধবাবার আশ্রম হয়েছে, মুছলা সাধুমাকে ছেড়ে, ধ্যান-ধারণা ছেড়ে সিদ্ধবাবা ও রাধারাণীর অনুরাগিণী হয়েছে। আশ্রমে রাধারাণী একটি প্রাণবন্ত যন্ত্রবিশেষ। সে হচ্ছে আশ্রম-গৃহস্থালীর সর্বময়ী, কর্ত্রী—ঝি চাকর থেকে আরম্ভ করে সর্বশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ ভক্তদের এবং সিদ্ধবাবার নিজের সুখ-সুবিধা যা কিছু সবই তাকেই দেখতে হয়। সে যদি যোলদিন আশ্রমে অনুপস্থিত থাকে তা হলে আশ্রম-তন্ত্রী মুহূর্তেই বানচাল হয়ে পড়ে। কাজেই রাধারাণীকে আশ্রমেই থাকতে হয় দিন-রাত্রি, ফলে নিত্য-সঙ্গসুখ যি স্বামীর মত অতুলানন্দকেও আশ্রমেই থাকতে হয়। অতুলানন্দ একাধারে রাধারাণীর স্বামী, আর আশ্রমের অধ্যক্ষ—দুই ই।

রাত্রি প্রায় দশটা, বহিরাগত ভক্তরা সকলেই চলে গেছে, বাসপুরের জমিদার গোপিকারঞ্জন গুপ্তের পত্নী বিভাবতী আশ্রমের 'ভাল মা' অতুলানন্দের সঙ্গে ষোড়শেশ্বরীর পূজা দিতে কাশী রওনা হয়ে গেছেন। ঠাকুর-চাকর খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাতি নিভিয়ে যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে। আশ্রম বাড়ীটির নীচ-উপরে একটি গভীর নীরবতা থম থম করছিল।

ঘড়িতে টং টং করে এগারোটা বাজলো, দোতলার একটি ঘরের দুয়ার খুলে নীলাম্বরী-পরণে রাধারাণী সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে এল, সিদ্ধবাবা তখন মুক্ত আকাশের তলে ঊর্ধ্বনিমীলিতে নেত্রে গভীর ধ্যানস্থ, রাধারাণীর শুভাগমন হয় ত টেরও পেলেন. একটু পরেই একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আপনা আপনিই বলে উঠলেন—তাই করবো, পাপ-পুণ্যের দায়-দায়িত্ব তোমার মা। আমি বদ্ধ, তুমি মা যন্ত্রী—যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—তুমি যা করাও আমি তাই করি। চোখ মেলে রাধারাণীকে দেখে অতি গাঢ় কণ্ঠে—বাবে শ্রীকৃষ্ণ তখনই তালো। অষ্টমী ত্রিভঙ্গ হলেও অন্তরটি সরল, আবির্ভাব থেকে তিরোভাব পর্যন্ত তাঁরটি মাত্র চিন তালে বিভক্ত। ব্রজের কৃষ্ণ, গীতার কৃষ্ণ আর যাবকাদ কৃষ্ণ। কাজেই এঁকে চিনতে জানতে কোন বেগাম নেই, কিন্তু রাধে ঐ যে মুক্তবালাধারিণী কালো বাটি আমার—ওঁকে চেনা, ওঁকে জানা বড় শক্ত।

রাধারাণী সিদ্ধবাবার দিকে হাতখানেক এগিয়ে বলে আবেগভরা অধীরতায় প্রশ্ন করলে, বা কি আজ দেখা দিলেন না?

দিলেন বই কি রাধে, তবে কি জান মা আমার জগন্মাতা, তাঁর অনন্ত রূপ, অনন্ত শক্তি, তাঁর মনের গতিও যেমনি সমুদ্রতরঙ্গের মত অস্থায়ীন, আর বাবা মহেশ্বরের জটারই মত জটিল। তাই কখন যে মা দুষ্ট হন আর কখন কেনই হন বোঝা কঠিন।

রাধারাণী আর একটু এগিয়ে উদ্বেগাকুল কণ্ঠে—তবে কি হবে? যে করেই হোক গোপিকারঞ্জনকে জেল থেকে বাঁচাতেই হবে যে? জেল হলে কি 'ভাল মা' শ'য়ে শ'য়ে টাকা দেবেন আশ্রমে? আজও কাশী রওনা হবার আগে বলে গেলেন—কর্ত্তা ভালয় ভালয় খালাস পেলে আশ্রম-'ফণ্ডে' দশ হাজার টাকা দেবেন।

রাধে, তুমি কি মনে করছো যাকে আমি সহজে ছেড়েছি? অনন্তরূপময়ী জগন্মাতা যশোদেশ্বরী-মূর্ত্তিতে একটু আগেই দেখা দিয়েছিলেন। তাঁর পূজা দেওয়ার জন্যে ভাল-বাবে কালী পাঠান হয়েছে জেনে মা প্রসন্নাই হয়েছেন।

মা প্রসন্না হয়েছেন জেনে আনন্দিত খুশি হলাম। মা কি বললেন?

মা বললেন—বৎস, আমাকে পূজা দেবে কোন লাভ নেই, খুলনা এখন যশোহরের অন্তর্গত নয়—আমার ভূষিত-ভিক্ষনের এলাকার বাইরে। আমার দ্বারা কোন কাজ হবে না।

ও মা, তবে কি উপায় হবে সিদ্ধমাতা? বলে রাধারাণী দু'চার ইঞ্চি এগিয়ে বসলো। সিদ্ধমাতা রাধারাণীর দিকে স্নিগ্ধপুরুষোচিত সস্নেহ নয়নে চাহিয়া—রাধে, হবে না বললেই কি মাকে ছেড়ে দিলাম। আমি স্থানে এমনই ব্যবস্থা আনলাম, যাতে করে না একেবারে নাগপাশের মত স্থানেপাশের কঠিন বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেলেন। পালাবার জন্য ছটফট করলেও মা আর এক পাও নড়তে পারলেন না।

রাধারাণী চাপা গলায় খিলখিল করে হেসে—তা-বী মজা তো!

তারি মজা, মা মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। মা বললেন—আরে ক'স কি করিস কি? ছেড়ে দে বেটা, শীগ্‌গির ছেড়ে দে। যশোদেশ্বরকে সিদ্ধি খুঁটে খাওয়া ছেলে ফিরে আসিনি, নন্দী ভৃঙ্গী ছেঁড়া দু'টোকে খেতে দিয়ে আসি নি, তারা ঘরময় কিরের ছটফট করছে। সদাশিব হয়ত রেগে টং হচ্ছেন। যে বাবা ছেড়ে দে, লক্ষ্মী আমার, সোনার চাঁদ আমার।

ছেড়ে দিলেন?

না গো রাধে না, অত সহজে কি পার পাবার যো আছে? যাকে বললাম গোপিকারঞ্জনকে জেলের ঘর থেকে বাঁচিয়ে দাও মা, তোমাকে এক্ষুণি ছেড়ে দিচ্ছি।

মা কি বললেন—রাধারাণী অধীরতার সহিত জিজ্ঞেস করলো।

মা বললেন—দুই ছোঁড়া ভারী নাছোড়বান্দা। যা, মকদ্দমাকালীকে ডাক গে, যা করতে হয় সেই করবে, গোপীকারঞ্জনের জেল হবে না—বলেই মা অন্তর্দ্ধান করলেন।

সচকিত ভাবে রাধারাণী—মকদ্দমা-কালী?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ—মকদ্দমা-কালীই। একটু আগে বললাম না জগন্মাতার অনন্ত রূপ? মকদ্দমা-কালী জগন্মাতার অনন্ত রূপের একটি রূপ।

কি আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্যের কিছুই নেই রাধেরাণি, মায়ের লেখবার কালি—তারই কত রূপ—ভূষো, ধোঁয়া, নীল, কয়লা কালো, সোণালী, রূপালী, বেগুনী—আরো কত কি, আর জগন্মাতা হলেন গিয়ে দেবাদিদেব মহাদেবের গৃহিণী; তাঁর কি রূপের অন্ত আছে? তিনি ভদ্রকালী, শ্মশান-কালী দক্ষিণা কালী, রক্ষা কালী, ফিরিঙ্গী কালী, ঠনঠনে কালী, চাকুরী কালী, ডাকাতে কালী, জয় কালী, ক্ষয় কালী, মকদ্দমা-কালী আরো কত কি মায়ের রূপের কি আর অভাব আছে?

রাধারাণী সবিস্ময়ে—বাব্বা! এত রকম কালীও আছেন! মকদ্দমা-কালীকে ডেকেছিলেন বাবা?

ডেকেছিলেম বই কি রাধে।

কি বললেন?

যা বললেন তা কি তোমরা করবে?

কি যে বলেন? আপনি স্বয়ং ভগবান, মায়ের আদেশ আর আপনার আদেশ কি কিছু তফাৎ আছে?

আপনার আদেশ, মায়ের আদেশ পালন করবো সে ত মহাভাগ্যের কথা! কি করতে হবে আদেশ করুন, আমি এখুনি তা করতে রাজি আছি।

হাবে, তুমি সত্যি বড় ভক্তিমতী, ভাগ্যবতী, আমার এইবারের লীলা শেষের পর তুমিই হবে এই আশ্রম-পালিকা। শোন মকদ্দমা-কালী কি বললেন। মা বললেন —যেমন জগন্নাতার অনন্ত রূপ, যমের বাড়ী যাওয়ার অনন্ত পথ, অঙ্গনা-মনের অনন্ত ভঙ্গিমতা, তেমন মকদ্দমা জিতবারও অনন্ত পথ। শুধু বয় ও দত্তের যারা সব মকদ্দমা জেতা যায় না। কোন কোন সময় দলিল জাল করতে হয়। নথী সরাতে হয়, সাক্ষী ভাগাতে হয়, মিথ্যে সাক্ষী জোগাড় করতে হয়। দপ্তরের ছোট বড় কেরাণী-দের খুষে বশ করতে হয়; দিলকের উকিলকে টাকায় কিনে নিতে হয়, হাকিম আর তার উপর ওয়ালা তার স্ত্রীকে ভয়, ভক্তি, ভালবাসা, প্রলোভন দেখিয়ে মুঠোর মধ্যে আনতে হয়। টং টং করে ঘড়িটা বাজল।

এ সব কি করে হবে?

সে কথা তোমার সঙ্গে পরে হবে রাধে, আজ অনেক রাত্রি হয়েছে এখন বিশ্রাম করা যাক।

মা-বাবা যা ইচ্ছে—বলে রাধারাণী মাথার কাপড় খানিকটা টেনে দিল।

পাঁচ

পেন্সন নিয়ে বেকার বসে থাকায় অনভ্যস্ত সময় সময় মনের দুয়ারে এসে হানা দিয়ে যাচ্ছিল। এতে ভয় পেয়ে অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুদের অনুকরণে নিত্য শ্রীপাঠাদি শুনে সোজা পথে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার যোগাড় করছিলাম। মৃদুলা নিত্য সিদ্ধবাবার আশ্রমে যাওয়া-আসা করছিলেন। তাঁর ইচ্ছা আমার পেনসনপ্রাপ্ত বান্ধবদের মত আমিও ফিরে মুখিই হই। মৃত্যু ও বাসব এই উভয় সঙ্কটে পড়ে যখন বাণীবাসের অন্নকাল বুনছিলাম আর গুনছিলাম —এমন সময় হঠাৎ একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে মৃদুলা এসে বললেন—ওগো শুনছো, তোমার একটা চাকরী যোগাড় করে এলাম; পরশুই কিন্তু খুলনা যেতে হবে।

শুনে ত আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম—বলো কি, আমার চাকরী?

হাঁ গো হাঁ, তোমারই, আমার নয়। রাণীদিকে ধরে বাগিয়ে নিলাম কাজটা।

হুঁ কাজটা কি শুনি?

—সিদ্ধবাবার খাস কেরাণীর কাজ, প্রথম মাসে দু'শ' দেবে।

—সিদ্ধবাবা এত টাকা পাবে কোথা? তোমার মত ফষ্টি-নষ্টি।

—কী যে বলো শোন, সিদ্ধবাবার টাকার অভাব কি? টাকায় আড়িল সে।

রাণীদির যে গয়না-পাটি সে সবই ত' বাবার দেওয়া।

—কে বললে তোমায়?

—কেন, রাণীদি নিজেই—আবার কে বলবে?

আমি মনে মনে ভাবলাম—সিদ্ধবাবা অনেক বিষয়েই স্বয়ং সিদ্ধ। আর এই রাধারাণীই হচ্ছে গিয়ে সিদ্ধবাবার টোপ—যার ফাঁদে পড়ে জড়বুদ্ধি ও বর্ষীয়ান এ দুই বাবার ভক্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

—অমন গুম হয়ে কি ভাবছো?

—ভাবছি, তোমার সিদ্ধবাবা রইলেন এখানে, আর কেরাণী খুলনা গিয়ে কি করবে?

—ঐ ত' তোমার দোষ; দূর-দর্শী হওয়া চাই। খুলনায় গিয়ে কি করবে সে-খবরে তোমার কি কাজ? যেতে বলেছে, চলো, সিদ্ধবাবার এক কথা, হাকিমের হুকুম নড়লেও সিদ্ধবাবার কথার নড়-চড় নেই। আশ্রমের সবাই, এমন কি রাণীদিও টুঁ-শব্দটি না করে সিদ্ধবাবা যা' বলেন তাই করে। সিদ্ধবাবা সাক্ষাৎ ভগবান্।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়—বলে আমি চুপ করলাম। মুহূর্তেকে সিদ্ধহস্ত সিদ্ধবাবা আর রাধারাণী নূতন করে কি দুরভিসন্ধি সাধনে সচেষ্ট হয়েছে সে-দুর্ভাবনায় মন আমার তখনকার মত ডুবে গেলো—আমি মৃদুলার উপস্থিতি আর চায়ের পেয়ালা দুই-ই ভুলে গেলাম।

তিন চার দিন হ'ল খুলনায় এসেছি, মৃদুলার কী আনন্দ। আমার দু'শ টাকা আয় বৃদ্ধি তার উপর খুলনার বাজার—কলকাতার আধাদরে ঘি, দুধ, মাছ আর

পাক দাদী পেয়ে দরোয়ানের বন্ধুরা সকলেই যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। আনন্দের উপর আরও আনন্দ হলো বিলাসের মেয়ে রেবারাণীকে পড়বার পেয়ে। কালীকৃষ্ণ এখন খুলনায় ডেপুটী, আমাদের বাড়ীর একখানা বাড়ীর পরেই তাদের ছবির মত সুন্দর বাংলো। রেবার সঙ্গে একদিনেই মৃদুলার খুব ভাব হয়েছে। মৃদুলা নিত্যি দুপুরে মা গেলে রেবা গান-অভিনয়ের পালা সুরু করে।

নির্জলতা রেবার ভাল লাগে না। সে চায় লোক-জনের আসা-যাওয়ায় বাড়ী সরগরম থাকে; কিন্তু স্বামী ডেপুটী, তায় অবিবাহিত বলে তাদের বাড়ীতে সাধারণ লোকজনের বড় যাতায়াত নেই। রেবার বাপের বাড়ীতে প্রজা, উমেদার, তাঁবেদার, সেলাম-পাওনাদার—আরো কত রকম লোকের সদা সমাগম। তাই রেবাকে খুসি করতে কালীকৃষ্ণ এক মজার ফন্দি বের করেছে। যেখানেই বদলি হোক না কেন, নগদ দামে সে কখনো কোন জিনিষ কেনে না। কাজেই বাড়ীতে হামেশাই পাওনাদারের আনাগোনা লেগেই থাকে, আর এই হট্টগোলে রেবা ঠিক ছেলে মানুষটিরই মত খুসী হয়। কালীকৃষ্ণের আর একটা বৈশিষ্ট্য—সে জোড়ে ছাড়া কোন দামাদিকতা রক্ষা করতে যায় না। এই কৃত্রিমের অপূর্বসংযোগে সর্বত্রই অমরত্ব লাভ করে আসছে। আর এরই জন্যে সদরে কালীকৃষ্ণ উপরওয়ালা হ'লেও অন্দরে রেবাই সদর-ওয়ালা।

আমাদের পিঠোপিঠি সিঙ্কবাবা ও রাধারাণী এক বিরাট লট-বহর নিয়ে এসে আমাদেরই বাসায় উঠলো এবং সাময়িকভাবে বাসাটাকে "আশ্রমে" পরিণত করে ফেললো। পরের দিনই দুপুর বেলা মৃদুলার সঙ্গে রাধারাণীও রেবাদের বাড়ীতে বেড়াতে গেলো। আলাপ-পরিচয় হওয়ার পর রাধারাণীকে রেবা জিজ্ঞেস করলো—এসেছেন যখন থাকবেন ত' কিছুদিন?

—না বোন, থাকবার যো নেই; যজ্ঞিটা শেষ হ'লেই চলে যাবো।

—ও! আপনারা যজ্ঞি করতে এসেছেন! কিসের যজ্ঞি?

—দাদপুরের জমিদারবাবুর স্ত্রী সিঙ্কবাবাকে খুব ভক্তি করে; জমিদারবাবুর সঙ্গে বিপক্ষ—মোকদ্দমায় আসামী হয়েছেন। কে নাকি এক কালীকেষ্টো ডেপুটী আছে এখানে—তা বাঁ বড়া হাকিম নাকি সে। সকলেই বলছে জমিদারকে জেলে দিবেই সে।

বাবাও বলেছেন—দেখি কার সাধ্যি জেলে দেয়—আমি 'মারণ' যজ্ঞি করবো।

মৃদুলা আতঙ্কিতা হয়ে—ও-মা: তাই নাকি রাণীদি? আমরা ত' এর কিছুই জানি নে। কালীবাবু যে রেবার স্বামী—রাণীদি।

—তাই নাকি? তবে ত' বড় বিপদের কথা হ'ল—বলেই রাধারাণী রেবার আতঙ্ক-ক্লিষ্ট মুখখানি আপাদে দেখে নিল।

আকুলিত কণ্ঠে রেবা জিজ্ঞাসা করলে—আইনমত বিচার করবেন, এতে বিপদের কি আছে?

রাধারাণী অন্তরে খুসী হয়ে—বিপদের নয়—বলে কি মেয়ে? আগে কি তাই জানতাম ডেপুটীবাবু তোমার বর? এখন ত' আর উপায় নেই—বাবা অভিচার-যজ্ঞে হোতা হয়েছেন।

তাতে কি হয়েছে? রেবা উদ্বেগাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

—শুনে আর কি হবে এখন বলে রাধারাণী ছল করে চোখের জল মুছলো আঁচলে।

—তবু শুনি? বলে রেবা জিদ করলো।

রাধারাণী—যেন বড়ই অনিচ্ছায় বলতে লাগলো এমন ভাব দেখিয়ে—বাবা পঞ্চাচারী হয়ে যার নাম করে যজ্ঞে আহুতি দেবেন শুকনি সে সন্ন্যাস রোগে মুখে ফেনা উঠে চলে পড়বে। আর যমদূতরা এসে তার আত্মাটাকে কাঁটাবন দিয়ে টেনে হিঁচড়ে কুম্ভীপাকে নিয়ে ফেলবে—সেখানে হাজার হাজার বাঘুন-খেকো কুমীর তাকে পাহলে খাবলে খাবে।

রেবা মূর্ছা গেলো। মৃদুলা ও রাধারাণী তার চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে। জ্ঞান হতেই রাধারাণীর পা' দু'টো জড়িয়ে ধরে—দেই মা রক্ষে কর, বলে রেবা কাঁদতে লাগলো। রেবার অবস্থা দেখে মৃদুলার বুক ফেটে যাচ্ছিল। সে-ও রাধারাণীকে

অনেক করে বল্লে—যাতে সিংহবাবাকে বলে মক্তিটা বন্ধ রাখা যায়।

রাধারাণী গম্ভীর হয়ে বল্লে: মক্তি বন্ধ! অসম্ভব! আকাশ ভেঙে মাথায় পড়তে পারে, বাবার কথার নড়-চড় হবে না। তার চেয়ে যাতে জমিদারবাবু খালাস পায় তাই করো:—আমি বাবাকে বলে আহুতি দেওয়া বন্ধ রাখবো।

—যে-আইনী করতে তিনি রাজী হবেন না—বলে সেবা তার জলে-ভেজা চোখ দু'টি কাতরভাবে রাধারাণীর মুখের উপর ধরলো।

—না রাজি হলে কি আর করবো—বলে রাধারাণী উঠবার ভঙ্গি করলো।

মৃদুলা জিজ্ঞেস করলো—রাধারাণীদি, কোনই কি উপায় নেই?

—না, সঙ্কল্প পড়া হয়ে গেছে।

সেবা দ্বিতীয়বার মূর্ছা গেলো। জ্ঞান ফিরেছে দেখে মৃদুলা বল্লে—অমন উতলা হোয়ো না। একটু ধৈর্য্য ধরে থাকো। দেখি চেষ্টা-চরিত্তির করে কোন সুরাহা করতে পারি কি না। এই কাল্পনিক আশ্বাস দিয়ে মৃদুলা বিষণ্ণ মনে রাধারাণীর অনুগমন করলো।

পরের দিন বিষণ্ণ মুখে সেবাই রাধারাণীর সঙ্গে দেখা করতে এলো। মৃদুলা রাধারাণীকে বল্লে—বাবার সঙ্গে কি কথা হয়েছে সেবাকে বলো। রাধারাণী আড় চোখে সেবাকে দেখে নিয়ে—বললে আর কি হবে? ওরা ভদ্রের মারপ, উচ্চাটন, বশীকরণে বিশ্বাস করে না, খাঁটি ইংরেজ পোরা যা বিশ্বাস করে, দু'পাতা ইংরেজী পড়ে আর দু'টো পাশ-বালিশের ওয়াড় পরে বাঙালীরা তা বিশ্বাস করে না। ও-সব বিষ্টানির মধ্যে আমি নেই, বল্লে হয় তুমিই বলো। মৃদুলা বল্লে—বাবা রাজি হয়েছেন আহুতি দেবেন না; কিন্তু জমিদারকে খালাস দিতে হবে কালীবাবুর।

—কত বল্লাম, কত বোঝালাম, তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন না।

রাধারাণী একটু নরম গলায় ও কি একটা কথা হ'ল মেয়ে? স্ত্রীর কথা যে না শোনে সে আবার কি রকম স্বামী? স্ত্রীর কথায় উঠবে, বসবে, মরবে, বাঁচবে—তবে ত' স্বামী। ভালো কথায় না শোনে কামাকাটি করো, উপোস দাও, চুপে শোও, সুমুখে যেও না। এতেও কাজ না হয়—বিষ খাবো, গলায় দড়ি দিবো, জলে ডুবে মরবো, ব্লাড্রিড যাবো, কেরোসিন ঢালিয়ে মরবো—বলে ভয় দেখাও। দেখবে বাপ বাপ বলে খালাস দেবার পথ পাবে না। যাও, বাড়ী যাও, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কি করবে? স্বামীকে বাঁচাতে চাও—যা বল্লাম করো গে।

সোমবার এস্‌ডি ও'র কোর্টে লোকে লোকারণ্য, সকলেই সমুল্লাসে প্রত্যাশা করছে জমিদারের জেল হবে; কিন্তু হায় বেচল—বেকসুর খালাস।

মানব-জীবনে গীতা

অধ্যাপক হেমন্তকুমার বসু

মানুষ সুখের ভিখারী। জীবনের অস্থিরতার মধ্যে তাহা খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু যখন কথঞ্চিৎ স্থিরতা লাভ হয় এবং তাহার ফলে আধ্যাত্মিকতা হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তখন সেই রসের অনুভূতি তাহাকে সুখের প্রথম আস্বাদ দেয়। তাহার এক উন্মাদনা উপস্থিত হয়। তখন ভাবে, আর ভয় নাই! ভয় কি সত্যই নাই? কৃষ্ণকে সখা পাইয়া অর্জুনও এইরূপ ভাবিয়াছিল। সে বুঝিতে পারে নাই—ইক্ত হয়ে উপনীত অন্য লোকেও বুঝিতে পারে না—যে, তাহার পক্ষে তাহার অন্তরে লুকাইয়া আছে। সেই পক্ষ সংস্কার। সংসারের সংস্কার, পুত্র-কলত্রাদির প্রতি স্নেহ-সংস্কার, কর্তব্য সংস্কার, অবসাদের ধর্ম-সংস্কার। চিত্ত হইতে সকল সংস্কার দূর হইয়া না গেলে, চিত্ত শুদ্ধ হয় না, আধ্যাত্মিকতারও পূর্ণ বিকাশ হয় না। মলিন দর্পণে কি যথাযথভাবে বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়?

অর্জুনের চিত্তে সংস্কার ছায়া তাহার চিত্তকে মলিন করিল। অর্জুনের বিষাদ উপস্থিত হইল। এই বিষাদযোগের যথন আলোচিত হইয়াছে। এই বিষাদ তিনটি রূপে প্রকাশ পাইল। প্রথম রূপ—আত্মীয়স্বজনের বিনাশ-আশঙ্কায় মোহ। সাধারণের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। মমতা হইতে সকলের আসে এবং তাহা হইতে শোকের উৎপত্তি। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সহজাত উপলব্ধিসিদ্ধ অর্জুনের ইহা কেন? যেহেতু সংস্কার লোপ হয় নাই। দ্বিতীয় রূপ—শারীরিক বিষয় ভোগের আশঙ্কায় মোহ। সমাজ ধ্বংস ও কুলধর্মের ধ্বংস। তৃতীয় রূপ—ধর্মাধর্মাদি-সম্বন্ধ শুভবুদ্ধির হানি। ত্রিবিধরূপ সংস্কার অর্জুনকে অস্থির করিয়া তুলিল। মানুষ যখন ভগবদনুভূতি লাভ করে, তখন সে তাহার সকল দুঃখ তাঁহার নিকটে নিবেদন করে। অর্জুনও তাহাই করিল। ধর্মশাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়া দেখাইল—সে বড় বিপদে পড়িয়াছে। মানুষ কিরূপ চিত্তে চিন্তা করে তাহার কর্তব্য কি? কিন্তু চিন্তার মীমাংসা পায় না। সংস্কার তাহার স্থিরতা নাশ করিয়াছে। একদিকে স্থিরচিত্ততার সুখস্মৃতি, অন্যদিকে সংস্কারসমূহের স্থিরতা নাশের চেষ্টা, একদিকে কৃষ্ণের সমক্ষত্ব, অপরদিকে কৃষ্ণের হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য সংস্কারের আক্রমণ। অর্জুন এ অবস্থায় যাহা করিল, এরূপ অবস্থাপন্ন যে কোন মানুষ তাহাই করে।

প্রথমতঃ অর্জুনের চেষ্টা ছিল, শাস্ত্রাদি আলোচনার দ্বারা বুঝাইতে যে, যুদ্ধ অকর্তব্য। কিন্তু যাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার যুক্তির সমর্থন করিলেন না। মানুষও যখন স্থির চিত্তে এই জটিল সমস্যার আলোচনা করে, আত্মাতে নিবেদন করে, তখন সে দেখে, চিত্তে কোন সন্তোষ নাই। কিন্তু কৃষ্ণের নাস্তিত্বসমর্থন, আত্মজনের আত্মজনত্বে, অর্জুনের মনে একটি ভাব উপস্থিত হয়। জীবনের দুঃখ-কষ্টে মাঝে চিত্তেও হয়: আমি না বুঝিয়াছিলাম, তিনি মঙ্গলময়, তিনি রক্ষাকর্তা, তিনি চালক—হৃদয়ে আবরূপে থাকিয়া তিনি সব করান। এখন আবার ভাবিতেছি—আমি জ্ঞানী, কর্মের কর্তৃত্ব আমার। এ যে ভুল সোধনে ভুল! অভিমান ত্যাগ করিতে যাইয়া আবার অভিমানের অধীনতা!

সংস্কার মানুষকে এইরূপেই দারুণ দুঃখজালে বাঁধে। অল্প সংস্কার পরাজয় করিতে পারিলেও ধর্ম-সংস্কার জয় করা বড় কঠিন। ইহা ভীষণ শত্রু।

যিনি আছে প্রাণকুলা সমাপনান্তে শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধ আসনে বসিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যানপাঠ, আচমনাদি করিয়া ভগবচ্চিন্তা, মন্ত্রজপ, স্তব প্রভৃতি করিবে। সাধনার ফলে সাধকের ভগবচ্চিন্তায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। একদিন অশুদ্ধ অবস্থায় ইষ্টদেবের মূর্তিখানা সাধকের মনে জাগিয়াছে। প্রিয়বস্তু যখন তখন মনে আসে, কালাকালের অপেক্ষা করে না। সাধক অমনি মনে মূর্তির ধ্যান করিয়াছে, নাম স্মরণ, কীর্তনও আপনা হইতে চলিয়াছে। ভক্তিরসে হৃদয় পূর্ণ, প্রেমাশ্রু বহিতেছে। সাধক যেন সংসারের মলিনতা ছাড়িয়া কোন এক আনন্দের রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। এমন সময় হঠাৎ ব্যাঘাত হইল। সাধক তখন ভাবে, হায়, হায়! এ কি করিলাম? অশুচি অবস্থায় ভগবানকে ডাকিলাম! আমি ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম দ্বারা নরকের পথ আরও করিলাম! ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি? ইত্যাদি। বিষয়-সংস্কার ত্যাগ করা কর্তব্য ইহা শুনিয়া শুনিয়াও অনেকে বাধা করিতে পারে, কিন্তু ধর্মসংস্কার ত্যাজ্য ইহা ভাবিতেও ভয় হয়। সুতরাং ইহা ত্যাগ করা কঠিন। ধর্ম কতকগুলি বেদবিহিত কর্ম। ইহার অনুশীলনের নাম ভগবানে ভক্তি। বৈধ্য দিয়া হইলে

উপায়ের আবশ্যকতা থাকে না। শাস্ত্রও বলেন, যতদিনে তত্ত্বজ্ঞান আমাদের হয় না হয়ে, ততদিন বেদোক্তাদির অনুশীলন। ভাগবতে আছে, ভগবান্ বলিয়াছেন—বর্ণাশ্রমের অনুশীলন ততদিন করিতে হইবে "মৎকথাশ্রবণাদৌ বা যাবন্ শ্রদ্ধা ন জায়তে।" কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের যে সাধককে ছাড়ে না, বরং সহায়-লাভেই বিঘ্ন ঘটায়। অর্জুনের সেই অবস্থা, মানুষের জীবনের ইহা রীতি।

অর্জুন যখন যুক্তির, সমাজনীতি, ধর্মনীতির আলোচনা দ্বারা কৃষ্ণকে বুঝাইবার প্রয়াস অভিমানের ফল। তখন এই বিষাদ উপস্থিত হইল—মোহে পরিণত হইল। মানুষ আত্ম-চিন্তার ফলে বুঝিতে পারে যে, জীবনে তাহার যত অভিযোগ সবগুলিই মূলে অভিমান। অর্জুন কৃষ্ণরূপী আত্মার নিকটে নিবেদন করিল তাহার সংসার যুদ্ধে পরাজয়। আমি তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মবিরোধী। কিন্তু একি! সংসার যে আমাকে সর্বতোভাবে অভিভূত করিতেছে! এত সাধনা, এমন কি স্বয়ং ভগবান্ আমার গুরুর চালক, তিনি এই যুদ্ধ আমাকে করাইতেছেন, কিন্তু আমি ত তাঁহার আদেশ পালন করিতে পারিতেছি না। অভিমান আমাকে ডুবাইল। এখন উপায়?

মানুষ সাধনা, কর্ম প্রভৃতির দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে জীবনে উন্নতি লাভের জন্য। আত্মানুসন্ধানের যোগ্যতা পায়, আত্মার নির্মল জ্যোতিরও আভাস পায়, আনন্দানুভূতিও হয়। কিন্তু তথাপি সন্দিগ্ধের অভিমান আসিয়া সকল বিনষ্ট করে। এখন উপায়? যাহা করণীয়, তাহা করা হইয়াছে। ভগবান্‌ও অন্তরঃ ভাবরূপে উপস্থিত। বিষমাপন সম্মুখে আসিয়াছে নিশ্চয়। হাঁ—ইহা চরম শিক্ষার উপায়।

ঠিক এই শিক্ষাটি দিবার জন্য পৌরাণিক এক উপাখ্যান বলিয়াছেন। অসুর যুদ্ধে প্রপীড়িত দেবগণ মহাশক্তির আরাধনা করিল। মা অম্বিকারূপিণী আবির্ভূতা হইয়া দুর্গলোচন, চণ্ডমুণ্ডপ্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে রক্ষা করিলেন। মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নে প্রপীড়িত হইয়া সাধনা করে, মহাশক্তির অনুগ্রহ লাভ করিয়া প্রবৃত্তিদমনে সমর্থ হয়। কিন্তু রক্তবীজ যুদ্ধে অবতরণ করে। অন্যথা অন্তর্নিহিত সংস্কার আসিয়া মানুষকে অভিভূত করে। সাধনবলে যে দেবতার প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা বিলয় হয়। দেবগণও রক্তবীজকে দেখিয়া "ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্।" তাহারা বিষণ্ণ হইল। মা স্বয়ং উপস্থিত, তথাপি বিষণ্ণ!

আমাদের যাহা সাধ্য তাহা করিয়াছি। এখন আমাদের আর সাধ্য নাই। এখন মা, যাহা করিতে হয় তুমি কর। আমরা নিষ্ক্রিয়। মা তখন হাসিলেন, ইহা মুক্তিলাভের একটি প্রকৃষ্টতম আবির্ভাব। যখন বুঝিলাম মা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, তখন তোমার সাধনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মা তখন ছেলেকে কোলে তুলিয়াছেন। মানুষ যখন সকল পুরুষকার বর্জন করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে নির্ভয় হয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবান্, তাহার চালক হন। পাশ্চাত্য বলেন মানুষ যখন নগ্নরূপে আত্মনিষ্ঠ হয়, তখন আত্মজ্যোতিতে নিখিল বিশ্ব ইতিহাসিক দেখে—প্রাকৃতিক দুঃখপূর্ণ সংসার-কন্দরার সকল সন্ধি ভাঙিয়া যায়; ("অন্তর্জীবন")

অর্জুনের এই অবস্থা উপস্থিত। তখন আত্মনিবেদন।

"কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ।"

কৃষ্ণ হে, আমার স্বভাব দূষিত হইয়াছে। আমি বুঝিতেছি না যে, আমি "নিত্যাভয়স্বরূপস্য ভাবঃ।" আমি সংস্কার দ্বারা অভিভূত। ইহার কারণ—অভিমান হইতে উৎপন্ন কার্পণ্য। অভিমানে মানুষ কৃপণ হয়। সে ভাবে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই, পুরুষকারবলে সে সবকিই করিতে পারে। এই অভিমানে সে কৃষ্ণকে পর করে। নিজেকে মহত্ত্ব বর্জা ভাবে। কিন্তু সব ব্যর্থ। শ্রেয়ঃ শুনিয়া কি হয়, শুনিলেও তাহার শ্রেয়ঃ লাভের সামর্থ্য নাই। বস্তুতঃ শুনিলেও লাভ নাই; আমি বুঝিয়াছি অভিমান পরম শত্রু। আমি তোমার শরণাগত হইলাম। এই অর্জুন মহাযোগী যাহা করিবার তুমি কর। আমি এই মহত্ত্ব বর্জনবোধে আর কিছু করিবার অভিমান তোমার চরণে বলি দিলাম। "ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।"

সমাপ্তির পথে গীতার আরম্ভ। মানুষ সংসারক্ষেত্রে আসিয়া কি ভাবে চলিবে তাহা শিক্ষা দেওয়াই গীতার লক্ষ্য। অবশ্য মানব-জীবনের উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ—ব্রহ্মলীন হওয়া—তদ্বৎ দর্শনলাভ—অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ—ইহাকে ভিত্তি করিয়াই গীতার উপদেশ ব্যক্ত হইয়াছে।

অথ গীতা

(গীতোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, উহা দুরূহ এবং দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। যে-কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা

একখানা গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। সুতরাং শ্লোকের তাৎপর্যার্থ অবলম্বনে আমাদের জীবনে কর্তব্যের আলোচনা করাই সঙ্গত।)

অর্জুন প্রথমে আত্মীয়বিয়োগ আশঙ্কায় দুঃখমান হইয়াছিল। বিষাদবিষোষধনিত মোহমূর্ছিতে উপস্থিত। প্রিয়জনের মধ্যে স্থির থাকা অল্পলোকের ভাগ্যে ঘটে। শোকাপহা সর্বদা, সর্বত্র, সকলের আছে। উক্ত আপদ্ধারে চেতন হইলে, কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সকলই যথা পায়। শোকাচ্ছন্ন মানুষ কর্মাদি করিতে অসমর্থ হয়। কর্ম করিতে হইলে, বস্তুতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, ভগবান্‌কে ভালবাসিতে হইলে প্রথমে মানুষের শোকের আক্রমণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। অর্জুনের মত কর্ম করিতে হইবে, এ সময় শোকাভিভূত হইলে চলিবে না। অর্জুন নিজের কর্তব্যতত্ত্ব ভগবানের নিকটে নিবেদন করিল। "যেন্মুক্ত পার্থে যে যোদ্ধব্যে আছে" ইত্যাদি। অভিমানুক সকল আত্মনিবেদন ভগবানের কৃপা লাভ করিল। ভগবান্ শোকাপনোদনের উপায় দেখাইলেন।

বিষণ্ণতা মানবের জন্য এই উপদেশ। মানুষ কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত। কর্ম তাহার করিতেই হইবে। সে যদি শোকাভিভূত হইয়া কর্মসন্ন্যাস করে, তাহা হইলে তাহার অমূল্য জীবন নিষ্ফল হয়। সুতরাং শোকাপনোদন তাহার প্রথম কর্তব্য।

শোক তাহার কোথায়? সঙ্গত বটে বিষণ্ণতার তাহার শোক, হারিয়ে শোক, প্রিয়বিচ্ছেদে শোক, রোগে শোক, শোকনিবার শোক, কলহে শোক, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শোক। শোক নাই কোথায়? মানুষ সর্বদা কোন না কোন শোকোদ্বেগের মধ্যেই আছে। সুতরাং তাহার কর্মে ঘনোৎসাহ হয় না, কর্ম দুঃখেরই কারণ হয়। মানুষ প্রথমে শোকমগ্ন হইতে হয়, অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবানের উপদেশ সকল প্রজার সহিত বুঝিতে চেষ্টা করা।

ভগবান্ বলিলেন, অর্জুন, সংসারের ব্যাপারে তুমি বিচলিত হইবে কেন? ইহা ত' মর্ত্যলোক! মানুষ গৃহে বাস করে। মানুষ কিন্তু গৃহ নয়। যদি গৃহখানার এক অংশ ভাঙ্গিয়া যায়, অথবা বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প, বজ্রপাতও ইহাতে হয় তাহা হইলে গৃহীর কি? সে অক্ষত। প্রয়োজন হইলে সরিয়া অন্য ঘরে যেলেই তাহার চলিবে। অর্জুন, তুমি দেহ হইতে ভিন্ন, দেহী। যত সুখদুঃখ সকলই দেহাশ্রিত। কেহ রোগে, কেহ শীত গ্রীষ্মের পরিক্লেশে, কেহ বালাচরণের সংঘাতে। ইহারা তোমার নিকটে পৌঁছে না। কতজন গৃহীকে স্পর্শ করে না, ইহারা গৃহকে ক্ষতবিক্ষত করে। গৃহী ভীত হয়। কেন হয়? ইহারা ত' ক্ষণস্থায়ী—এই আছে, এই নাই। সুতরাং অনর্থক হৈ-চৈ কেন? কতকাল নীরবে থাকিয়া দেখ, ইহারা চলিয়া যাইবে।

মানুষ বলে, না হে ঠাকুর, ঘরখানা ত' ভেঙ্গে পড়িয়াও যায়। হাঁ, তাহাতেই বা তোমার কি? তুমি অক্ষয়ে যাইবে। তুমি কতবার গৃহ পরিবর্তন করিয়াছ, তাহাতে ত তোমার কোন দুঃখ দেখিতেছি না। শিশুকালে যে তোমার দেহ পেয়ারানি ছিল, তুমি উহাকে আদর করিয়া কত হাসিয়াছ, কত কাঁদিয়াছ, কিন্তু যখন সময় আসিল, সে যে তোমার তোমায় লুকাইল, তুমি ফিরিয়াও দেখিলে না। বরং কৌমারের নূতন দেহ পাইয়া তাহাতেই সুখদুঃখাদি বহু করিলে। এইরূপে তোমার কত নূতন দেহ হইল, তুমি ত সেজন্য দুঃখপ্রকাশও করিলে না। তবে দেহান্তরে কীহাতে বিচলিত হইবে কেন?

মানুষ ভাবে, এ পর্যন্ত বেশ গেল। কিন্তু সবখানা ত' এবেবারে পড়িয়া যায়। দেহ ত' মৃত্যুতে একেবারে নষ্ট হয়, কৌমার-যৌবনাদির মত অবস্থান্তর মাত্র নয়। ঠাকুর বলেন, তখন তুমি অন্ধ ঘরে অন্ধ হেতে যাইবে। সত্য, কিন্তু তাহাতে কি দুঃখ হয় না? পূর্ণ পুরাতন নষ্ট হইলে মানুষের দুঃখ হয়ই। ঠাকুর বলেন, এই দুঃখই দুর্দশা। ইহা অজ্ঞতার ফল। মনে কর, পথিক চলিয়াছে দেশান্তরে। পথমধ্যে বিশ্রামের জন্য পান্থশালা এক ঘরে আশ্রয় নিল। ক্রমে রাত্রি ঘন হইল, যা, পথিকের সে-ঘরের প্রয়োজন শেষ হইল। সে তখন চলিয়া যায়, আবার প্রয়োজনবশে অন্য গৃহ আশ্রয় করে। ইহাতে কি দুঃখ হয়। মনে রাখিবে তুমিও পান্থ; এক লক্ষ্য অভিমুখে চলিয়াছ। প্রয়োজনবশে এ-দেহে, সে দেহে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতেছ মাত্র। বস্তুতঃ তুমি দেহ নও। দৈহিক কোন পরিবর্তন তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেরূপ দেহাবচ্ছিন্ন পরিবর্তন গৃহীর কিছু নয়। গৃহী গৃহখানাকে "আমার গৃহ" এই আভিমানিক বোধে ধরিয়া ইহার পরিবর্তনে দুঃখভোগ করে। সে বোঝে না—সে গৃহ নয়। সুতরাং দুঃখভোগ তাহার অজ্ঞতার ফল।

দেহী দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু হইলে উপরি উক্ত যুক্তি গ্রহণীয় বটে। কিন্তু দেহাতিরিক্ত দেহী নামে কি সত্যই কোন বস্তু আছে? হাঁ, আছে। সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি-পুরুষবিবেক উপদেশ করিয়াছে। দেহ জড়, ভূত। পুরুষ বা আত্মা

চৈতন্যস্বরূপ। মানুষের অনুভূতি আছে, সে চেতন, কিন্তু তাহার দেহ জড়, সে অচেতন। ইহা বুঝিতে পারিলে মানুষ প্রকৃতিতে মুগ্ধ হয় না। চিৎ-পদার্থটি বিকারশূন্য, সর্ব্বত্র একরূপ। আমরা আপত্তি করি, চৈতন্যে কত পরিণাম, কত বিকার, কত অবস্থান্তর প্রাপ্তি। সুতরাং ইহাকে নির্ব্বিকার বলা যায় না। আমরা অনুভব করি, চৈতন্য কখনও দুঃখী, কখনও সুখী, কখনও দুঃখী। তবে আর অবিকারী কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে এগুলি বিকারী জীবাত্মা; পরমাত্মা নিত্য শুদ্ধ। জীবাত্মা বস্তুটি তবে কি? ইহা বস্তুটি না এক প্রকাশ মাত্র। শুভ্র বৈদ্যুতিক আলোর উপরে রক্তবর্ণ কাঁচের আবরণ দিলে আলোকে রক্তবর্ণ দেখায়। ইহা আবরণের ধর্ম, আলোটি যে শুভ্র, সেই শুভ্রই আছে। কাঁচের আবরণ দূর হইলেই ইহা দেখা যায়। আলোর সান্নিধ্যহেতু কাঁচের রক্তবর্ণ প্রকাশিত হইতেছে। আহার, অভিমান, কাম ক্রোধ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি পরমাত্মার সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতির প্রকাশ মাত্র এবং ইহারই নাম জীবাত্মা। এই সকল বিকার জীবাত্মার, পরমাত্মা সর্ব্বত্র একরূপ। অন্তরের পাকযন্ত্রটি, সাতচল্লিশ। সাপাতের বিশ্লেষণ আছে, মন আছে। অচেতন এরূপ আত্মার কাম হইতে পারে না। যেটা আত্মা অবশ্য। প্রাকৃতিক অর্থাৎ যৌক্তিক দেহের বস্তুর ক্রিয়া ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। রিপু-চক্ষু-চেতন প্রকৃতি এবং ইহাদের বিকার অন্ন-পন্থাদি ইহার কিছু করিতে সক্ষম নহে। আমরা যেমি মাদা-চশমাদি পরীক্ষে ব্যবহার করিলে মানসিক-ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন চৈতন্যের নয়। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচাবরণের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলো দেখা যায়, কিন্তু মূল আলো অবিকৃত একই থাকে, সেইরূপ চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক বিকারের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। উক্ত ভিন্ন জীবের, আমি ভিন্ন। সকলেই অনুভব করে ক্রোধে চৈতন্য, দ্বেষে চৈতন্য, হিংসায় চৈতন্য, সুখে দুঃখে চৈতন্য। ক্রোধাদি মানসিক বিকার, কিন্তু সর্ব্বত্র প্রকাশিত এক অখণ্ড চৈতন্য—আত্মা। ক্রোধ আত্মা নয়, যদি হইত তাহা হইলে ক্রোধাগমে আত্মার নাশ হইত। সুতরাং ক্রোধকে আত্মার সাময়িক পোষাক বলা যায়। পোষাক ত আর বস্তুটি না। দেহধর্ম, প্রাকৃতিক বিকার আত্মায় আরোপ করিয়া আমরা ভ্রান্ত হই। আয়নাখানার মধ্যে একটি কাটা চিহ্ন। বালক আয়নায় মুখ দেখিয়া কাঁদে, মাগো, আমার যে নাক কাটা। মা বলেন, না বাবা, ও কিছু নয়, আয়না কাটা। তোমার মুখের নাকটি সুন্দরই আছে।

আত্মা জন্মে না, মরে না, সর্ব্বত্র একরূপ। আমরা তাবি আত্মা বা চৈতন্যের কত পরিবর্ত্তন। বৈশবের চৈতন্য এবং যৌবনের চৈতন্য—ইহার মধ্যে কত পার্থক্য। শূন্য ঘরে আলো মাত্র দেওয়াল কটিই প্রকাশ করে, কিন্তু ঘরখানা বহুদ্রব্যে পূর্ণ করিলে একই আলো যত বস্তু প্রকাশ করে, তাহাতে কি আলোর পার্থক্য? আলো একই থাকে। সাতচল্লিশ পদার্থের উৎপত্তি আছে, নাশও আছে, কারণ অংশ সকল সমাবেশিত হইলে বস্তুটি উৎপন্ন হয়, আবার সাতচল্লিশ অংশগুলি বিশ্লিষ্ট হইলেই উহার নাশ। কিন্তু নিত্যশুদ্ধ, অনন্তচৈতন্য একরূপ আত্মার উহাদের সম্ভাবনা নাই। মানুষের মৃত্যু তাহার দেহের নাশ। আত্মা ও দেহ সম্পূর্ণ পৃথক্, সুতরাং একের নাশে অন্যের নাশের আশঙ্কা নাই। তবে সন্দেহ—আত্মা দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে; সেই আশ্রয় নাশ হইলে দেহী আত্মা কিরূপে থাকে? নদীপার হইতে পুল আশ্রয় করিয়াছি। আমি কি পুলের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারি না? আত্মা বা চৈতন্য যে দেহকে আশ্রয় করিয়াও থাকে তাহা আমরা অনেকেই অনুভব করে। সক্রেটিস কুটীরদ্বারে বসিয়া দুঃখের কথা চিন্তা করিতেছে। দুর্জ্জনা সম্মুখে দাঁড়াইয়া আতিথ্য প্রার্থনা করিল। সক্রেটিস নীরব। অনাদরে নিষ্ঠুর অভিশাপ। সক্রেটিস কিছু শুনিল না, জানিল না, বুঝিল না। দেহস্থটা ওখানে ছিল বটে, কিন্তু চৈতন্য বিচরণ করিতেছিল প্রিয়সন্নিধানে। দেহ একটা বস্তু, সাময়িক প্রয়োজনে আত্মা ইহাকে আশ্রয় করে মাত্র। প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে ইহা ত্যজিয়া চলিয়া যায়। দেহনাশে ইহার নাশ হইবে কেন?

ভগবান্ অর্জ্জুনকে এইভাবে আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিলেন। আত্মা অনাদি-বস্তু হইতে ভিন্ন ইহা জানাইলেন। ইহা হইতে আত্মার অবিনাশিত্ব, নিত্যত্ব বুঝিতে পারা যায়। ইহার নাম সাংখ্যযোগ। এই জ্ঞানলাভ না করিলে কেহ আত্মার বিনাশ নাই ইহা বুঝিতে পারে না এবং মৃত্যু-শোক হইতেও নিস্তার পায় না। সুতরাং কর্ম্মজীবনে সে পটুতা লাভ করে না।

অর্জ্জুন কি এই উপদেশ শুনিয়া আত্মার স্বরূপভাব বুঝিয়াছিল? সম্ভবতঃ বুঝিয়াছিল। অর্জ্জুন উক্ত উপদেশে পাইবার অধিকারী না হইলে গুরু তাহাকে ইহা বলিলেন কেন? গুরু কি শিষ্যের অধিকার না বুঝিয়া উপদেশ দেন? দ্বিতীয়তঃ অর্জ্জুন যদি ইহা না বুঝিত তাহা হইলে কি অন্তর্যামী ভগবান তাহাকে পরাজয় উপদেশ দিতেন?

মানুষের কর্ম্ম করিতে হইবে, কর্ম্মহীন মানুষের অন্য গতি নাই। সংসারের কর্ম্ম, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম সকলই কর্ত্তব্য। সকলই

কর্মযোগ। আলোচিত হইয়াছে যে, মানুষ সংসারের কর্ম করিয়া যখন অবসন্নতায়ী বার্ধক্যে উপস্থিত হয়, তখন চিন্তা আসে, হায় কি চাহিল, কেন সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল? কখনো বিরক্তি লাভ হয়। তখন সকলকার জন্য শাস্ত্রীয় কর্মের অনুশীলন করে। বৈদিক কর্ম—অগ্নিহো, দার্শকর্ম—পূজা-অর্চনাদি, যোগ-শাস্ত্র-কথিত অষ্টাঙ্গযোগাদি—সকলই কর্মযোগ। কোন না কোন প্রকার কর্মযোগ সকলেই করে। নির্জনে, সমুদ্রে, মন্দিরে, পর্বতগহ্বরে, বনে, নদীপুলিনে সর্বত্র কর্মযোগের চর্চা। অর্জুনও করিয়াছিল, যজ্ঞ, পূজা, অষ্টাঙ্গযোগ, তপস্যা ইহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, সুতরাং বস্তুতত্ত্ব বুঝিবার যোগ্যতা জন্মে। অর্জুনের তাহা জন্মিয়াছিল। অন্যেরও জন্মিতে পারে। চিত্তের শুদ্ধি লাভ করিতে মানুষের এইপ্রকার কর্মযোগ আবশ্যক। শুদ্ধচিত্তে মানুষ তখন জানিতে পারে যে, ইহা দ্বারাও ইষ্টসিদ্ধি হয় না, পূর্ণতা লাভ হয় না, পূর্ণানন্দ লাভের অধিকার জন্মে না। এবম্বিধ কর্মযোগ পরাবস্থ নয়। বরং এই কর্ম বিদ্বেষ কারণ হয়। কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। কর্মকর্তার ভোগও অবশ্যম্ভাবী। কর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। কিন্তু জীবন কর্মময়। সুতরাং কর্ম করিতে হইবে। এই অবস্থায় মানুষের সাংখ্যযোগের অধিকার জন্মে। অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত লাভ করিয়া মানুষ অন্তরাত্মা শুনিতে পায় এবং বুঝিতে পারে—আত্মা কোনপ্রকারেই বিকার হইতে ভিন্ন। আত্মা নিষ্ক্রিয়। সাক্ষাদ্ভাবে আত্মার কর্মের সম্পর্ক নাই। আত্মা করে না। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে? কর্ম অনিবার্য। অথচ কর্ম ফলের দ্বারা বন্ধনের কারণ হয়। এখন কর্মের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? ভগবান অর্জুনকে বাক্যের একটি পন্থা বলিলেন—যাহা ঈশ্বরোক্ত কর্মযোগ নামে অভিহিত। বুদ্ধিভেদ প্রভৃতি সংস্কার হেতু মানুষ শুভাশুভরূপে কর্ম করিতে পারে না, সর্বত্র কর্ম ব্যর্থতায় হয়। আত্ম, অনাত্ম-বিবেক জ্ঞানলাভে মুমুক্ষুত্ব, মোক্ষ প্রভৃতি অনেক বলিয়া যায়। কিন্তু ইহাও জ্ঞানগোচর হয় যে, কর্মফলভোগ বন্ধনের হেতু। অথচ কর্ম করিতে হইবে। সুতরাং ভগবান তাহাকে এই কর্মযোগ উপদেশ দেন—যাহার ফলে মানুষ কর্ম করিয়াও কর্মফলে আবদ্ধ হয় না। যেহেতু যোগ থাকা সত্ত্বে, সাংখ্যকথিত আত্মজ্ঞান লাভ না হইলে মানুষের ঈশ্বরোক্ত কর্মযোগের অধিকার জন্মে না। এই হেতুতে ভগবান অর্জুনকে সাংখ্যযোগ বলিয়া কর্মযোগ বলিলেন।

উক্ত কর্মযোগ কি? ইহা কর্মের একটি কৌশল। ইহা অবলম্বন করিলে কোন কর্মই মানুষকে আবদ্ধ করিতে পারে না। বর্তমান অধ্যায়ে যে কর্মযোগের উপদেশ ভগবান্ দিলেন তাহা উপনিষদ্ সাংখ্যের অন্তর্গত। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান যাহা প্রথমে অর্জুনের শোকাপনোদনের উপায় দেখাইলেন। মানুষ যখন বুঝিতে পারে আত্মার বিনাশ নাই, আত্মা অজর, প্রাকৃতিক কোন বিকারে আত্মার বিকার হয় না, তখন সে শোক-দুঃখ সহন করিতে কথঞ্চিৎ উপযুক্ততা লাভ করে, সুতরাং চঞ্চলতাও কিঞ্চিৎ দূর হয়। ইহার ফলে কর্মশক্তির স্ফুরণ হয়, শরীরে বল, তাহা প্রবৃত্তি লোপপ্রাপ্ত হয়ে না। সাংখ্যযোগ উপদেশের অন্তর উদ্দেশ্য আছে। ইহা চরম উপদেশের পরম জ্ঞান লাভের সহায়ক মাত্র। আত্মজ্ঞান, আত্মনিষ্ঠা, আত্মদর্শন মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। ভগবান এই তত্ত্ব ইহা শুনাইয়া রাখিলেন। সচরাচর মানুষ যদি সর্বদা বলে "সংসারের কোন দুঃখ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না" যদি সর্বদা চিন্তা করে, "আমি অধিকারী, এ সব আমার কিছু না" তাহা হইলে তাহার জীবনে ইহার প্রভাব অস্বাভাবিক দেখা যাইবেই। এই রূপ চিন্তানুশীলন মানুষকে ক্রমশঃ বিরক্তি আনিয়া দেয়। অবশ্য শোনা মাত্রই কাহারও আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু প্রথমে শুনিতে হইবে। পরে মনন। এখন মননের জন্য অধিকার অনুসারে কর্মযোগোপদেশ আরম্ভ করিলেন।

[ক্রমশ

রাণী সাহেবকৌর

শিখ রমণী

শ্রীমতী অমিয়া বসু এম্-এ, বি, টি

গত অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাঞ্জাবের শিখজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তদানীন্তন শিখ-রাজনীতি-ক্ষেত্রে বহু বীর শিখ-রমণী স্বীয় বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে প্রভাব ও আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, রাজ্যের শাসনভার তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। মহারাজা রণজিৎসিং তাঁহার শ্বশ্রূমাতা সদাকৌরের বুদ্ধি ও পরামর্শানুসারে বহুকাল রাজকার্য্য চালাইতেন। মহারাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রবধূ রাণী চাঁদকৌর লাহোর-দরবারে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তার পরে মহারাজার অন্যতমা মহিষী ও মহারাজা দলীপসিংএর মাতা রাণী জিন্দ্ লাহোর-রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরাজদের সহিত দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের ফলে তিনি লাহোর হইতে প্রথমে বারাণসী এবং পরে পুত্র দলীপসিং সহ লণ্ডনে স্থানান্তরিত হন। শুধু লাহোর-দরবারে নহে, পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ্ প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাসেও আমরা বহু তেজস্বিনী রাজনীতিজ্ঞ শিখরমণীর পরিচয় পাই।

পাতিয়ালার রাজা সাহেবসিংএর ভগ্নী এবং কানাইয়া মিসলের সর্দ্দার জয়সিংএর পত্নী রাণী সাহেবকৌর কিছুকাল ভ্রাতার তরফে পাতিয়ালার রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। রাণী তখন কিশোরী এবং তাঁহার স্বামী জয়সিং একুশ বৎসরের যুবকমাত্র। রাজা সাহেবকৌর রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য ছিলেন। আমোদ-প্রমোদেই দিন যাপন করিতেন। তাঁহার রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবার পরেই পাতিয়ালা-রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজকর্ম্মচারিগণ স্বার্থান্ধ ও অর্থগৃধ্নু এবং কেহই রাজার বা রাজত্বের কল্যাণ কামনা করিত না। রাজা সাহেবকৌর এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভগ্নী রাণী সাহেবকৌরই তাঁহার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষিণী এবং তিনি ভগ্নীর শরণাপন্ন হইলেন। ভগ্নীকে পাতিয়ালায় আসিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। ভগ্নীও ভ্রাতার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। পাতিয়ালায় আসিবামাত্রই ভ্রাতা ভগ্নীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই ভগ্নীকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিত্বের পদ লাভ করিয়াই তাহার কিছুদিনের মধ্যেই ভগ্নীকে কতেগড়ে যাইতে হইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার স্বামী জয়সিংএর এক আত্মীয় কতেসিং কর্ত্তৃক কতেগড়ে বন্দী ও নির্য্যাতিত হন। স্বামীকে কতেসিংএর কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রাণী ভ্রাতার নিকট পাতিয়ালার এক সৈন্যবাহিনী দিবার অনুরোধ করেন, রাজা সম্মত হইলেন। রাণী সাহেবকৌর সেই সৈন্যবাহিনী সহ কতেসিংএর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং কতেগড়ে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়। রাণী কতেসিংকে পরাস্ত করিয়া স্বামীকে উদ্ধার করিলেন। বিজয়ী রাণী সাহেবকৌর সগৌরবে পাতিয়ালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে একটী বিশাল মারাঠা সৈন্যবাহিনী পাতিয়ালাভিমুখে আক্রমণোদ্দেশে যাত্রা করিল। ঝিন্দ, কৈথাল প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণ অনন্যোপায় হইয়া আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। রাণী সাহেবকৌর তখন পাতিয়ালা শাসন করিতেছিলেন। তিনি মারাঠাদিগের সহিত বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। অতঃপরে ঝিন্দ থানেশ্বরের নৃপতিগণ রাণীর নেতৃত্বে যুদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন এবং পাতিয়ালার সর্দ্দার ভাগসিং সাত হাজার সৈন্য সহ মারাঠার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু মারাঠাদের সহিত শিখেরা কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছিল না। তাহাদের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয় এবং শিখেরা পশ্চাদপসরণ করিতে উদ্যত হইল। এই সঙ্কটক্ষণে রাণী সাহেবকৌর একদল সৈন্য সহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যে, শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবেন। তিনি তরবারি হস্তে তাঁহার রথ হইতে অবতরণ করিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, 'তিনি যুদ্ধ হইতে কিছুতেই বিরত হইবেন না।

এই যুদ্ধে একটা রহস্য—তাহাদের রাজার ন্যায় শত্রুহস্তে নিহত হইলে সিংহাসনের চিরকলঙ্ক হইবে। তাঁহার এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পতা দেখিয়া এবং উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সৈন্যদের মনে নব বলের সঞ্চার হইল এবং তাহারা অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। কিন্তু কোন পক্ষই জয়যুক্ত হইতে পারিতেছিল না। তখন রজনীর গভীর অন্ধকারে শিখেরা মারাঠাদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং মারাঠারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কার্ণাল অভিমুখে যাত্রা করিল।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে নাহানের রাজার একদল প্রজা বিদ্রোহী হয়। ঐ বিদ্রোহ দমনের জন্য রাণী সাহেবকৌর নাহানে প্রেরিত হন এবং একদল সৈন্য সহ তিনি অচিরেই বিদ্রোহ দমন করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জর্জ টমাস সাহেব যখন শিখদের কোনক্রমেই আয়ত্তাধীন করিতে পারিতেছিলেন না, তখন টমাস সাহেব কিল রাজ্য অবরোধ করেন। কিল্কের নিকটবর্তী সমস্ত নৃপতিগণ টমাস সাহেবের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা রাণী সাহেবকৌরকে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিবার জন্য আহ্বান করেন। রাণী সাহেবকৌর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন তখন শিখ রাজাদের ভাগ্যাকাশ মেঘমুক্ত হইল। টমাস সাহেব রাণীর রণকৌশল ও নেতৃত্ব এবং শিখদের অদম্য উৎসাহ দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া শিখদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

রাণীর চেষ্টা, বুদ্ধি ও তেজস্বিতার জন্য পাতিয়ালার রাজ্যের বাহিরের বিপদ-ঝঞ্ঝাট দূরীভূত হইল বটে কিন্তু শীঘ্রই আভ্যন্তরিক বিপদের সৃষ্টি হয়। দরবারের স্বার্থান্ধ সর্দারগণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের স্বার্থের প্রধান অন্তরায় রাণী। অতএব তাঁহাকে পাতিয়ালা হইতে অপসারিত করাই প্রধান কাজ। দুর্বলচিত্ত রাজা সাহেবসিং সর্দারগণের প্ররোচনায় রাণীর উপর ক্রমশঃ আস্থা হারাইতে লাগিলেন। ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে প্রথম মতান্তর পরে মনান্তরের সূচনা হয়। এদিকে রাজমহিষী আউলকৌর নবদিনীর যশ, একাধিপত্য ও রাজার উপর অসামান্য প্রভাব দেখিয়া বিশেষ ঈর্ষান্বিতা হইলেন এবং তাঁহার চিত্তে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তিনি মনে করিলেন, রাজ্যশাসনে তাঁহারই ন্যায্য অধিকার এবং তাঁহার সেই অধিকার হইতে তাঁহার ননদিনীই তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছে। রাণী আউলকৌরও সর্দারগণের সহিত যুক্ত হইয়া সাহেবকৌরের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ষড়যন্ত্রকারিগণ রাণীর বিরুদ্ধে দুইটী কাল্পনিক অভিযোগ রাজসমীপে উপস্থিত করিলেন—রাণী সাহেবকৌর নাহানের প্রদত্ত একটী মূল্যবান্ হাতী নিজের সম্পত্তিরূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন; তিনি রাজার বিনা অনুমতিতে তাঁহার (রাণীর) জায়গীর মধ্যে সুনামের নিকট একটী দুর্গ নির্মাণ করিয়াছেন।

রাণী সাহেবকৌর ষড়যন্ত্রকারিগণের গূঢ় উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া এবং ভ্রাতার আকস্মিক মনোভাবের পরিবর্তনের পরিচয় পাইয়া হঠাৎ পাতিয়ালা ত্যাগ করিয়া তাঁহার জায়গীর মধ্যস্থ ভিরিয়ামে প্রস্থান করেন। ফলে রাজা রাণীর প্রতি অধিকতর রুষ্ট হইলেন এবং রাণীকে তৎক্ষণাৎ ভিরিয়াম ত্যাগ করিয়া তাঁহার স্বামীর নিকট কত্তেগড়ে যাইবার জন্য কড়া হুকুম জারী করেন। ওজস্বিনী রাণী এই হুকুম মানিতে অস্বীকৃত হন। রাজা তখন ভগ্নীর বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ভাই দালসিং প্রভৃতি কতিপয় সর্দার রাণীর বিরুদ্ধে রাজার যুদ্ধ করা রাজোচিত নহে এবং একটা কলঙ্কের বিষয় হইবে এই মর্মে রাজাকে বুঝাইয়া দেন এবং যুদ্ধ হইতে বিরত করেন। তাঁহাদের মধ্যস্থতায় ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে একটা আপোষের বন্দোবস্ত হয়। রাজা রাণীকে পুনরায় নিরাপদে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করেন। রাণী ভ্রাতার অনুরোধে আস্থা স্থাপন করিয়া যখন ভিরিয়াম হইতে পাতিয়ালাতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন পথিমধ্যে অতর্কিতে রাজাদেশে তিনি বন্দী হন। চতুরা রাণী একদিন এক পরিচারিকার বেশে বন্দীনিবাস হইতে পলায়ন করেন এবং অবশেষে নিজ বাসভূমি ভিরিয়ামে পৌঁছিয়া মুক্তিলাভ করেন।

তিনি ভ্রাতা সাহেবসিংহের রাজ্যের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে আপন জীবন বিপন্ন করিয়া এত পরিশ্রম করিয়াছেন, অবশেষে ভ্রাতার দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইলেন প্রতিদানে ভ্রাতার কৃতঘ্নতায় মর্মাহত হইলেন। মুক্তিলাভ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ভিরিয়ামে দেহত্যাগ করেন।

মৃতের হাত

ডক্টর অফ সোশাল সায়েন্স শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ,

প্রায় আটমাস পূর্বে এক সন্ধ্যায় আমার এক বন্ধু 'লুই আর' কলেজের কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করল। আমরা মদ খেলাম, ধূমপান করলাম, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করলাম, মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনকারী গল্প করলাম—একত্র সমবেত হ'লে যুবকেরা যা ক'রে থাকে। সহসা দরজাটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হ'ল এবং আমাদের এক বিশিষ্ট বাল্য-বন্ধু ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার ক'রে উঠল: "কোথা থেকে আসছি, অনুমান কর দেখি।" "আমি বাজী রেখে বলতে পারি, মেরিলের দোকান থেকে," আমাদের মধ্যে একজন উত্তর করল। আর একজন বলল: "না, তোমাকে অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাচ্ছে; তুমি নিশ্চয়ই এখনই কিছু টাকা ধার ক'রে এনেছ, অথবা তোমার কাকাকে কবর দিয়ে এলে, কিংবা ঘড়িটা বাঁধা দিয়েছ।" তৃতীয় ব্যক্তি বলল: "তুমি মদ খেয়েছ, আর এখানে লুই-এর মদের গন্ধ পেয়ে সকলকে চমকে দেবার জন্যে ঢুকে পড়েছো।"

"তোমরা সকলেই ভুল করেছ। আমি নরম্যাণ্ডির পি-এর কাছ থেকে আসছি। ওখানে আমি সপ্তাহখানেক কাটিয়ে এলাম, আর ওখান থেকে আমার একজন বিশিষ্ট অপরাধী বন্ধুকে সঙ্গে করে এনেছি ও অনুমতি পেলে তোমাদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিই।" এই ব'লে সে তার পকেট থেকে একখানি হাত টেনে বার করল। বস্তুটি বড় ভয়ঙ্কর, কালো, শুষ্ক, অত্যন্ত লম্বা এবং দেখলে মনে হয় যেন কুঞ্চিত। অস্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন মাংসপেশীগুলি হাতের উপর পৃষ্ঠেই লাগানো রয়েছে, আর আঙুলের তলায় হ'পাশে সরু সেরেকগুলি এখনও দেখা যাচ্ছে। সমগ্র হাতখানির মধ্যে একটা অপরাধের গন্ধ পাওয়া যায়।

আমার বন্ধুটি বলল: "দেশের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত এক বৃদ্ধ যাদুকরের সমস্ত জিনিষপত্র সেদিন বিক্রী হয়ে গেল। নানারকম যাদুবিদ্যা সে অভ্যাস করত। প্রত্যেক ব্যাপারেই এই হাতখানির প্রতি সেই বৃদ্ধের অপরিসীম মমতা ছিল। সে বলত, এটা হচ্ছে এক বিশিষ্ট অপরাধীর হাত। ১৭৩৬ সালে এই অপরাধীটিকে ফাঁসি দেওয়া হয়, কারণ সে তার স্ত্রীকে কূপের জলে নিক্ষেপ করেছিল এবং যিনি তাদের বিবাহ দিয়েছিলেন, সেই পুরোহিতকে পরে সে হত্যা করে। এই দু'টি অস্বাভাবিক কীর্তির পর সে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে বেরিয়ে পড়ল, এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বারজন পথিকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করল।"

আমরা বলে উঠলাম, "কিন্তু ঐ ভয়ঙ্কর বস্তুটি দিয়ে তুমি করবে কি?"

"কেন, পাওনাদারদের ভয় দেখানোর জন্যে এটাকে আমার ঘড়ীর ষ্ট্যাণ্ড করবো।"

দীর্ঘাকৃতি ইংরাজ-যুবক হেন্‌রী স্মিথ বলল, "আরে বন্ধু, আমার মনে হয়, এই হাতখানি নতুন কৌশলে সংরক্ষিত নিছক একটি ভারতীয় মাংসখণ্ড মাত্র। আমি বলি কি, এ দিয়ে 'সুপ' তৈরী করে ফেল।"

"ঠাট্টা করো না", অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটি ছাত্র উত্তর করল, "শোনো, যদি তুমি আমার উপদেশ শোন, মানবদেহের এই অবশেষটুকুকে খ্রীষ্টীয় মতে কবর দাও, কারণ—ভয় হয়, হয়ত এর মালিক একদিন এসে এটি দাবী করবে। তাছাড়া, হাতটি সম্ভবতঃ কতকগুলি ভূ-অভ্যাস অর্জন ক'রে থাকবে। জান তো, প্রবাদ আছে—'একবার চোর হ'লে চিরকাল চোর।'

"আর 'একবার মাতাল হ'লে চিরকাল মাতাল'।" ছাত্রটির জন্য প্রকাণ্ড একগ্লাস মদ ঢালতে ঢালতে আমাদের ভোজকর্তা উত্তর করলো। এর পর অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হ'ল। পরিশেষে আমরা সকলে বিদায় নিলাম।

পরের দিন পিয়ারের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আমি ভিতরে ঢুকলাম। তখন প্রায় দুটো বেজেছে; দেখলাম সে পড়ছে আর ধূমপান ক'রে চলেছে। বললাম, "কি-হে, আজ কেমন?" সে উত্তর দিলে, "বেশ ভালই।"

"আর তোমার সেই হাতখানার খবর কি?"

"সেই হাতটা? নিশ্চয়ই ওটিকে আমার ঘড়ীর ওপর দেখে থাকবে; কাল রাতে ফিরে এসেই ওটিকে ,ঐখানে রেখেছি। কাল মাঝ-রাতে কয়েকটা টুনির্মোদ ঘণ্টা বাজিয়ে আমার সঙ্গে একটু কৌতুক করছিল; প্রশ্ন করলাম, 'কে', কোন উত্তর পেলাম না। তখন আমি বিছানায় ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।"

ঠিক এই সময়ে ঘণ্টাটি বেজে উঠল। নিশ্চয়ই বাড়ীও-

ছাড়া, সেই ইস্তক উদ্ভট লোকটা। আমাদের কোনরকম অভিবাদন না জানিয়েই সে সোজা ভেতরে এসে আমার বন্ধুকে বলল, "মশাই, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ঐ যে যাদেরওটিকে আপনার ঘন্টার হাতলে লাগিয়েছেন, ওটা সরিয়ে নিন। নচেৎ আপনাকে বাড়ী ছেড়ে যেতে বলতে বাধ্য হ'ব।"

"মশাই," অতি গম্ভীরভাবে শিয়ারে উত্তর দিল, "হাতটিকে আপনি অপমান করেছেন, ও আরও ভাল ব্যবহার পাওয়ার উপযুক্ত। আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, ওটি অত্যন্ত সম্মানিত এক ব্যক্তির হাত।"

বাড়ীওয়ালা যেমনভাবে এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে চলে গেল। শিয়ার তাকে অনুসরণ ক'রে হাতটি খুলে নিয়ে এসে দোরার ঘরের ঘন্টার সঙ্গে আটকে রাখল; বলল, "এইখানে রাখাই ভাল, প্রতি রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার পর কত শুভতর চিন্তা ও আমার মনে এনে দেবে।" ঘন্টাখানেক বাদে আমি বাড়ী ফিরে গেলাম।

সেদিন রাত্রে আমার ভাল ঘুম হ'ল না। আমি অত্যন্ত ভীত ও উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। চমকের সঙ্গে কয়েকবার ঘুম ভেঙে গেল, এমন কি, একবার মনে হ'ল যেন একটা লোক আমার ঘরে ঢুকেছে। আমি উঠে পড়লাম, কাপড় রাখবার ঘরের ভিতরটা আর খাটের তলাটা একবার দেখে নিলাম। অবশেষে, ভোর তখন আন্দাজ ছ'টা—সবেমাত্র আমার একটু তন্দ্রা এসেছে—দরজায় একটা প্রবল আঘাতের শব্দে আমি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। বিবর্ণ, কম্পিত-কলেবর, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আমার বন্ধুর পরিচারক প্রবেশ করল। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, "বাবু, আমার মনিবকে কারা খুন ক'রে গেছে।" কাপড়-চোপড় পরে নিয়ে তাড়াতাড়ি শিয়ারের বাড়ীর দিকে চললাম।

বাড়ীটি জনাকীর্ণ; সকলেই অবিরত তর্কবিতর্ক করছে, আর এদিক ওদিক আনাগোনা করছে। প্রত্যেকেই এই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে মন্তব্য করছে। অতি কষ্টে আমি শয়নঘরে পৌঁছলাম। দরজায় পাহারা বসান হয়েছিল; নাম বলতেই আমাকে ঢুকতে দেওয়া হ'ল। নোটবই হাতে নিয়ে চারজন পুলিস-অফিসার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁরা পরস্পরের মধ্যে চুপি চুপি কথা বলছিলেন এবং নোটবই-এ লিখে নিচ্ছিলেন। বিছানার ওপর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শিয়ার শুয়ে রয়েছে, পাশেই দু'জন ডাক্তার ঘুমাবার্তা বলছেন। শিয়ারের মৃত্যু হয় নি, কিন্তু তাকে ভীতিবিহ্বল দেখাচ্ছে। তার বিস্ফারিত নয়ন, প্রসারিত চক্ষু-তারকা যেন ভূত ও ভয়ঙ্কর কোন কিছুর প্রতি অবর্ণনীয় শঙ্কা-সহকারে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একখানি চাদরে তার দেহের চিবুক পর্য্যন্ত ঢাকা দেওয়া রয়েছে; চাদরটি আমি খুলে ফেললাম। তার গলাতে পাঁচটি আঙুলের গভীর দাগ দেখা যাচ্ছে, জায়গায় জায়গায় কোঁটা কোঁটা রক্তের দাগ। ঠিক এই সময় একটা বিষয় আমার মাথায় এল। শয়নকক্ষের ঘন্টাটির প্রতি দৃষ্টি ফেলতেই দেখলাম, হাতখানি অদৃশ্য হয়েছে। পাছে রোগীর ঘুমে সমবেত সকলে ভয় পায়, নিশ্চয়ই এইজন্যে ডাক্তারেরাই ওটিকে সরিয়ে ফেলেছেন, কারণ হাতখানি সত্যই ভীতিকর। এ সম্বন্ধে আমি আর কাউকে কোন প্রশ্ন ক'রলাম না।

পরের দিনের সংবাদপত্র থেকে একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি; পুলিস কর্ত্তৃক সংগৃহীত অপরাধের বিস্তৃত বিবরণ এতে পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে:

"গতকল্য একটি লোমহর্ষক অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে; নরঘাতিক সম্প্রতি একটি আইনের ছাত্র মঁসিয়ে শিয়ারে বি—এই ঘটনার আক্রমণকারী। রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় একটি যাইতে কিরিয়া আসিয়া পরিচারক বোদ্‌ভিল্‌কে বলে যে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে সে শয্যাগ্রহণ করিতে যাইতেছে। যখা রাত্রিতে অকস্মাৎ প্রবল ঘন্টাধ্বনি শুনিয়া পরিচারকের নিদ্রাভঙ্গ হয়। অত্যন্ত ভীত হইয়া সে প্রদীপ আনিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। ঘন্টাধ্বনি মিনিটখানেক থামিয়া পুনরায় এত প্রচণ্ড জোরে শুরু হয় যে, পরিচারকটি হতবুদ্ধি হইয়া দারোগানকে জাগাইবার জন্য ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। দারোগান পুলিসে সংবাদ দেয় এবং প্রায় পনেরো মিনিট পরে তাহারা ঘরে ফিরিয়া আসে।

"একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আসবাবপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং আক্রান্ত ও আক্রমণকারীর জন্যে যে একটা ভীষণ সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে, সমস্ত কিছু হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। ঘরের মাঝখানে শিয়ার বি—নিশ্চল অবস্থায় শুইয়া রহিয়াছে, তাহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু বিস্ফারিত, গলায় উপর পাঁচটি আঙুলের গভীর দাগ। ডাক্তার বোর্দেঁকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া আনা হয়; তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী আততায়ী নিঃসন্দেহে প্রভূত শক্তির অধিকারী এবং তাহার

হাতখানি অসাধারণ কৃশ ও লেখনীযুক্ত। অপরাধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই এবং অপরাধীর কোন খোঁজও পাওয়া যায় নাই।"

পরদিন সেই সংবাদপত্রটিই খবর দিল :

"গতকল্য প্রকাশিত লোমহর্ষক আক্রমণের লক্ষ্য মঁসিয়ে পিয়ারে বি—ডাক্তার বোর্দোঁয় দুই ঘণ্টা একান্ত প্রচেষ্টার পর সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার জীবনের ভয় কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। অপরাধীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

কথাটি সত্য প্রমাণিত হ'ল। বেচারী বন্ধুটি আমার পাগল হ'য়ে গেল। সাত মাস ধ'রে তাকে দেখতে প্রত্যহ আমি হাসপাতালে যেতাম। কিন্তু সামান্য বোধশক্তিও সে ফিরে পেল না। বিকারের ঝোঁকে সে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলিত, সকল উন্মাদ ব্যক্তির মত একটা ধারণা তাকে অধিকার ক'রেছিল,—সে সর্বদা কল্পনা করিত, একটা প্রেতমূর্তি তাকে অনুসরণ করছে। তার অবস্থা অবনতির দিকে—এই সংবাদ দিয়ে একদিন আমাকে তার বাড়ী থেকে পাঠানো হ'ল। আমি যখন পৌঁছলাম, তখন তার মৃত্যু আসন্ন। দু' ঘণ্টা সে বেশ শান্ত রইল, তারপর সহসা, আমাদের বাধাদান সত্ত্বেও, বিছানায় উঠে ব'সে চীৎকার ক'রতে আরম্ভ ক'রল : "ওরা, ওরা! আমার গলা টিপে ধ'রেছে! সাহায্য কর, সাহায্য কর!" চীৎকার করতে করতে সমস্ত ঘরটা সে দু'বার দৌড়ে এল, তার পরে মাটিতে মুখ দিয়ে প'ড়ে মৃত্যুবরণ ক'রল।

সে অনাথ, কাজেই তাকে কবর দেবার জন্য নরম্যাণ্ডির ছোট গ্রাম পি—পর্যন্ত আমাকে যেতে হ'ল, এখানেই তার পিতা-মাতাকে কবর দেওয়া হ'য়েছিল। যেদিন আমরা 'লুই আর্ব'-এর বাটিতে মদ্য পান ক'রছিলাম, সে সন্ধ্যায় সে এই গ্রাম থেকেই এসে আমাদের সেই হাতখানি দেখিয়েছিল। একটি সরাইখানার মধ্যে তার মৃতদেহটি রাখা হ'ল। চার দিন পর অত্যন্ত বিষাদ-পূর্ণ অন্তরে বৃদ্ধ পুরোহিতের সঙ্গে সমাধিক্ষেত্রের দিকে হেঁটে চললাম। মনোরম আবহাওয়া ; আলোকোজ্জ্বল নীল আকাশ ; পাখীরা ঝোপের মধ্যে গান ক'রছে, শৈশবে যার থেকে এখানে তো আমরা কতবারই আসতাম। তারপর এই ফলের রসে ওঠ ও গণ্ড কালো ক'রে আমরা বাড়ী ফিরতাম।...পুরোহিত তার বই খুলে মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ ক'রলেন। রাস্তার শেষ প্রান্তে কবর-খননকারীদের কোদালির শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি।

সহসা তারা আমাদের ডাকতে লাগল, পুরোহিত তাঁর প্রার্থনা-পুস্তক বন্ধ ক'রলেন ; ওরা কি চায়—দেখতে আমরা এগিয়ে গেলাম। ওরা একটি সরাধার খ'ন ক'রে ফেলেছে। কোদালির এক আঘাতে ওরা সরাধারটির আবরণ উন্মোচন ক'রল,—আমরা দেখলাম একটি অস্বাভাবিক দীর্ঘ কঙ্কাল সূর্য-রশ্মিতে যেন অবজ্ঞাভরে আমাদের প্রতি তাকিয়ে রয়েছে। অজানা কারণে অদ্ভুত একটা অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করলো এবং আমি প্রায় ভীত হয়ে উঠলাম। ওদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, দেখ দেখ, এর একখানা হাত কাটা।...এই যে এখানেই ওটা রয়েছে।" এই ব'লে সে লম্বা শুষ্ক একখানা হাত তুলে নিয়ে আমাদের হাতে দিল ; কঙ্কালের পাশেই ওটা প'ড়ে ছিল।

"চলে এসো," পুরোহিত বললেন, "মৃত ব্যক্তিকে শান্তিতে থাকতে দাও, সরাধার বন্ধ করো। বেচারী মঁসিয়ে পিয়ারের জন্য আমরা অন্য কোথাও কবর খনন করবো।"

পরদিন সব কাজ শেষ ক'রে আমি আবার প্যারী যাত্রা ক'রলাম। যে-লোকটির সমাধি-সুখ আমরা ব্যাহত ক'রেছিলাম, তার আত্মার শান্তি কামনা ক'রে প্রার্থনা করার জন্য বৃদ্ধ পুরোহিতের হাতে আমি পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক দিয়ে গেলাম।

জাতির জনক

বন্দে আলী মিয়া

তুমি আমাদের ক্ষমা করো
এ-যুগের মহামানব তুমি—জগতের শ্রেষ্ঠ মানব তুমি
আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো।
এ-জাতিকে পাপমুক্ত করতে এসেছিলে যেথা,
হে ভারতের স্বাধীনতার জনক,
হে তপস্বী— হে সন্ন্যাসী,
তুমি বুকের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিলে আমাদের শত পাপ।
পরাধীনতার পাপ আর সঙ্কীর্ণতার পাপ,
যে-পাপ যুগে যুগে হয়েছে সঞ্চয়
যে-পাপ করেছে মিরজাফর আর উমিচাঁদের দল
পলাশীর মাঠে
যে-পাপ করেছে তারা সিরাজের উষ্ণ শোণিতে
সেই পাপে বাংলার স্বাধীনতার রবি গিয়েছিল
অস্তাচলে
সেই পাপে সমগ্র ভারত পুড়িয়াছে এতকাল।

হে মহাত্মা,
তোমার বুকের রক্তে ভারতের মাটি পুনরায় লাল
হয়ে গেল।
আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা খুন হ'ল তার সাথে;
যে-স্বাধীনতার তুমি জনক—
তোমার দীর্ঘ তপস্যায় পেয়েছি আমরা যে অমৃত
সে-অমৃত খুনে হ'ল রাঙা।
লক্ষ লক্ষ অসহায় শিশু আর নারীর চোখের জলে:
তাদের স্নেহের শোণিতে সে-স্বাধীনতা হ'ল নীল।

তুমি ভারতের বিশ্বাস্
তোমার প্রলাপ।
তোমার হত্যা করেছে একজন নর-পিশাচ।
(ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।)
কারাবালায় এমাম হোসেনের শিরশ্ছেদ করেছিল
সীমার।
বিশ্বাসকে ক্রুশে বদ্ধ করেছিল একজন ইহুদী—
সিরাজকে ছুরিকাঘাতে বধ করেছিল মোহাম্মদী-বেগ
তোমাকে হত্যা করেছে একজন মারাঠি পিশাচ।
দানব ও পশুতে যা পারে না,
মানব ও দেবতা যা পারে না,
নর-পিশাচ তা পারে
হে শহিদী পিতা,
ক্ষমা করো।

আধুনিক ইংরাজী কবিতা (প্রবন্ধের শেষ অংশ)

শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

পুতুলের মুখও এই সব ছেলেদের চেয়ে বেশি রাঙা
তাদের চোখ কাঁচের নয় তবুও জ্বলে,
তাদের উজ্জ্বল চাউনিতে
সূর্য্যালোক কাঁপে। এদের কুঁকড়ে যাওয়া ঠোঁটেও
একদিন প্রাণ ছিলো, উষ্ণ ছিলো রক্তে,
কিন্তু রক্ত শুধু
ছিলো ভিজে স্যাঁতসেঁতে হাড়ের ভেতর।
রক্ত তো ফেটে পড়তো না এমন ভাবে!
এইসব ছায়াচ্ছন্ন কক্ষ গুলো

লাল পাপড়ি সারাক্ষণ
তবে এমনভাবে কালো হয়ে উঠতো না।
এরা সবাই মৃত আজ:
বোলতার চাকের চেয়েও বিবর্ণ,
বনের শুষ্ক অন্ধকারের চেয়ে ম্লান।
দলচ্যুত হয়েছে এরা
কাগজের অক্ষরেরা লণ্ঠনের মত ভেঙে গেছে
ধোঁয়ার রাত্রে,
নিভে গেছে সকালের শুকনো খড়ো হাওয়ায়!

পরিব্রাজক কাম'নীত

শ্রীশুদ্ধোদন সেন

গুহ্যতত্ত্ব

সূত্রে উক্ত হইয়াছে, "দৈব, তুমিও চিন্তা কর ?·· না। ···দায়িত্বহীনতা···কারণ, যোগ, শাস্ত্র ঐতিহ্য।"

ব্রহ্মানন্দ যজ্ঞবল এর ভাষ্য করলেন :—

"দৈব তুমিও···অর্থাৎ শাস্তি।

"কারণ, পূর্ব্বোক্ত সূত্রে রাজশক্তি বা বর্ত্তমান-কর্ত্তৃক দস্যুর প্রতি প্রযুক্ত শাস্তির কথা বলা হইয়াছে : শাস্তি-গুলি এইরূপ :—হস্তপদ বা নাসিকাছেদন, তপ্ত কটাহ, তপ্ত লাক্ষামালা, দানবদ্বয়, চতুর্দ্দিক হ'তে কশাঘাত, অঙ্গাকৃষ্টক, তপ্ততৈলনিক্ষেপ, শিরশ্ছেদ, কুক্কুর নিয়োগ, জীবন্তে শূল ইত্যাদি। শাস্তিগুলির তালিকা দেখলেই বলা যায়, যেন দস্যু ধরা না পড়বার জন্য সম্ভবপর সকল উপায় গ্রহণ করবে এবং ধরা পড়লে পলায়নের জন্য সম্ভবপর সকল চেষ্টা করবে।

এক শ্রেণীর লোক বলে 'দস্যুকে দৈব শাস্তিও ভোগ করতে হয়।' সূত্র বলেন, 'না'। কারণ কি ? না এ ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতা প্রযুজ্য। তিন প্রকার ব্যাখ্যায় এ কথা বোঝান যায় : যুক্তি-সাহায্যে, বেদ হ'তে, আর পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক কাব্য হ'তে।

"যোগ বা শূন্যবাদ হেতু·· সূত্রকারটী হ'তে যুক্তিসঙ্গত এই সিদ্ধান্ত আসে যে, যদি আমি কোন ব্যক্তি বা প্রাণীর শিরশ্ছেদন করি, তা' হলে আমার তরবারি অবিভাজ্য অণুসমূহের মধ্য দিয়ে যায়, কারণ, ঐ অবিভাজ্যতার জন্যই ছেদন করবার ক্ষমতা তরবারির নাই। তা হ'লে তরবারি কোন বস্তুকে ছেদন করছে। না, অণুসমূহের অন্তর্বর্ত্তী শূন্য যোগকে। কিন্তু যোগের শূন্যতাগুণের জন্যই কেউ যোগের কোন ক্ষতি করতে পারে না, কারণ শূন্যের ক্ষতি করাও যা, পূর্ণের ক্ষতি না করাও তাই। ফলে যোগ ছেদনের জন্য কেউ অপরাধী বা দায়িক হ'তে পারে না এবং দায়িত্বহীন বা নিরপরাধের ওপর দৈবশাস্তি পতিত হ'তে পারে না। এই তথ্য নিধন সম্বন্ধে সত্য হ'লে যে সব অপরাধের জন্য মানুষেই কম শাস্তি দেয়, তার জন্য দৈবশাস্তি তো হ'তেই পারে না।

এই পর্য্যন্ত গেল যুক্তি-এর পর শাস্ত্র।

বেদ আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, এক মাত্র পরব্রহ্ম সৎ। বেদের এই উক্তি সত্য হ'লে হত্যা তো নিরর্থক মায়ামাত্র। এই তত্ত্বই বেদের একটী সূক্তে যেখানে মৃত্যুদেবতা যম বটুক নচিকেতস (নচিকেতাঃ)কে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ করছেন, সেখানে অন্যান্য আরও তথ্যের মধ্যে উক্ত হয়েছে—

"হত্যা ক'রে যে জন ভাবে ঘাতক সে ত,
হত হ'লে যে জন ভাবে সেই নিহত,
মূঢ় একজন, অপর জ্ঞানহীন
এ নয় ঘাতক, ও নয় প্রাণহীন"।

কৃষ্ণার্জ্জুনের বীরগাথার এই মহাসত্যই আরও পরিস্ফুট করে বোঝান হয়েছে। কৃষ্ণ কে ? না, তিনি অনাদি, অনন্ত, সনাতন, শাশ্বত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অচিন্তনীয় পরাৎপর পরমেশ্বর ;— সকলজীবের মোক্ষের জন্য তিনি এই ধরাধামে জন্ম পরিগ্রহ ক'রেছিলেন। নরদেহে কৃষ্ণ জীবনের শেষাংশে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে কৌরবদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন ; কারণ কৌরবগণ অর্জ্জুন ও তদ্ভ্রাতৃগণের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেছিলেন। পাণ্ডব ও কৌরবসেনা যুদ্ধার্থে পরস্পরের সম্মুখীন হল ; অর্জ্জুন দেখলেন শত্রুসেনা মধ্যে তাঁরই বন্ধু, আত্মীয় ভ্রাতা প্রভৃতি দণ্ডায়মান (এর কারণ পাণ্ডব ও কৌরবগণ দুই সহোদর ভ্রাতার সন্তান)। এই যুদ্ধে এদের স্বজনবর্গকে হত্যা করতে হবে এই চিন্তায় অর্জ্জুনের হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন হ'ল ; কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে তিনি আনত বদনে রথে উপবিষ্ট রহিলেন ; তাঁর পার্শ্বে তাঁর সারথি স্বর্গদেব কৃষ্ণ। মহবনা পাণ্ডুপুত্রের চিত্তাধারা কৃষ্ণের অজ্ঞাত রহিল না।

"মিতহাস্যে তিনি অর্জ্জুনকে শত্রু ও স্বপক্ষীয় সেনা দেখাইলেন : দেখাইলেন, এরা জগতে আসে আর চলে যায়—কিন্তু আসা, থাকা আর যাওয়া মায়ামাত্র ; কারণ ঐ সকলের মধ্যেই সেই একমাত্র পুরুষ বিদ্যমান যাঁর অস্তিত্বের

(গত ফাল্গুন সংখ্যার পর)

উদ্দ অজ্ঞাত, সন্ধ্যাও কখন আসবে না, বা চতুর্থ
থাকে স্পর্শ করে না—

"কোন হত্যার জন্য যে কাউকে দায়ী ক'রে
হেথায় পণ্ডিতকে যে মনে করে নিহত,
সে জানে না, কিছুই জানে না—
কারণ কেহই ঘাতক বা নিহত নহে,
অতএব তুমি ওঠ, যুদ্ধ কর!"

এইরূপ উপদেশ লাভ করে পাণ্ডবের রাজা যুদ্ধার্থে শঙ্খনাদ করলেন, তারপর যুদ্ধ হ'ল, তিনিই জয়ী হলেন। অতএব তোমরা বুঝতে পারছ 'নরদেহে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ উক্ত তত্ত্বতত্ত্বের প্রকাশ দ্বারা অর্জুনকে অজ্ঞান দুর্বলচেতা সাধারণ মানুষ হইতে জ্ঞানী স্থিরচিত্ত কর্মযোগীতে পরিণত ক'রলেন।

"তা হ'লে সিদ্ধান্ত দাঁড়াচ্ছে এই :—

"যে হত্যা করে বা হত্যা করায়, যে ধ্বংস করে বা করায়, যে আঘাত করে বা করায়, যে দেহীর প্রাণ হরণ করে, অথবা যে বস্তু তার অধিকারভুক্ত নয়, সেই বস্তু গ্রহণ ক'রে, বা কারও বাড়িতে সিঁদ কাটে বা অন্যের ধন-সম্পত্তি অপহরণ করে -সেই যাই করুক না কেন, কোন অপরাধ তার ওপর বর্তে না। আর যে এখানে এই পৃথিবীতে এখনই এই জীবনে সু-ধার কুঠার দিয়ে কোন প্রাণিদেহকে অস্থিহীন মাংসপিণ্ড বা নিরাকার পিণ্ডমাত্রে পরিণত করবে, সে ঐ কার্য্য হেতু কোন অবৈধ, অন্যায় বা পাপের ভাগী হ'তে পারে না এবং যে ব্যক্তি গঙ্গাতীর হ'তে বরাবর হত্যা ও ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করতে করতে দক্ষিণাভিমুখে চলে যাবে, এই কারণেই তার কোন পাপ হবে না, এবং যে গঙ্গাতীর হ'তে দাক্ষিণ্য ও পূজার অনুষ্ঠান করতে করতে বরাবর উত্তরদিকে চলে যাবে, সেও ঐ পূর্বোক্ত কারণে কোন পুণ্যের অধিকারী হবে না। দাক্ষিণ্য, সংযম, ত্যাগ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে পুণ্য হয় না, সৎকার্য্যও হয় না।"

এর পর কতকটা বিস্ময়কর কতকটা ভীষণ।

৪৭৭ম সূত্র

আরম্ভ হ'ল ; সংক্ষিপ্ত সূত্রটী এইরূপ—

"বরং খাদক হেতু- "

সূত্রের বক্তব্যের এই বক্তব্যাংশ সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা আমাদের শোনালেন—

"তস্কর বা নরহত্যার ওপর কোন দৈবশাস্তি আপতিত হওয়া ত অতি দূরের কথা, 'বরং' তার বিপরীত দিকটাই চিন্তনীয়। অর্থাৎ প্রাণ বা পদার্থ-অপহারক ঈশ্বরতুল্য হ'য়ে যায়। আমি এখনই বেদের যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করব, তা' হ'তেই বিষয়টা পরিষ্কার বোঝা যাবে; শ্লোকটীতে পরমেশ্বরকে 'খাদক'রূপে সম্মানিত করা হ'য়েছে—

"তিনি যোদ্ধা ও ব্রাহ্মণকে সমভাবে অন্নতুল্য ভক্ষণ করেন, তাদের তিনি আসিক্ত ক'রে নেন মৃত্যুরূপ পানীয় দ্বারা।"

"বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় ব্রহ্মেই ; ব্রহ্ম পুনঃপুনঃ বিশ্ব সৃষ্টি ও ধ্বংস করছেন। অতএব ঈশ্বর শুধু স্রষ্টা নন, সকল সৃষ্ট বস্তুর খাদকও ; সেই সকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বর্ণ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মাত্র উল্লেখ করা হ'য়েছে, কার্যতঃ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দ্বারা সকল সৃষ্ট বস্তুকে বোঝান হ'য়েছে।

আর একটী শ্লোকে উক্ত হয়েছে—

"আমিই তাদের সকলকে ভক্ষণ করি,
আমাকে কেহ ভক্ষণ করে না।"

বটুক বেদবিদিকে বেদরূপী পরমেশ্বর স্বর্গলোকে নিয়ে গিয়ে স্ব-মুখে এই কথাগুলি বলেছিলেন। অপহৃত ব্রাহ্মণতনয় ক্রুদ্ধভাবে জানতে চাইলেন—কে তাঁকে অপহরণ করেছে, বললেন, কে তুমি—আত্মপরিচয় দাও নইলে আমি অভিশাপ দিয়ে তোমায় দগ্ধ করব।" তখন বেদরূপী ঈশ্বর প্রকাশ করলেন তিনিই ব্রহ্মন, সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে এক মাত্র সৎ। বললেন—

"কে হত্যা করতে পারে, কে করে বন্দী,
তোমায় পথ তোলায় কে সেই দেব?
দেব সে আমি এইরূপে আবির্ভূত,
দেব, সে আমি, সর্বরূপে আবির্ভূত।"
"যে কেহ ভয় পায় সে যে কোন বস্তু হতেই হ'ক,
সে আমি, আমি ভয়, আমি ভীত আমিই ভয়ঙ্কর,
ভূমাতে এর তত্ত্ব রক্ষিত—
আমি সকলকে ভক্ষণ করি,
আমাকে কেহ ভক্ষণ করে না।"

কে আমায় জানতে পারে ?
কেউ কি জানে আমার নাম ?
সর্ব্বশত্রুকে আঘাত করি আমিই
আমায় আঘাত কেউ করে না।

অতি ক্ষীণবুদ্ধিও এবার বুঝতে পারবে যে, পরব্রহ্মের পক্ষে হত ও ভক্ষিত হওয়া অসম্ভব—শান্ত, শিষ্ট, আত্ম-সংযমী হ'লে সেটা সম্ভব হ'ত কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরতুল্য কার্য্য হচ্ছে ধ্বংস ও হত্যায়। সংক্ষেপে, সকলকে চরম আঘাত-হানা ও চূর্ণ করা এবং নিজে অক্ষত থাকাই পরম ধর্ম্ম।

সুতরাং এখন নিঃসন্দেহে এ কথা বলা চলে যে, হিংসা-বৃত্তিধারীর জন্য দৈবশক্তি ও নরক নির্দ্ধারিত আছে, এ তত্ত্ব শক্তিশালীর হাত হ'তে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য দুর্ব্বলরা আবিষ্কার করেছে।

এই সব অহিংসাবাদীদের সমর্থনযোগ্য দুই একটী শ্লোক যদি বেদের কোথাও দেখা যায় তবে বুঝতে হবে, ঐ সব অংশ বিশ্বাসঘাতক কোন দুর্ব্বলচেতা সুযোগসন্ধ প্রক্ষিপ্ত করেছে। ঋগ্বেদে উক্ত হয়েছে, সমগ্র বিশ্বে ও সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মন অবস্থিত হ'লেও মানুষেই তাঁর প্রকাশ সর্ব্বাধিক। আবার সর্ব্ব মানবের মধ্যে দস্যু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে দস্যুতে তাঁর প্রকাশ সর্ব্বাধিক। অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, সৃষ্ট বিশ্বে দস্যুই শ্রেষ্ঠ।

যে তস্কর দস্যুর স্তরে উন্নীত হয় নাই, তার সম্বন্ধে বলা যায় যে, সে শাস্ত্রোক্ত "আমার আমার" এই মায়া ও মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সাধনের চরম বিরোধী—এই ধারণা হ'তে মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য দিবারাত্র আপন সাধনায় মগ্ন। এ হ'তে প্রমাণিত হয় যে, তস্করের বৃত্তিই পরম সত্যের প্রতিনিধি, তৎসত্ত্বেও দস্যু তার হিংসাবৃত্তির জন্য তস্কর অপেক্ষাও উন্নত।

অতএব প্রতিবাদাতীত সত্যরূপে এই তথ্য ন্যায়, যুক্তি ও শাস্ত্রীয় সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হ'ল যে, দস্যুই সৃষ্টির পরমপুরুষ।

গণ-জাগৃতি

শ্রীকল্যাণকুমার সেনগুপ্ত

জনসমুদ্রে জোয়ার দেখিতে পাই
মহাবন্যার ঘোর জলরাশি ছুটিয়া আসিছে তাই।
আমি শুনি আজো এই শ্রাবনের ক্ষুব্ধ রোষের গান ;
যত অন্যায়, লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা অপমান
সব জঞ্জাল ধুয়ে মুছে যাবে চিরতরে একাকার,
ইতিহাসে এক নব অধ্যায় সুরু হবে এইবার।

•

প্রণাম করেছি যুগসত্যের এ বিরাট চেতনায়
প্রণাম করেছি কোটি মানুষের আত্মত সাধনায়।

এইবার এসো মহান কর্ম্মী লয়ে সুকঠোর পণ,
এসো হে শিল্পী, মানুষের বুকে আঁকো সত্যের ধন,
এসো বিজ্ঞান, হেথায় তোমার বিশ্ব রচনা করো
মাঠে ঘাটে ঐ ফিরিছে মানুষ সবাকার হাত ধরো,
বাহির-বিশ্বে মিলনসূত্র গেঁথে ফেলো এইবার ;
জ্ঞানের তরণী বহিয়া আনুক জীবনের ধন্যার।

আমি, মহাভারতের এ-মাটির বুকে চাহি নব জনপদ,
কোটি জীবনের চাই অগণিত নবীন যাত্রা-পথ,
স্বপ্ন আমার, গণদেবতার পূর্ণ প্রকাশ চাই
মরুবালুকার ফসলের ঘ্রাণ আমি যে পেয়েছি ভাই,
আমি যে শুনেছি জনসমুদ্রে জোয়ারের আহ্বান
কর্ম্মের পথে শুরু হোক তবে নিরলস অভিযান।

প্রতীক্ষা

কয়েন (Karen) জাতির উপকথা।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস

[কয়েন জাতি ব্রহ্মদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (Largest racial minority)। সম্প্রতি ইহাদের একদল ব্রহ্মদেশীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে স্বতন্ত্র-রাষ্ট্রের দাবী করিয়াছে।]

বহুকাল পূর্ব্বে এক পাহাড়ের সন্নিকটস্থ বনভূমিতে ঠমেপা নামক এক বৃদ্ধ পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা প্রভৃতির সহিত একই গৃহে সুখে বাস করিত।

একদিন সেই বনে এক দুর্দ্দান্ত বন্য বরাহের আবির্ভাব হইল। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ শূকরকে বধ বা ধৃত করা সম্ভব হইল না।

তখন ঠমেপা মনে করিল, "আমি তো বৃদ্ধ হইয়াছি, মনে জোরও কিছু আর আছে। আমি এই শূকরকে বধ করিতে চেষ্টা করিব।" এই স্থির ক'রে সে সড়কি হাতে নিয়ে শূকরের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে অনেক চেষ্টার পর শূকরকে বধ করিল। কিন্তু ঠমেপা একে বয়সে বৃদ্ধ, তার উপর শূকরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার দেহও ক্লান্ত হইয়াছিল। সে শূকরের মৃত দেহটী বনের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

শূকরটী হত হইয়াছে শুনে তাহার পুত্র ও জামাতাগণ বনে গিয়া মৃত শূকরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও মৃতদেহের সন্ধান পাইল না। তখন ঠমেপা নিজে গিয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। মৃতদেহ পাইল না বটে, কিন্তু শূকরের একটী বৃহৎ রক্ত পাওয়া গেল। ঠমেপা ঐ রক্তের একটী চিরুণী নির্ম্মাণ করিল। একদিন ঐ চিরুণী সযত্নে কেশচর্চ্চা করিবার সময় তাহার বার্দ্ধক্য বিদূরিত হইল এবং সে একেবারে তরুণ যুবক হইয়া গেল। তাহার বৃদ্ধা স্ত্রীও ঐ চিরুণী দিয়া কেশচর্চ্চার ফলে তরুণী যুবতীতে রূপান্তরিত হইল।

যে-দিন থেকে এই চিরুণী ঠমেপার গৃহে স্থান পাইল, সে-দিন থেকে উহার পরিবারের মধ্যে মৃত্যু বলে আর কিছু রইল না। ঠমেপার পর তিন পুত্র, কন্যা, নাতি, পুতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ফলে কালক্রমে তাহার বাসস্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল—লোক আর ধরে না। তখন ঠমেপা ভাবিল এইস্থানে কবর খুঁড়িতে গেলে কবর ঢাকা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট মাটী পাওয়া যাইবে না। এমন একটী স্থান দেখিতে হইবে, যেখানে একটী কবর খনন করিলে সাতটা কবর চাপা দেওয়ার মত মাটী পাওয়া যায়। এই মনে করে সে তাহার পরিবারস্থ সকলকে লয়ে নিয়ে এরূপ স্থান অনুসন্ধান করিতে বহির্গত হইল। এক পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর অপর পারে এরূপ একটী স্থানের সন্ধান মিলিল। তখন সে ফিরিয়া আসিয়া পরিজনবর্গকে ডাকিয়া নিয়া গেল।

স্রোতস্বিনীর নিকট পহুঁছিলে তাহার পুত্রকন্যাগণ বলিল যে, তাহারা খানিক বিশ্রাম করিয়া রন্ধন করিয়া খাইয়া, পরে স্রোতস্বিনীর পরপারে যাইবে। ঠমেপা বলিল, "তা হ'লে তোমরা খাওয়া দাওয়া করে এস, আমি যাই।" বলিয়া স্রোতস্বিনীর অপর পারে চলিয়া গেল।

বিশ্রাম ও আহারের পর ঠমেপার পরিজনবর্গ পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। পথে একস্থানে বৃহৎ কদলীবৃক্ষের দেখিতে পাইল। কদলীবৃক্ষে বৃহৎ ও সুরসাল কদলীফল প্রচুর পরিমাণে ফলিয়াছে, দেখিতে পাইল। তাহারা স্থির করিল, কর্ত্তা তো বহুদূর হইয়াছেন। উঁহাকে আর ধরিতে পারা যাইবে না। এই মনে করিয়া তাহারা সেই স্থানেই রহিয়া গেল।

কিন্তু ঠমেপা যাইবার সময় সেই শূকরদন্তের চিরুণীটি সঙ্গে নিয়া গিয়াছিল। চিরুণীর অভাবে পরিজনবর্গের মধ্যে মৃত্যু দেখা দিল। এক এক করে সব মরে যেতে লাগ্‌ল।

ঠমেপা এখনও তাহাদের আসিবার প্রতীক্ষায় আছে। *

* "প উ" নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত গল্পের সংক্ষানুবাদ।

তপ্তপানি প্রস্রবণ, ঋষিকুল্যাহ্রদ ও গোপালপুর

শ্রীতুষারকান্তি গুপ্ত

কতবার তো গঞ্জাম প্রদেশে পিতার কাছে গিয়াছি, এবারও যাইতেছি। কিন্তু এতদিন যেন চোখ থাকিতে চোখ ছিল না। এবার দৃষ্টিদান করিলেন একজন স্বনাম-প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকপ্রবর—তাউই মহাশয়। এবার তাঁর দেওয়া চোখে নতুন করিয়া দেখিলাম যত সব পুরাতনকে। এ সব যে এত শোভাময় তাহা কখনই অনুভব করিতে পারিতাম না—তাঁর কৃপা না হইলে। তিনি কত সব বলিলেন—কত ঐতিহাসিক গবেষণার কথা। সে সব তাঁর কলম দিয়াই ভালভাবে বাহির হইতে পারে, আমাকে দিয়া নয়। আমি শুধু দৃশ্যগুলির কথাই বলিব। তিনি যাহা ভাবাবেশে অনর্গল বলিয়া গিয়াছেন, যতটা তার মনে আছে তাহাই গুছাইয়া বলিব।

মাদ্রাজ মেলে বহরমপুর হইতে বাহির হইয়াছি। মাদ্রাজী সৈনিকরা বেপরোয়া ভাবে শুইয়া আছে। জ্যাঠামহাশয় (ডাঃ ভুবনচন্দ্র গুপ্ত এম, বি, বি-এস) ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া গেলেন। সঙ্গে তাউই মহাশয় (শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায়), তাঁহার মধ্যমপুত্র (আমাদের জামাইবাবু—শ্রীযুক্ত রামগোপাল রায়), আমার জ্যাঠতুতো দিদি (রামবাবুর স্ত্রী) ও জ্যাঠতুতো দাদা (চিন্ময়)।

ভোরের দিকে তাউই মহাশয় আমাদের ঘুম ভাঙাইয়া দিলেন। চিল্কা-নদটিকে দূরে দেখা যাইতেছে। তিনি আমাকে হাতক্যামেরায় নদের ছবি তুলিতে বলিয়া তাঁর নোটবইতে আপন মনে লিখিতে বসিলেন। আনন্দ-উল্লাসে ঘণ্টা দেড়েক কাটিল। তার পর আসিল গঞ্জাম-প্রদেশের দৃশ্য। আকাশচুম্বী পূর্বঘাট্ যেন সূর্যকে আড়াল দিয়া আছে। বহরমপুর ষ্টেশনে আসিলাম। আমার পিতৃদেব [শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত বি-সি-ই (পাটনা), এ-এম-আই-এস্-এস্ (লণ্ডন)] আমাদের ষ্টেশনে লইতে আসিয়াছেন। তিনি এখানকার একজিকিউটিভ ইঞ্জি-নিয়ার। সকলে গিয়া গাড়ীতে উঠিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু তাউই মহাশয় দাঁড়াইয়া সেই পাহাড়-প্রাচীর দেখিতেছেন। তিনি আমায় ডাকিলেন। আমার পাহাড়ের ছবি তুলিতে বলিলেন।

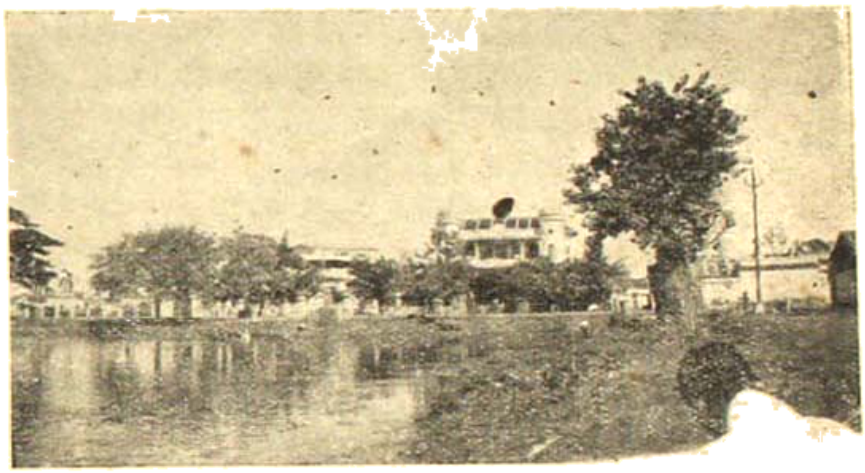

রামলিঙ্গেশ্বরম্ (ব্রহ্মপুর)

তার পর বহরমপুরে আমরা কত যে বেড়াইলাম পিতৃদেবের সেই (ও-আর-বি ১৪নং মার্কা) মোটারে। একদিন আমাদের অতি ভাল লাগিল গঞ্জামীদের রামলিঙ্গেশ্বরম ট্যাঙ্ক ও মন্দিরের পরিবেশ। তাউই মহাশয়ের নির্দেশে ফটো নিলাম। মহান-অপূর্ব সেই দৃশ্য। বহরমপুরে (না—ব্রহ্মপুরে··· ব্রহ্মের তাউই মহাশয় বার-বার আমাদের বলিয়া দিলেন এটা ব্রহ্মপুর) এই স্থানটির তুল্য সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও নাই। তপোবনের মতন শান্তিপ্রদ। মন্দিরনিচয়, অতিথিশালা—সবই ট্যাঙ্কের উপর। সে সকলের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইতেছে বৃহৎ পাথর-বাঁধানো ট্যাঙ্কের জলে। দূরে পাহাড়ের অধিত্যকায় যেন মুনিগণমনলোভকারী কুঞ্জ।

তার কয়েক দিন পরে তিন বৈবাহিকের একত্র মিলন হইল। তাহারও একখানা ছবি নিলাম।

দিন চার পরে তপ্তপানিতে যাওয়া গেল। ব্রহ্মপুর

হইতে তপ্তপানি সুদীর্ঘ ৩১ মাইল দূরে। খুব উৎসাহের সঙ্গে বাহির হওয়া গেল।

তপ্তপানির পথে

আমরা প্রথমে বাস-ষ্ট্যাণ্ডে যাইয়া লোকনাথ মোটর সার্ভিসের লোহাগুড়ির বাসে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী

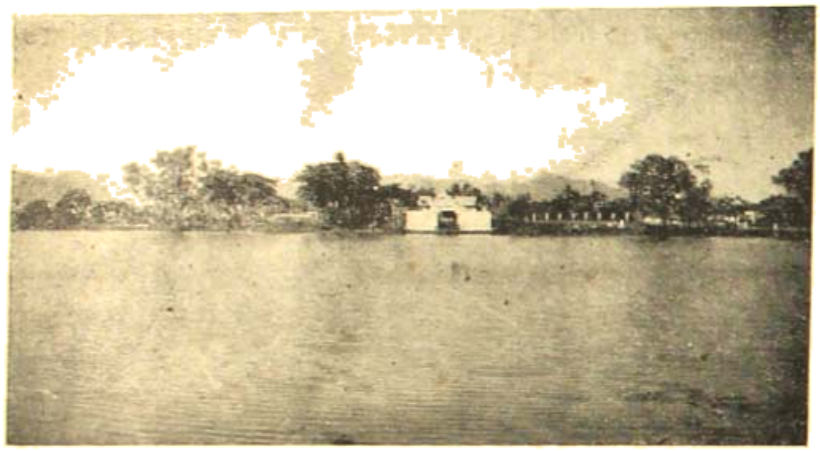

রামলিঙ্গেশ্বর পুকুর ও মহাদেবের মন্দির

ছাড়িতে ছাড়িতে সাতটা বাজিয়া গেল। সহরের ভিতরের রাস্তা বেশ ভালই কিন্তু সহরতলীর রাস্তাটি অত্যন্ত খারাপ। বেশীক্ষণ এমন অবস্থা রহিল না, আমাদের বাস এবার লোহাগুড়ির রাস্তা ধরিল। খুব ভাল রাস্তা। রাস্তায় দক্ষিণপুরগ্রাম পড়িল। দক্ষিণপুরগ্রামে উড়িয়া ও তেলেগুলোকের বাস। পথে আমগড়, রঘুনাথমন্দির ও ঈশ্বরমন্দির পড়ে। দক্ষিণপুরের রাধাকৃষ্ণমন্দির পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দু'পাশের দৃশ্য তখন অতি চমৎকার। সূর্য্যের নবীন আলোকে তখন চারিধার ঝলমলক রিতেছে। তদুপরি দু'ধারে শ্যামল ধান্যক্ষেত্র আর পশ্চিমে পাহাড়। রাস্তায় আরও কতকগুলি গ্রাম পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে বড়খেমন্ডি গ্রামে আসিল। বড়খেমন্ডি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। বাস গিয়া তথায় দাঁড়াইল। কাছেই একটি দোকানে আমরা তিন জন নামিয়া প্রাতঃকালীন জলযোগ সমাপন করিলাম। তথায় আধঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়ার পরে আবার বাস চলিল। কত কি আমার দৃষ্টি-পথের সামনে আসিয়া স্বপ্নের ন্যায় মিলাইয়া গেল! দেখা দিল গোচারণ-মাঠ। দুই তিনজন রাখাল বালক পুরাণের সেই গোপবালকদের মত বসিয়া, ৪০।৫০টি গরু তাহাদের ঘিরিয়া রোমন্থন করিতেছে। তার পরে আসিল সভ্যজগতের প্রতীক একটি সুন্দর পুল। পুলটি অনেকটা হাওড়া পুলের অনুকরণে নির্ম্মিত। স্পীড্‌মিটারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, কাঁটা চল্লিশের ঘরে। বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলাম দেখিলাম সারি সারি গাছ দাঁড়াইয়া। মনে হইল—যেন তাহারা প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া সসম্মানে আমার অভিবাদন করিতেছে। বাস্ এবারে সানুখেমন্ডি গ্রামের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। সানুখেমন্ডি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। একটি বাজারও আছে। এখানে তেলেগু লোক নাই বলিলেও চলে। অধিকাংশই উড়িয়া। আধঘণ্টা পরে বাস্ আবার যাত্রা করিল। আমি রাস্তার এক পার্শ্বস্থিত দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। আমার এ-ভাব কাটিল গাড়ীর কাঁকুনীতে। তখন দেখিলাম সামনে দাঁড়াইয়া এক বিরাট পর্ব্বতমালা। যাহা আমরা দূর হইতে দেখি অস্পষ্ট, তাহা আজ একেবারে স্পষ্ট। মেঘিয়া মনে হইল, তাহারা যেন সমুদ্রের তরঙ্গমালা। মনে মনে বন্দনা করিতে লাগিলাম—

"হে মহান্ গিরিপর্ব্বত চেয়ে দেখ নূতন জগৎ
খোলো বারেক আঁখি খোলো,
অতীতের যে স্মৃতি বক্ষে লইয়া দাঁড়ায়েছ তুমি।
তাহারই কথা তুমি বলো।"

পরে আরম্ভ হইল ঘাট (পর্ব্বতারোহণের পথকে ও-দিকে বলে 'ঘাট')। এতক্ষণ অবধি পাহাড় দূর হইতে দেখিতেছিলাম কিন্তু এবার তাহার উপরে চড়িবার পালা। রাস্তা ঠিক ইংরাজী ইউর মত। অনেকগুলি ইউ একসঙ্গে জুড়িলে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি। পাহাড় কাটিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, দুই পাশে ঘন জঙ্গল। কিছু

ঘুরে আসার পরে রাস্তার বা-পাশে তপ্তপানি হইতে জল একটি নালার আকারে আসিতেছে। কিছুক্ষণ চলিবার পরে তাহা রাস্তার ডান পাশে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার পরে বাঁ-পাশে চলিয়া গিয়াছে। আঁকা-বাঁকা রাস্তার জন্য এরূপ দেখাইতেছে বুঝিলাম। আধঘণ্টা চলার পর বাস তপ্তপানির ডাকবাংলোর সামনে আমাদের নামাইয়া দিয়া লোহাগুড়ি চলিয়া গেল। তখন বেলা দশটা। আমরা বাংলোয় ঢুকিলাম। চমৎকার বাংলোটি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নীচে থেকে দেখায় ঠিক ছবির মতন। চারি পাশে গোলাপ ও অন্যান্য ফুলের বাগান। তাহার চারিদিকে গগনস্পর্শী বৃক্ষসমূহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, কি সুন্দর যে সে দৃশ্য, তাহা কল্পনাই করা যায় না। স্নান করিতে ও কুণ্ড তিনটি দেখিতে বাহির হওয়া গেল। ভাবিয়াছিলাম কিছু একটা দেখিবার মত জিনিষ হইবে। কিন্তু দেখিয়া হতাশ হইতে হইল। কেবল তিনটি চৌবাচ্চা. প্রথমটিতে দেখিলাম, উত্তপ্ত জল বহির্গত হইতেছে। তাহার মাঝখানে একটি পাথর। প্রথম কুণ্ড হইতে জল দ্বিতীয় কুণ্ডে যায়। এবং সেই কুণ্ড হইতে তৃতীয় কুণ্ডে যায় আমরা দ্বিতীয় কুণ্ডটিতে ১৫ মিনিট গা ডুবাইয়া বসিয়া থাকিলাম। তাহার পরে গা-হাত মুছিয়া বাংলোর দিকে চলিলাম। বাংলো হইতে

গোপালপুরের সমুদ্র

কুণ্ড তিনটি পাঁচ মিনিটের পথ। বাংলোয় যাইয়া কাপড়, জামা ছাড়িয়া খাইয়া নিলাম। তারপর ইজি চেয়ারেই একটু শুইয়া নিলাম। উঠিয়া দেখি দুইটা বাজে। সকলে মিলিয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম।

ঋষিকুল্যা হ্রদ

ইতিমধ্যে আমাদের বাস লোহাগুড়ি হইতে আসিয়া গেল। আসিবার সময় কি দৃশ্যই আমি দেখিলাম! চারিদিকে দিগন্তব্যাপী শ্যামল শস্যক্ষেত্র। মৃদু হিল্লোলে ঢেউ খেলে যায় তাহাদের উপর দিয়া। পশ্চিমে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা। মাঝে মাঝে পাহাড়ের তলায় তালবন। কোথাও বা ছোট ছোট গ্রাম। ঠিক ছবির মতন দেখিতে। মনে হইল এই আমাদের জন্মভূমি··· সুফলা সুফলা শস্য-শ্যামলা ভারতবর্ষের প্রকৃত ছবি। সমস্তই প্রাকৃতিক। কৃত্রিমতার লেশমাত্রও নাই। সভ্য জগতের কোন ছাপই পড়ে নাই। এ দৃশ্য অবর্ণনীয়। এইসব দৃশ্য দেখিয়া মনে বারংবার এই প্রশ্ন জাগ্রত হয়। এত সুন্দর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন যিনি, তিনি কত বড় শিল্পী? মন বারংবার সেই শিল্পীর চরণে নত হইয়া যায়।

কয়েকখানি ফটো লইয়াছি। সেইগুলি স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ থাকিবে।

রিজার্ভায়ার (ঋষিকুল্যা হ্রদ)

রিজার্ভায়ারের মোড়ে আমাদের মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। প্রায় এক মাইল হাঁটিয়া সেখানে পৌঁছিলাম। বহরমপুরের হইতে ৪ মাইল দূরে রিজার্ভার। রিজার্ভারের

সামনে সুন্দর ফুলবাগান। রাস্তার পার্শ্বে কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা দেখিলাম। চৌবাচ্চা-গুলি অত্যন্ত গভীর। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া রিজার্ভারের বাঁধের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রকাণ্ড দীঘি, পর্ব্বতমালা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ-পার্শ্বে একটি পাহাড়, তাহাতে কোন গাছপালা

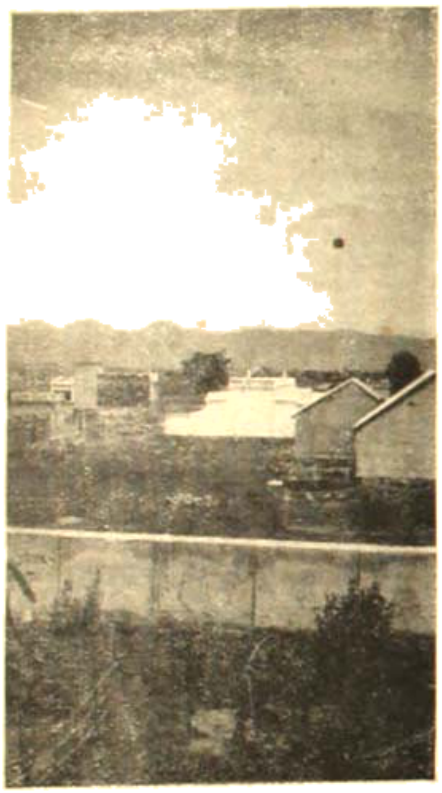

ব্রহ্মপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ

বা ঘাস নাই। অপর একটি পাহাড় উত্তরে। অপরটি পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা।

রায়কোণ্ডা হইতে কবিকুলানদীর জল আসিতেছে। একটি কেনালের আকারে আসিয়া তাহা রিজার্ভারে পড়িতেছে। উত্তরে একটি নালার ভিতর দিয়া উক্ত কেনালের জল রিজার্ভারে ঢুকিতেছে। দক্ষিণে একটি sluice Chamber রহিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া জল যাইয়া চৌবাচ্চায় পড়িতেছে এবং তথায় পরিস্রুত করা হইতেছে। তথা হইতে জল সমস্ত বহরমপুর সহরে যোগান হইতেছে। বাঁধের উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য সত্যই চিত্তাকর্ষক।

অনেক বেড়াইয়া বাড়ী ফেরা গেল। ফিরিবার সময় তাউই মহাশয়কে দেখিয়া মনে হইল—যেন স্বপ্নরাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। তিনি বলিলেন আমি ইহার নাম দিলাম কবিকুলাহ্রদ।

গোপালপুর (Gopalpur)

খাওয়া দাওয়ার পরই বাহির হওয়া গেল গোপাল-পুরে। বহরমপুর হইতে ১৬মাইল যাইতে হইবে। সঙ্গে বাড়িলেন মা ও ভাইবোনেরা। তাহা ছাড়া আগন্তুক আমাদের সবাই তো আছিই। গোপালপুরে ঢুকিতেই ডেলে দুনিয়াদের সারি সারি লালমাটির লেপা ঘর। বিরাট মিশমিশে কালো কপ্‌নীপরা লোকগুলোকে দেখাইয়া তাউই মহাশয় বলিলেন—'দেখ, এরাই রামায়ণ যুগের বানর। লাঙুল মানে যেমন লেজ·· লাঙুল মানে তেমনি নৌকার হাল। সমুদ্রচারী এরা হাল চালাতে পটু হ'তে বাধ্য—মাছ ধরে আর খায়—আর কোন শিক্ষাদীক্ষা নেই এদের।—আর ঐ তোমাদের তেলেগু পঞ্চামীরা সেই রাক্ষস-বংশ—বেশ শিক্ষাদীক্ষা আছে।—আর একটা সেই রাম-বনবাসের দেশ।—তবে যুগযুগান্ত চলে গেছে—বদলে গেছে অনেক—কিন্তু সব বদলায় নি—চেনা যায়। সমুদ্রের ধারে আসিয়া পড়িলাম, মনে হইল সাহেবপাড়া। সমুদ্রের ধারে সব হোটেলই সাহেবদের। স্নানের খুব সুবিধা। দুনিয়াদের নিয়া দিদি ও জামাইবাবু স্নানের জন্য নামিয়া পড়িলেন। দু'একখানি ছবি তুলিতেই রিল্ শেষ হইয়া গেল। নূতন রিল্ পরাইতে পারিলাম না। তাউই মহাশয় এই স্থানের পুরাতন ইতিহাস জানিতে কয়েকটি বৃদ্ধ তেলেগুর সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। সমুদ্র তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত, সৈকত ভ্রমণে মত্ত পরিচিত অপরিচিতগণের আনন্দ উচ্ছ্বাস, মেঘরৌদ্রের খেলা, দেব-মন্দির হইতে আগত সায়ংকালের শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি, স্নানের শেষে অর্দ্ধনগ্ন সাহেব-মেমগণের কাঠের তক্তা নিয়া ঢেউয়ের মুখে যাওন—তাউই মহাশয় কবিতা লিখিতেছেন—

এ-কোন অমৃতের ধারা
অরূপ মধু পারা
মরণ যেন পালিয়ে গেল
ভুলিয়ে দিল ধরা।

রাত্রি হইয়া গেল বাড়ী ফিরিতে—যেন সব অমরতা নিয়া ফিরিলাম।

সত্য

শ্রীসুজাতা ঘটক

শনিবার। বিকাল তিনটায় ট্রেণে দেখে যেতে হবে। কেরাণীর জীবন, শনিবারটা তার পক্ষে একটা উৎসবের দিন,—অফিসের শেষে দেশ-তীর্থের প্রবল আকর্ষণ তা'কে জীবন-মরণের অপেক্ষ রাখতে দেয় না; তাই প্রথম ট্রেণখানা ধ'রবার জন্তে তা'কে প্রাণপণ করতেই হয়। তাই কণ্ঠাগত প্রাণ ক'রে ষ্টেশনের দিকে পাড়ি দিলাম। প্রথম ট্রেণখানা যদি ফস্‌কে যায়, তবে গৃহ-লক্ষ্মী যে তার স্বামী-দেবতাকে খুব সাদর অভ্যর্থনা জানাবে না এই চিন্তায় একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠলাম।

চলন্ত ট্রামকে থামবার অবসর দেবার পূর্বেই বীরদর্পে ঝাঁপ দিলাম ফুটপাতের ওপর। কোন রকমে পতনের মুখ থেকে নিজেকে সামলাতে সামলাতে—দর্শকবৃন্দের তিরস্কার ও নিজের অপরাধ-নিবারণার্থে পুরস্কার-স্বরূপ আসন্ন গঞ্জনার হাত থেকে নিস্তার পেতে ছুট দিলাম ষ্টেশন অভিমুখে। কি-ভাবে যে টিকিটখানা হস্তগত হ'ল তবে দেখার পূর্বেই দ্বিতেকে এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় কোন রকমে গলিয়ে দিলাম।

যখন সম্বিত ফিরে এলো, দেখি ট্রেণখানার দেহ ন'ড়ে উঠেছে, খোলা জানালার রন্ধ্র দিয়ে ঢুকছে মুক্ত হাওয়ার শীতল স্পর্শ।

পকেটের কোন সকালে-চালা-সুগন্ধ মাখানো রুমাল-খানা নানা খুঁটি-নাটি জিনিষ-চাপার আড়াল থেকে টেনে বা'র ক'রে যুদ্ধ-ক্লান্ত সৈনিকের মত ঘর্মাক্ত মুখ-খানা প্রাণপণে ঘসে মেজে সুন্দর করতে প্রয়াস পেলাম। সহসা পাশে নজর পড়তেই দেখতে পেলাম, কি যেন একটা সভার মত বসে গেছে। অর্থাৎ সকলেই যেন একটা ঔৎসুক্য ভরা দৃষ্টি নিয়ে আসন্ন কিসের একটা প্রত্যাশায় অপেক্ষমান হ'য়ে আছে। অগণিত দেহ ও মস্তকের আড়ালে ঠিক ব্যাপারটা বোধগম্য না হওয়ায় যাত্রা-সভার আসন-প্রার্থীর পন্থা অবলম্বন করতে লাগলাম। প্রথমে পাশের জনতার দেহের ফাঁকে ফাঁকে ধীরে ধীরে নিজের দেহটাকে প্রবেশ করিয়ে একটু পাশ-মোড়া দিতেই যে পরিমাণে স্থান-সঙ্কুলান হ'তে উঠে তাকেই অবলম্বন ক'রে পরবর্ত্তী ধাপে অগ্রসর হ'তে থাকি। এমনি ক'রে যখন সভাস্থলের নিকটবর্ত্তী হতে সক্ষম হলাম, দেখি এক ঝুটা-জুটধারী গেরুয়ায় সজ্জিত সাধুবাবাই সেই আসরের উপলক্ষ্য। বোধ হয় এই অল্প সময়ের মধ্যে বাবাজী কতকগুলি যাত্রীকে শিষ্যত্বে বরণ করতেও সক্ষম হয়েছেন।

সম্ভবতঃ আমার ঔৎসুক্য ও উৎসাহ সাধুদেবতার অন্তরকে না হ'ক, দৃষ্টিকে আকর্ষণ ক'রেছিল। তিনি তাঁর রক্তজবা-লাঞ্ছিত চক্ষু দু'টি বৎসরোনাস্তি ছোটার কোমল ক'রে আমার নয়নে স্থাপন ক'রে বললেন,—"আয়, বেটা, আয়। আরে—তুই দেখছি এক মস্ত ভক্ত, —ভাগ্যবান তুই! আয় বেটা—এখানে ব'সে যা।

বোধ হয়, স্বয়ং দেবতার আহ্বানে আমার মতন একজন ন-পণ্য সাধারণ যাত্রীর প্রতি—পারিপার্শ্বিক ভক্তবৃন্দের মনে শুরুত্ব এনে দিলে। তাই সসম্ভ্রমে কয়েক জন ঠেলা-ঠেলি করে বৈশাখেদি হ'য়ে আমার একটু বসবার স্থান ক'রে দিলেন। আর কিছুর জন্তে না হোক, অন্ততঃ আমার এই ক্লান্ত দেহটাকে একটু বিশ্রাম দেবার সুযোগ পাওয়ায় —মনে মনে সাধুবাবাকে ও তদোধিক অন্তর্যামী ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম।

তৎক্ষণে সাধুবাবার গুরুগিরি আরম্ভ হ'য়ে গেছে। একটু খেমে,একটু হেসে ভক্তবৃন্দ ও নিকটস্থ অন্যান্য দর্শক-বৃন্দের প্রতি ধ্যান-নিমিলিতবৎ চক্ষু দু'টি বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—'বল্ বেটা, তোরা বল্, এই যে তোদের মনুষ্যজন্ম,এর মধ্যে সার জিনিসটা কি বুঝেছিস?'

ক্ষণেকের জন্ত সকলে নিস্তব্ধ। তার পর একে একে কয়েক জন আপন আপন জ্ঞানের মন্থন-পর্বত মন্থন ক'রে বাক্য-সুধা পরিবেশন ক'রলেন—যেন কতকটা সাধুজীর মনস্তুষ্টির জন্তেই। কেউ বললেন,—'মোক্ষলাভের উদ্দেশ্য থাকা উচিত—।' কেউ বললেন,—প্রাণী মাত্রেই নারায়ণ, তার সেবায় আত্মনিয়োগ করা উচিত। জনসেবাতেই ভগবান লাভ হবে।'

কত জনের কত কথা। এরা তো এঁদেরই বাড়ীর দরজায় মাথা কুটে রক্ত বার করেও কোন ভিখারী একমুষ্টি ভিক্ষা পায় না। রাস্তায় প'ড়ে থাকা মৃত্যুমুখী অনাথকে দেখে

ঘৃণায় নাকে কাপড় বা রুমাল চাপা দিয়ে পালিয়ে যেতে চান এঁরাই—যাঁরা সাধুবাবার কাছে মোক্ষ ও ধর্মের ভাওতা খেয়ে সহজ ভক্তের ভণ্ডামীর মুখোশ পরে আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন।

সাধুবাবা আবার মুখের পানে চেয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কি রে বেটা, তুই যে বড় চুপ ক'রে আছিস? তুই কিছু বল্'—

কী আর বলব। অতি সোজা কথা। বাল্যকাল থেকেই যে জিনিষটা চিনেছি, যাকে সব চেয়ে বড় বলে মেনে নিয়েছি, তাকে অস্বীকার করা কেমন করে যায়। এই যে এত দার্শনিক—দর্শনতত্ত্বের অদৃষ্ট সত্যকে মিথ্যার আড়ালে সত্য বলে প্রকাশ করলেন, এঁদের ভণ্ডামী যেখানে আত্মতৃপ্তির শান্তিধারা বর্ষণ ক'রে দিয়ে গেল, সেখানে অতি সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে পাছে মা'র খেয়ে ফিরতে হয়, এই ভয়েই একটু থতমত খেয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যে কয়েকটি ষ্টেশন পার হ'য়ে গেল। প্রতি ষ্টেশনে কিছু কিছু যাত্রী নেমে যাওয়ায় গাড়ীর ভীড় অনেকটা ফাঁকা হ'য়ে এলো। কেবল সাধুবাবার আশে পাশে যারা বসেছিলেন, তাঁদের এখনও সময় হয় নি ব'লেই বোধ হয় নিজ নিজ স্থানে অনড় হয়ে বসেছিলেন।

সাধুমহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করেন,—'কি বাবা! চুপ করে রইলে যে? একটা কিছু বল'।

বললাম,—মনুষ্যজন্মে সার বস্তু অর্থ—

বাস্! যেন একসঙ্গে কতকগুলো চটপটিতে আগুন হ'য়ে গেল। বাবার একসঙ্গে কতকগুলো টাটি লাগানোর মতই উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী বাক্যবাণ ছড়াইতে লাগিলেন,—সাবাস, মশাই! সংসার করে করে একেবারে বিষয়ী হয়ে উঠেছেন দেখছি,অর্থ ছাড়া সংসারে আর কিছুই চেনেননি। কেউ বললেন,—'ম'শাই বুঝি 'বেঙ্ক'? কেউ বললেন, শাস্ত্র-টাস্ত্র ম'শায়ের কাছে কিছুই না? বলি, মশায়ের গলদেশে একগাছা পৈতেও উঁকি মারছে, ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই। জীবনে কখনও সন্ধ্যা-আহ্নিকটাও করেন নি বোধ হয়। একজন মন্তব্য প্রকাশ ক'রলেন—'এই জন্যেই হিন্দুদের আজ এত অধঃপতন। হবেই বা না কেন? কলি—ঘোর কলিতে ছেয়েছে। হিন্দুর হিন্দুত্বই যদি না থাকলো ত' পৃথিবীর আর ক'দিন? কলি উল্টাতে আর তো বেশী দিন নেই'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতক্ষণ সাধুবাবা সকলের মন্তব্য শুনলেন। এইবার তিনি মুখ খুলতেই সকলে বাবাজীর কথা শুনবার জন্যে নির্ব্বাক উৎকণ্ঠ হয়ে উঠলেন। বাবাজী বললেন—বেটা, তোর মুক্তির অনেক দেরী আছে রে—অনেক দেরী আছে। তুই তালো গুরু দেখ, দীক্ষা নে বেটা, তোর সংসারের মায়ার বোঝা অনেক কেটে যাবে, দিব্যদৃষ্টি লাভ কর বেটা, মোক্ষ লাভ হবে,—ওয় পাসনে, ভগবান তোকে সংসার-সমুদ্র পার ক'রে দেবেন।

মনে মনে সবই বুঝলাম, সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য মহৎ - চেলা শীকারের উদ্দেশে প্রভুর এই সভার সৃষ্টি—স্থান-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে।

মাকে এক ষ্টেশন। সহসা অনেক টিকিটহীন ধুরন্ধরের মনে ত্রাস উৎপাদন করে উঠলেন এক টিকিট-ইন্‌স্পেক্টর। —"টিকিট, টিকিট।" যে যার কেনা টিকিট বা মাসিক টিকিট দেখিয়ে অব্যাহতি লাভ করছে।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ে সাধুবাবাজীর মুখের প্রতি। সেই ভগবৎ-কৃপা-লব্ধ পরমহংসের মুখশ্রীতে কি রকম যেন একটা ভাবান্তর দেখা যায়।

"টিকিট, টিকিট—"। সাধুবাবার কাছ পর্য্যন্ত এগিয়ে আসেন ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়।

সাধুবাবা আত্মসংবরণ ক'রে এক অপূর্ব্ব হাসিতে ইন্‌স্পেক্টরকে অভিভূত করার চেষ্টা ক'রে ব'লে ওঠেন,—"টিকিট কি ক'রে কিনবো বেটা? পয়সা তো নেই। সব ছেড়ে ভগবানের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি রে—"

"ও-সব চালাকি ছেড়ে এখন টিকিট দেখাও, ভগবানকে পরে দেখিও। যাও—যাও, জলদি কর—"

বেগতিক দেখে সাধুবাবা চুপ। কেবল আশেপাশে পারিষদবর্গের সাহায্যের আশায় তাকিয়ে দেখেন, কখন তাঁরা একে একে স'রে পড়েছেন। দুই একজন তখনও সরবার চেষ্টায় ছিলেন, সাধুবাবার দৃষ্টি তাঁদের পরে পড়া মাত্র তাঁরা ব'লে উঠলেন, "তাই তো!"—পকেটে

এক-আধবার হাত দিয়ে বললেন, "ইস্, পকেটেও কিছু নেই যে এই সময়।" অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, পরের ষ্টেশনে তাঁরা একসঙ্গেই নেমে পড়লেন।

"কই, দিন, দিন, পয়সা বার করুন।" গম্ভীরস্বরে ইন্‌স্পেক্টর বলেন নিজের পকেট থেকে একখানা খাতা ও পেন্সিল বার করতে করতে।—"কলকাতা থেকে আড়া এক টাকা ছয় আনা—বার করুন মশাই।"

"ছেড়ে দে বেটা, তোর ভালো হবে,—"

"আচ্ছা, আমার ভালো সে আমি দেখবো'খন, এখন ভালয় ভালয় পয়সা দাও তো দাও, নইলে পুলিশে—

অসহায় সাধুবাবার মুখে হতাশার চিহ্ন ফুটে ওঠে। কাতর দৃষ্টিতে নির্বাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। সেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টি এখন আর অর্থের অনর্থত্ব স্বীকার করে না। নিজের অজ্ঞাতসারেই পকেটের মনিব্যাগটি টেনে বার ক'রে হাতড়াই। সঞ্চিত দুইটি টাকার নোট ইন্‌স্পেক্টরের হাতে দিতেই বাকী পয়সা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি নেমে যান। পকেটে মনিব্যাগটি রাখতে রাখতে সাধুবাবাকে বলে উঠি, "কি বাবাজী—অর্থই জীবনের অর্থ? না অনর্থ?" উত্তরের আশায় তাকিয়ে দেখি, সাধুবাবা তাঁর আসন ইতিমধ্যে ত্যাগ করে চুপি চুপি নামবার উদ্যোগ করছেন। আমার কথার উত্তরে একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলন্ত গাড়ী থেকে তিনি প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন।

নববর্ষ

শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আগত নবীন বর্ষ, এস ধীরে মন্থর আবেশে,
যাহা ছিল পুরাতন তার এই বিদায়ের শেষে।
বাতাবী-কুঞ্জের তলে মধু গুঞ্জনে
ছায়াচ্ছন্ন বনতলে বকুলের ঘন কুঞ্জবনে
কিশলয়পুঞ্জ মাঝে শোনা গেল তব পদধ্বনি,
চৈত্রের সন্ধ্যাশেষে দুটি সুর গেল অনুরণি ;—
হে নূতন মর্ত্য-ভব-বাঞ্ছিত নবীন,
অশোকের কুঞ্জতল আবিরের মত রঙে হল যে রঙীন্
আনন্দ মুখর সবে তোমার এই আগমন-ক্ষণে
অনাগত ভবিষ্যৎ স্বপ্নলোকে স্বপ্নজাল বোনে
নবীন বর্ষ এস, এস এস মানুষের একান্ত অতিথি,
অভিজ্ঞার সুপ্রভাতে লহ তুমি আমাদের প্রাণের প্রণতি।

শেষ মিনতি

শ্রীচারুচন্দ্র সেন

একটি ছোট কামরা। আসবাব বলতে কিছুই নাই। একখানা তক্তোপোষ, অতি সাধারণ একটি বিছানা। একখানা টেবিলে অযত্নে রক্ষিত কয়েকখানা বই। টেবিলের সম্মুখের দেয়ালে বৃদ্ধা মহিলার ফটো টাঙান রহিয়াছে। সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া ১৮।১৯ বৎসর বয়স্ক একটি যুবক ফটোখানার দিকে তাকাইয়া বারংবার প্রণাম করিতেছিল। পরে টেবিলে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রি তখন নয়টা বাজিতে চলিয়াছে। বৃদ্ধ ভৃত্য বুড়ো ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "এ কি? দিলুভাই খাবে না চলো। আর দেরি করলে বৌমা রাগ করবেন, নয়টা বাজে।" যুবকটি মাথা উঠাইয়া উত্তর করিল, "বুড়ো আমি পাশ করেছি, এই সন্ধ্যার সময় টেলী পেলাম। আজ কেবলই ঠাকু-মার কথা মনে হ'চ্ছে।" বুড়ো আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ ভাই, বাবুকে গেয়ে বলে আসি।" যুবক বলিল, "না, না, আমিই যাচ্ছি। চলো—"

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সে আজ বার বছর আগেকার কথা। দিলিপের মার মৃত্যুর পর সবাই শুনিল যে তাহার পিতা কাটোয়ার উকিল বাবু শরৎচন্দ্র গুপ্ত আর বিবাহ করিবেন না। কিন্তু হঠাৎ যেদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া আসিলেন সেদিন দিলিপের ঠাকুরমা নীরবে এবং গোপনে অনেক অশ্রুই বিসর্জন করিয়াছিলেন। শরৎ বাবু নাকি তাঁহার নূতন স্ত্রীর সহিত দিলিপের পরিচয় করিয়া দিতে অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সাত বৎসর বয়স্ক দিলিপ তাহার ঠাকু-মার অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া রহিল। নূতন গিন্নি বোধহয় সেটা এখনও ভুলিতে পারেন নাই। তাই শরৎবাবুর মাতা মৃত্যুর পূর্ব্বে বুড়োকেই বলিয়া গেলেন দিলিপকে দেখিতে আর তাঁর সব কিছুই তিনি জবা রাখিয়া গেলেন বুড়োরই নিকট।

শরৎবাবু নূতন গিন্নির সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক সেই সময় দিলিপ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "বাবা আমি পাশ করেছি—এই টেলিগ্রাম।"

শরৎবাবু—বেশ, এখন কি করবে ভাবছো?

দিলিপ—বি, এ, পড়বো।

শরৎ—আচ্ছা তা তেবে দেখি। যা দিনকাল পড়েছে। ব্যবসাতে কিছু আয় নেই বল্লেই চলে। বি-এ পড়ার খরচও কম নয়।

নূতন গিন্নি এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বিয়ে দিয়ে পড়া খরচ নাও।" দিলিপ নিঃশব্দে সেই স্থান ত্যাগ করিল।

দিন তিন, চার পর বুড়ো একদিন দিলিপের ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাই কলকাতা যাচ্ছ না যে। যারা পাশ দিয়েছে শুনছি সবাই নাকি কলকাতা চলে গিয়েছে।

দিলিপ—কলকাতা যাব কি? বি-এ পড়তে অনেক খরচ। টাকা কোথায় পাব?

বুড়ো—তাও, টাকার জন্য কলেজ যাবে না? তোমার ঠাকুরদা মরবার সময় আমায় ৪০০৲ দিয়ে গিয়েছিলেন, সুদে আসলে অনেক টাকা হয়েছে। আমি সে টাকা থেকে তোমাকে দেব। তুমি কালই কলকাতা যাবে। আমি সব গুছিয়ে দিচ্ছি।

দিলিপ কেবলমাত্র বলিল, "বুড়ো ভাই, উত্তরের চোখে জল।

কলিকাতা আসিয়া দিলিপ স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া অরফোর্ড মিশন্ হোষ্টেলে জায়গা নিল। কতগুলি মানুষের চরিত্রে এইরূপ বিশেষত্ব আছে যে তাহারা যাহার সংস্রবে যায় তাহাকেই তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করে। দিলিপও সেই শ্রেণীর একজন। সে সুদর্শন বলবান ও বিচক্ষণ। কলেজ অথবা হোষ্টেলে সকল ব্যাপারেই সে ছিল সকলের এগুতে। স্নেহের স্বাদ জীবনে সে বড় পায় নাই। পারিবারিক জীবনে সুখ রাখার স্থান তার ছিল না কিন্তু এই দিকের নিঃস্ব অবস্থা তাহাকে মুষড়াইয়া দিতে পারে নাই। খেলার মাঠ, কলেজ ইউনিয়ানএর ডিবেটিং সোসাইটি বোটানিকাল গার্ডেনের পিকনিক সবটার ভিতরেই সে ছিল অগ্রণী।

মনে হয় সব কিছুতে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া, সে ব্যথা বেদনা ভুলিয়া থাকিতে চাহিত। বন্ধু তাহার জুটিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু সুহৃদ পাইতে পাইল বহরমপুরের একটি ছেলে, তাহারই সহপাঠী এবং হোষ্টেলের সঙ্গী নাম অনিল।

কলেজ-ইউনিয়নে এর ডিবেটিং সোসাইটিতে সেদিন তর্ক শেষ হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গেল। দিলিপ, অনিল এবং আরো তিন চারটি ছেলে কথা বলিতে বলিতে বাহির হইতেছিল। একটি ছেলে বলিল, আজকের ডিবেট বেশ ভাল হয়েছে। খুব High order-এর। যাই বলিস, বীণা বোস বেশ বলে কিন্তু। দিলিপ বলিল, "Simply Splendid খুব ভাল বলেছে।" ঠিক সেই সময় বীণা আর দুই, তিনটি মেয়ের দল একেবারে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িতেই বীণা বলিল "Mr Gupta, আমার Heartiest congratulations আপনার arguments গুলি শুনে আমার যেন উত্তর দিতে উঠতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল।"

দিলিপ বলিল "Capitalist Democracy পক্ষে আপনি যা বলেছেন তা আর কেউ বলতে পারতো কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ আমি পারতাম না। Socialismর স্বপক্ষে বলা সহজ।"

বীণা—Economicsএর Principles গুলি আপনার কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে। বোধ হয় আপনার সময় হবে।

দিলিপ—হ্যাঁ, তা-তা একরকম করে নেওয়া যাবে।

মেয়েরা আগে চলিয়া গেল। অনিল বলিল "মিস্ ঘোষ বেশ চতুর মেয়ে। অপর একজন বলিয়া উঠিল "ও বাবা কি মতলব কে জানে; দিলিপ খুব বেশি ঘেঁসিস্ না কিন্তু।

উপর্য্যুপরি তিন চারদিন বর্ষণের পর সেদিন আকাশটা পরিষ্কার হইয়াছে। তখন বেলা দুইটা কি আড়াইটা হইবে।

দিলিপ—আমার আর তোদের বাড়ী যাওয়াই হচ্ছে না। আসছে রবিবার নিশ্চয় যাব।

অনিল—মা কতদিন তোকে নিয়ে যেতে বলেছেন, তোর সময়ই হয় না। যারা খুব হয়েছেন বলেই দিয়ে যাবেন।

দিলিপ—রবিবার ঠিক যাব।

অনিল—এই রোদে এখন কোথায় যাচ্ছিস্?

দিলিপ—একবার Motor Vehicle Office এ যাব licenso আনতে। Motor driving শেখা হয়ে গেছে। আজকে licenso পাব।

অনিল—তুই তাহ'লে এখন পাকা ড্রাইভার হয়ে গেছিস। এবারে একটা গাড়ী কিনে ফেল।

দিলিপ—গাড়ী কিনবি তুই। আমি চড়বো আর চালাব।

অনিল—আমি বুঝতে পাচ্ছি না তুই ওটা শিখতে গেলি কেন।

দিলিপ—শিখে রাখি হয়ত বা একদিন কাজে লাগবে।

বি, এ, এম, এ পাশ করে যা হবে বুঝতেই পাচ্ছি। মোটর ড্রাইভার বি, এ পাশের চেয়ে বেশি রোজগার করে।

অনিল—এটা তোর খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়।

দিলিপের বেলতলা Motor Vehicle Office হইতে licenso পাইতে প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গেল। বাসে চাপিয়া পুনরায় আসিয়া নামিল বিডেটার রোডের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিকটে। ইচ্ছা হইল সন্ধ্যাটা ময়দানে অতিবাহিত করিয়া হোষ্টেলে ফিরিবে।

রাস্তার উত্তর দিকে ঠিক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অপর পারে একখানা বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসিয়া সে চলিতে সুরু করিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পশ্চিম-দিকের রাস্তা দিয়া। অনতিদূরে একটি হিন্দুস্থানী ভৃত্য কোন এক সাহেবের ২।৩ টি কুকুরকে হাওয়া খাওয়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। হঠাৎ একখানা মোটর আসিয়া তাহাদের উপর পড়িতেই ভৃত্য চীৎকার করিয়া উঠিল। মানুষ বাঁচাইতে গিয়া মোটরখানা একটি কুকুরের উপর দিয়া চলিয়া গেল। একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। গাড়ীখানা দিলিপের অতি নিকটে আসিয়া পড়িল সব লোক দৌড়াদৌড়ি করিয়া গাড়ীর দিকে আসিতে-

ছিল। ফোটর চালক একটি বাঙ্গালী মেয়ে। দিলিপ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া মেয়েটিকে বলিল "আপনি চলুন, আমি ষ্টিয়ারিং নিচ্ছি।" মেয়েটি হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। সে কিছুই না বলিয়া বা দিকে দিটে যাইয়া বসিল। মুহূর্ত মধ্যে গাড়ীর চতুর্দিকে ভীড় জমিয়া উঠিল। সকলে এটা ওটা প্রশ্ন করিতে লাগিল। দিলিপই সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল এবং মেয়েটি নতমুখে বসিয়াছিল। দিলিপ আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রশ্ন কর্তাদের বলিল—"এসব কথার কি আবশ্যক, আমরা থানায়ই যাচ্ছি।" ইতি মধ্যে সেখানে একটি ট্যাক্সি আসিয়া জুটিয়াছিল, সে গাড়ীর নম্বর টুকিতে ব্যস্ত—BLD 6760 প্রশ্নে উত্তরেই নীরব। মেয়েটি নিজেকে একটু সামলাইয়া লইতেই দিলিপ বলিল "কলকাতার রাস্তায় আমরাই গাড়ী চালাতে সাহস পাই না, আপনি কি করে সাহস পেলেন?"

মেয়েটি—আমরা কলকাতার বাইরে থাকি, সেখানে আমি অতি সহজেই গাড়ী চালিয়ে থাকি। তাছাড়া আমার সব করে গাড়ী চালাতে শিখিয়েছেন।

দিলিপ—তা হবে, কিন্তু কলকাতার রাস্তায় গাড়ী চালাতে বোধ হয় তিনি বলেন নি।

মেয়েটি—আমি ড্রাইভার নিয়েই বাড়ী থেকে বেড়িয়েছিলাম। কিন্তু কি দুর্বুদ্ধি হলো তাকে হরিশ মুখার্জি রোডের মোড়ে নামিয়ে রেখে নিজেই গাড়ী চালিয়ে এলাম। সব হ'ল একবার কলকাতার ময়দানে গাড়ী চালাবার। এখন কি হবে?

দিলিপ—ভুল করেছেন। একটা কিছু হবেই। আমাদের যা বলবার আমিই বলবো। আপনি শুধু চুপ করে গাড়ীতে বসে থাকবেন।

মেয়েটি—পুলিশের হাঙ্গামা পোহাতে হবে। কোর্টে যেতে হবে তারপর বা জেল হয়।

দিলিপ—সে সব বোঝা আমি বইতে পারবো। আমি বলবো গাড়ী চালাবার সময় আমি এক্সিডেন্ট করেছি। কেবল ভাবছি আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেব।

মেয়েটি—বলবেন যে Friend,

দিলিপ—তাতে যে বিপদ নেই তা-ও নয়। অজ্ঞাত কুলশীলকে friend কি করে বলি। যা হোক একটা কিছু বলতেই হবে।

গাড়ী থানায় আসিয়া পৌঁছিতেই দিলিপ গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে যাইয়া দারোগার সহিত কি সব বলাবলি করিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বলিল "চলুন আপনাকে কোথায় পৌঁছে দিতে হবে। আমি গাড়ী সেখানে রেখে বাড়ী ফিরবো।"

মেয়েটি—আমাকে ল্যান্সডাউন রোডের নিকট পৌঁছে দিলেই হবে। তারপর আমি নিজেই গাড়ী নিয়ে বাড়ী ফিরবো।

গাড়ী চলিতে লাগিল—উভয়ে নীরব। মেয়েটি প্রথম কথা বলিল। "আমার জন্য মস্ত একটা বিপদ আপনি ঘাড়ে নিলেন। অথচ আপনাকে চিনি ও না, জানি ও না।

দিলিপ—চেনা পরিচয় পরে হলেও ক্ষতি হবে না। এইমাত্র আপনার নির্দেশমত বলে এলাম আমরা friends এই যে হাতে ল্যান্সডাউন রোড, আমি নেমে পড়ি, আপনি গাড়ী নিয়ে যান। দেখবেন এবার যেন মানুষের ওপর দিয়ে গাড়ী না চালান।

কথা কয়টি বলিয়াই দিলিপ হাসিয়া ফেলিল।

মেয়েটি—আপনি বোধ হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে বেড়াতে যান। আবার কবে দেখা হতে পারে বলুন আমি সেখানে যেতাম। আমার কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানান হয় নি। কিন্তু সত্যি বলতে কি সমস্তটা রাস্তাই কেবল আপনার কথাই ভাবছিলাম। নাম পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নি। আমার নাম উষা সেন।

দিলিপ—আমার নাম দিলিপ গুপ্ত। কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ আপনি পাবেন। আপনার বাড়ীর নম্বরটা বলুন আমি আপনাকে জানাব কবে আবার দেখা হতে পারে। কোর্টের হাঙ্গামা শেষ হলে আপনাকে এসে জানিয়ে যাব আমার কি সাজা হয়।

মেয়েটি—আমরা ৮নং ল্যান্সডাউন রোডে থাকি।

দিলিপ—বেশ তাহ'লে এখন চলি নমস্কার।

মেয়েটি প্রতিনমস্কার জানাইয়া গাড়ী স্যালডাউন রেসে ছুটাইয়া দিল। উমা কিম্বা দিলিপ নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া কাহাকেও কিছু বলিল না।

ঘাংলার লেকচার শেষ হওয়ায় পর মেয়েরা ফুল ক্লাস ছাড়িয়া তাহাদের বিশ্রামের ঘরে প্রবেশ করিল। হঠাৎ দরজার সম্মুখে দিলিপের সহিত বীণার সাক্ষাৎ হইতেই সে বলিল, "এই কয়দিন আপনাকে ধরবার কত চেষ্টাই না করেছি, কিন্তু কিছুতেই সুযোগ পাই নি। কালকে শনিবার বিকেলে আমাদের এখানে চা খাবেন—নেমন্তন্ন রইলো। আমাদের বাড়ীও খুব বেশী দূরে নয়—১৮নং সিমলা ষ্ট্রীট। কেমন রাজী তো?"

দিলিপ—কালকে সুবিধে হবে না। নয়ন তারা রইলো—হঠাৎ একদিন গিয়ে চা খেয়ে আসবো। নেমন্তন্নের ধার ধারি না।" বলেই সে হো-হো করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

অনিল ও দিলিপ যখন অনিলদের বাড়ী পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনিল ভৃত্যকে দিয়া সংবাদ পাঠাইয়া দিলিপকে নিয়া বসিবার ঘরে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার মাতা সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। দিলিপ উঠিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেই তিনি বলিলেন, "এসো বাবা এসো অনিল তোমার কথা যে কত বলেছে তার অবধি নেই। কালকে আমরা বহরমপুর যাব। একটি দিন মাত্র তোমায় দেখলাম। একবার বহরমপুর যেয়ো।

দিলিপ—আপনার পায়ের ধূলো পেতে বহরমপুর যাব বই কি?

অনিলের মা—হ্যাঁ বাবা ছেলেবেলা থাওয়ায় খুব কষ্ট হয়। যে কয়দিন এখানে ছিলাম মাঝে—মাঝে অনায়াসে আসতে পারতে।

দিলিপ—মা, সে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। একদিন খুব বদলে গেলে আবার নূতন করে কষ্ট হ'তো।

সকলেই হাসিয়া উঠিল। অনিলের মা বলিলেন—"বাবু বাড়ী নেই, ছেলে মেয়েকে নিয়ে গেছেন বেড়াতে।"

তিনি উহাদের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন—হঠাৎ সেই সময়েই ঝোড় তুলিয়া একখানা মোটর—B. B 6760 বাড়ীতে ঢুকিল।

যথা সময়ে পুলিস কোর্টে মামলা উঠিলে দিলিপের উকিল সব স্বীকার করিয়া বলিলেন, সাহেবের ভৃত্যকে বাঁচাইতে গিয়া মোটর একটা কুকুরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কোর্ট এটা বিবেচনা করিয়া শাস্তি দিবেন। complainant অত্যন্ত আনমনা ভাবে কুকুরগুলি ছাড়িয়া দিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। কোর্ট আদেশ দিলেন পঞ্চাশ টাকা জরিমানা অন্যথায় তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড। দিলিপ জরিমানার টাকা দিয়া খালাস হইয়া আসিল।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখের ময়দানে একটি বেঞ্চিতে দিলিপ বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল। সে সময় উমার মোটর আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ নিজে ড্রাইভ করে নাই, ড্রাইভার সঙ্গে ছিল আর সাথে ছিল ৯।১০ বৎসর বয়স্ক উমার ছোট ভাই। ছোট ভাইয়ের হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিতেই দিলিপ দাঁড়াইয়া বলিল—"এই যে আজ দেখছি ড্রাইভার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। হ্যাঁ ভাই তোমার নামটি কি?

বালক উত্তর করিল—বৈশাখ দেব।

দিলিপ—বা! বেশ নামটি। তুমি আমায় দিলুদা বলে ডাকবে। উমার দিকে তাকাইয়া বলিল—"আপনি না—না

তুমিও আমায় ঐ ব'লেই ডেকো। দিলিপ বাবু টাবু ভাল শোনায় না। উমা হাসিয়া বলিল—তাই হবে। কিন্তু দিলুদা আপনি তো আমায় চিঠি লেখেন নি। আপনার কি হ'লো? আমি রোজ টাকা নিয়ে এসে ফিরে গিয়েছি।

দিলিপ—চিঠি লেখা আবশ্যক মনে হ'লো না—বিশেষ মনে হ'লো যদি চিঠি কারো হাতে পড়ে, তা হ'লে অনর্থ ঘটবে। জরিমানার টাকা দিয়ে দিয়েছি।

উমা একতাড়া নোট দিলিপের হাতে দিতে যাইয়া বলিল, এই টাকাটা নিন্। দিলিপ চুপ করিয়া থাকাতে উমা স্থির থাকিতে পারিল না—"দিলুদা টাকাটা দিলেই কি সব দেওয়া হয়ে যাবে? আপনি যা করেছেন তা'

যে টাকার শোধ হ'তে পারে না—দিলীপ। দিলীপ নির্ব্বাক।

উমা আবার বলিল, আমরা বাবার চিকিৎসার জন্য ক'লকাতায় এসেছিলাম। তিনি সুস্থ হয়েছেন, এবার আমরা চলে যাচ্ছি।

ছোট ভাইটি মুখে একটা বেলুন নিয়া লাফালাফি ক'রতেছিল। এইবার দিলীপ বলিল—"তোমাকে সে-দিনের পূর্ব্বে কখনও দেখি নি। মনে হচ্ছে, তুমি যেন কত পরিচিত, কত আপনার। হয়ত আর কখনও দেখা হবে না। তোমার বিহনে সময় যদি একটা খবর দও—সেইদিন গিয়ে Motor Accident-এর ঘটনা সবাইকে জানিয়ে আসবো।" কথাগুলি শেষ হওয়া মাত্রই দিলীপ মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিল। উমা তাহার ভাইকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল।

বীণাদের বাড়ী। ছোট একখানা Drawing Room অতি পরিপাটি ভাবে সাজান। বীণা এবং ব্যারিষ্টার মিঃ চাকি কথোপকথনে ব্যস্ত।

মিঃ চাকি—তুমি যাই বেন না বল, আমি তোমাদের ঐ ডিবেটিং সোসাইটির তাৎপর্য্য বুঝতে পারি না। ডিবেট ক'রে মেয়েদের কি লাভ হবে! তবে যদি কেউ Bar Join করে।

বীণা—কেন মেয়েরা কি কিছুই নয় কি? ডিবেটে চিন্তাশক্তি বাড়ে, মনের সাহসও বাড়ে। সত্যি মিঃ চাকি সেদিন কলেজে দিলীপ গুপ্ত নামে আমাদের একজন সহপাঠী কি সুন্দর বললে। যেমন Delivery তেম্‌নি Arguments তেম্‌নি চমৎকার তার choice of ex-Pressions.

চাকি—রেখে দাও, রেখে দাও। যে সুন্দর ক'রে সবাই ব'লতে পারে।

বীণা—আমার মনে হয় অনেক ভাল ভাল উকিল ব্যারিষ্টারও ও-রকম ব'লতে পারতেন না। অন্ততঃ মুচনরা তো নয়ই—বলিয়াই সে হাসিল।

চাকি—তা যাকগে, চলো আজকে সিনেমা দেখে আসি—First Class Show, "Maric Antoinette."

বীণা—আজ যেতে হ'তে পারবো না। মিঃ গুপ্তকে চা খেতে ব'লেছি, তিনি বলেছেন, হঠাৎ একদিন আসবেন। যদি আজকে এসে ফিরে যান।

চাকি—আ! তুমি যেন কথায় কথায় কোথাকার কে ভদ্রকে টেনে আনছো—চলো, আমি অনেক আশা ক'রে এসেছি' তোমায় নিয়ে আজ সিনেমায় যাব।

বীণা—আর একদিন যাওয়া যাবে মিঃ চাকি। আমায় আজ মাপ করুন, আপনি একাই যেয়ে আসুন।

চাকি—যাচ্ছি বটে, কিন্তু সে দেখায় কি তৃপ্তি হবে? ব'লেই বীণার পাশে একটা চৌকা মারিলেন।

একদিন বৈকালে বুড়ো অম্বিকেশ্বর মিলন হোষ্টেলে হাজির। বুড়োকে দেখিয়া দিলীপ অবাক্ হইয়া বলিল, "বুড়ো যে কবে এলে? কি ক'রে এলে?

বুড়ো—আজ সকালে এসেছি ভাই। চ'লে এলাম। তোমাকে না দেখে আর যেন থাকতে পারছিলাম না। এখানে বাসবাজারে পাটের আড়তে ১২৲ টাকা মাহিনায় একটা চাকরী পেয়েছি। স্নান করবো, আর সন্ধ্যার এসে তোমায় দেখে যাব।

দিলীপ—তা বেশ, এখন একা ফিরে যেতে পারবে তো?

বুড়ো—খুব পারবো। দিদু ভাই কলেজ থেকে এসে কি খায়?

কখন কলেজ থেকে ফিরেছিস্; তোর জল খাওয়া হয়ে গেছে?" এই বলিয়া নিজের চাদরে বাঁধা শালপাতার ঠোঙ্গা, বাহির করিল—"তোমার জন্য এনেছি। তুমি খাও ভাই, আমি দেখি।"

দিলীপ হাসিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু চোখ অশ্রুপূর্ণ। বুড়োর আনা খাবারগুলি সে একটার পর একটা খাইতে লাগিল।

অনিলের পিতা দেবীপ্রসাদবাবু বহরমপুরে খ্যাতনামা উকিল। তিনি মেয়ের জন্য পাত্রের খোঁজ প্রায় একবৎসর হইতে করিতেছিলেন। যে বৎসর অনিল আই, এ পাশ করিল সেই বৎসর তাহার ভগ্নিও ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করিয়াছিল। দেবীপ্রসাদবাবু মেয়েকে কলেজে পড়াইলেন না। তিনি মেয়েদের কলেজের শিক্ষা পছন্দ করিতেন

না। দেবীপ্রসাদবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী সেদিন বহরমপুরের বাড়ীতে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

দেবীপ্রসাদবাবু—তোমরা যাই কেন না বল, মেয়েদের পুরুষদের মত আই,এ, বি,এ পড়ার আবশ্যক করে না। আই,এ, বি,এ শিক্ষা মেয়েদের কোন কাজেই লাগে না। যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের জন্য আলাদা syllabus ঠিক করে দেবে সেই দিনই মেয়েদের শিক্ষার ঠিক সার্থকতা হবে। আমি আমার মেয়েকে কলেজে না পাঠিয়ে যা শিখিয়েছি সে সব অনেক বি,এ পাসও দেখে নি।

অনিলের মা—কিন্তু মেয়ের বিয়েরও কিছুই করতে পারছো না। যে সম্বন্ধ আসছে রংটা ধব্‌ধবে ফর্সা নয় বলে সবাই পিছিয়ে যাচ্ছে। মেয়েকে নিশ্চেষ্ট বসিয়ে রাখাও ভাল নয়। কলেজে পাঠালে তবু একটা কিছু নিয়ে থাকে।

দেবীপ্রসাদবাবু—মূল কথা হয়েছে কি জান? সেই যে সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পর পাত্রটি মারা গেল,তাই সবাই এখন ইতস্তত: করে আমার মেয়েকে ঘরে নিতে।

অনিলের মা—সে কি কথা গো? সেই ছেলের ছিলনা পরমাই।

আমার ভাগ্য ভাল যে বিয়ের পর সর্ব্বনাশ হয় নি। দেবীপ্রসাদবাবু—সে তো বুঝলাম। কিন্তু কুলকিনারা পাচ্ছি না যে।

অনিলের মা—তুমি অত ভেবো না।

দেবীপ্রসাদবাবু—মেয়েকে কিনা শিখিয়েছি, গান, বাজনা, সেলাই পেন্টিং কত কি! এমন কি মোটর চালাতে পর্য্যন্ত আমি নিজে শিখিয়েছি। ভেবেছিলাম ভদ্রত সব দেখে শুনে আই, সি, এস্ পাত্রই জুটে যাবে।

ঝি গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল "মা, রামবাবুর স্ত্রী এসেছেন।" বলতে সে যাচ্ছি বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেদিন বৈকালে দিলিপ বীণাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বেলা তখন অনুমান ছয়টা। ইলেক্‌ট্রিক্‌বেল্ টিপিতেই ভৃত্য আসিল। দিলিপ বলিল "মিস্ ঘোষকে জানাও দিলিপগুপ্ত এসেছে।" সংবাদ পাইয়া বীণা ছুটিয়া আসিয়া দিলিপকে তাহাদের বসিবার ঘরে লইয়া গেল।

দিলিপ—কেমন অবাক করেছি কি না? কথা নেই, বার্ত্তা নেই হঠাৎএর ওপর হাজির।

বীণা কি করিলে যে তৃপ্ত হইবে তাহা যেন খুঁজিয়া পাইতেছিল না। পশ্চিমদিকের জানালার রৌদ্র আসিয়া দিলিপের মুখের উপর পড়িতেছিল। সে বলিল উঠুন তো চেয়ারটা ঘুরিয়ে দি।" দিলিপ নিজেই চেয়ারখানা একটু সরাইয়া বলিল,—"কৈ চা দিন্"

বীণা—চা তৈরার হলো বলে। আমার কিন্তু আপনাকে Economicsটা পড়িয়ে দিতে হবে।

দিলিপ—তা দেখা যাবে।

বীণা—সপ্তাহে একদিন হলেই চলবে। শনিবার দিন কলেজের পর এলে বেশ চলতে পারে।

দিলিপ—আপনার দিক থেকে হতে পারে, আমার দিক থেকে যদি না হয়—বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল।

বীণা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল তা বটে আপনার যেদিন সুবিধে সেদিনই আসবেন।

দিলিপ—আপনার অনুরোধ উপেক্ষা করা কঠিন—আমি শনিবারেই আসতে চেষ্টা করবো।

মি: চাকি "May I come in" বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

বীণা—আসুন মি: চাকি. ইনি আমার friend দিলিপগুপ্ত যাঁর কথা সেদিন আপনাকে বলেছিলাম. মি: গুপ্ত ইনি মি: চাকি—Bar-at-law.

মি: চাকি—So glad to meet you.

দিলিপ—So am I

চাকি—আপনাদের আলাপ আলোচনায় ব্যাঘাত করি নি তো?

দিলিপ—কিছুমাত্র না।

বীণা—তা' কিছুটা ব্যাঘাত হয়েছে বৈকি।

বেয়ারা চা ইত্যাদি ঘরে রাখিয়া চলিয়া গেল। বীণা চা বানাইতে বানাইতে দিলিপের দিকে তাকাইয়া বলিল কতটুকু চিনি দেব?"

দিলিপ—বড়টা আপনার খুসী আমার কিছু fixed quantity নেই।

বীণা হাসিল এবং মিঃ চাকি বলিলেন—আমার সবই তুমি জান—আমার আর কিছুই বলতে হবে না।

বীণা দিলিপের পেয়ালাটি অতি যত্ন সহকারে তাহার সম্মুখে দিয়া বলিল, আপনি হঠাৎএর ওপর আসতে পারেন বলে কেক্ বানিয়ে রেখেছিলাম।"

চাকি—দুই একবার জোড়ে পাইপটা টানিয়া দিলিপের দিকে একটু অবহেলার সহিত তাকাইয়া বলিলেন "ওঃ ভুলেই গিয়েছিলাম আমার চা খাওয়া হবে না—আমার একটা Party আছে আমি যাই—।" দিলিপ একটু অবাক হইল, কিন্তু বীণা আশ্চর্য্য হইল না।

চা খাওয়া শেষ হইলেই দিলিপ বলিল অর্গান দেখতে পাচ্ছি, আপনি নিশ্চয় গাইতে পারেন? একটা গান শোনান, আমি তারপরই উঠবো। বীণা যাইয়া অর্গানে গান ধরিল, আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি।"

গান শেষ হইতেই দিলীপ হাসিয়া বলিল, "আমি তো পথ ভোলা পথিক নই?' আচ্ছা তা'হলে আসি নমস্কার।

পূজার ছুটী আসিল। হোষ্টেলে ছেলেরা সকলেই বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। কেবল মাত্র দিলিপের কোনও ব্যস্ততা নাই। অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ী যাবে না? কোন বাঁধা ছাঁদা দেখতে পাচ্ছি না।" দিলীপ কোন উত্তর করিল না। তাহার মনে হইল পৃথিবীর সব মাতৃহীনেরই কি এই অবস্থা। অনিল দুই একবার অনুরোধ করিতেই সে বহরমপুরে তাহাদের বাড়ীতে পূজার ছুটীতে যাইতে সম্মত হইল। ষষ্ঠীর দিন উভয় বন্ধু বহরমপুর রওনা হইয়া গেল।

পরের দিন প্রাতে সৈবাল ছুটিতে ছুটিতে একটা বাক্স হাতে লইয়া তাহার দিদির ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দিদি, দাদার সঙ্গে তার এক বন্ধু এসেছেন। সেই মিনুদা আমায় দেখে বললেন কেমন আছ সৈবাল? আমার জন্য কত কি এনেছেন এই দেখ না।

উমা—সবই তোর জন্য এনেছেন, আমার জন্য কিছু আনেন নি?

সৈবাল—দাঁড়াও জিজ্ঞেস করে আসি।

উমা—তোকে আর জিজ্ঞেস করতে হবে না, তুই এখন খেলা করগে।

পূজার ছুটী ফুরাইয়া আসিল। কলিকাতা রওনা হইবার দিন দ্বিপ্রহরে উমা দিলিপের ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, এই ব্যাগটা তোমার জন্য বানিয়েছি। মিনুদা, Motor accident এর গল্প কাউকে বলো নি তো?"

দিলিপ—যদি না নেই।

উমা—না নিয়ে তুমি পারবে কি?

দিলিপ হাসিয়া ফেলিল "আচ্ছা তাহলে দাও, আমি খুব যত্ন করে রেখে দেব।"

উমা—ওটা রাখবার জিনিষ নয়, ব্যবহার করার জিনিষ। ছিঁড়ে গেলে আমায় জানিও, আমি আবার তৈরী করে পাঠাব।

দিলিপ কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল একদৃষ্টিতে উমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ যেন বলিতেছিল,"ওগো বরদা—এ দানের উপযুক্ত যেন হতে পারি।" ব্যাগটা আমার পকেটে রাখিয়া আস্তে ঘর হইতে বাহির হইতেছিল। উমা বলিল, দাঁড়াও, একবার পায়ের ধুলো নি।" নত হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেই দিলিপ তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিল।

কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া দিলিপের সেই একঘেঁয়ে জীবন ভাল লাগিতেছিল না। একদিন বৈকালে বুড়ো আসিয়া হাজির। সঙ্গে এক জোড়া নূতন কাপড়।

"এই নে ভাই, তোর জন্য কাপড় এনেছি।"

দিলিপ হাসিয়া গ্রহণ করিল।

বুড়ো—আমি আড়তে কাজ করবো না।

দিলিপ তুমি কি আর ওসব কাজ করতে পার। আমি তোমার জন্য বহরমপুরে একটা কাজ ঠিক করে দেব। তুমি কাল পরশু বহরমপুরে চলে যাও। ওখানে সেনেদের বাড়ীতে ছোট ছেলে মেয়েদের দেখবে শুনবে। গল্প গান সেখানে করতে পারবে।

বুড়ো—তা বেশ। কিন্তু ভাই তোমায় যে আর রোজ দেখতে পাব না।

দিলিপ—আমি সেখানে নূতন যা পেয়েছি। বুড়ো ছুটীতে সেখানেই যাব।

বুড়ো—তাহলে কাল পরশুই যাব। ব্যাটাদের আজকেই বলবো যে তাদের কাজে ইস্তফা।

সহরতলীর বাড়ীতে দেবীপ্রসাদবাবু ও তাঁহার স্ত্রীতে কথোপকথন হইতেছিল।

অনিলের মা—মেয়ের তো সম্বন্ধের কিছুই হচ্ছে না।

দেবীপ্রসাদবাবু—তাই তো, কি যে করি তাই ভাবছি।

অনিলের মা হ্যাঁ গা, দিলিপের সঙ্গে সম্বন্ধ করলে কেমন হয়? তুমি বিলেত পাঠিয়ে ওকে একটা কিছু পড়িয়ে আনতে পার।

দেবীপ্রসাদবাবু—তা' পারি বটে, তবে কি জান, ওর ঘরে সংসা, উমার আমার শান্তি হবে না।

অনিলের মা—শান্তি ভগবান যার অদৃষ্টে যেটুকু লিখেছেন তাই হবে। তোমার, আমার হাত নেই।

দেবীপ্রসাদ বাবু—ছেলেটী ভাল বটে। কিন্তু একরকম ঘর জামাই করেই রাখতে হবে। সেটাও আমার বিশেষ পছন্দ হয় না। আচ্ছা ভেবে দেখি।

বীণার জন্মদিন। সে আজ উত্তম সাজে সজ্জিত হইয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ অনেকেই আসিয়াছেন এবং সব চেয়ে আসর জমিয়ে বসেছেন মিঃ চাকি। তিনি বলিলেন "আর বিলম্ব কেন, এবার চা এলেই হয়। বীণা, তুমি একটা গান গাইলে না।"

বীণা—মিঃ গুপ্ত'র জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি কলেজে বলেছিলেন আসবেন।

চাকি—তুমিও যেমন, কোথাকার একটা rustic, সময়ের মূল্য বুঝে না, কোন respectable social functionএ'এ পর্য্যন্ত গিয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা ক'রো।

বীণা—Rustic তিনি নন। কোনও একটা কারণ হয়েছে নিশ্চয়ই।

চাকি—তা হোক, তুমি একটা গান গাও। এতগুলি লোক বসে আছে। বীণা ধীরে ধীরে অর্গান বাজাইয়া একটা গান ধরিল। দুই লাইন গাহিতেই দিলিপ ঘরে ঢুকিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "আমায় আপনারা মাপ করবেন। আমি হয়ত আপনাদের বসিয়ে রেখেছি।"

বীণা—হঠাৎ গান বন্ধ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "না-না, এই তো মোটে পাঁচটা থেকে তিন মিনিট হয়েছে। কি আর দেরী।

চাকি—বিলম্ব আর কি? আমরা সবাই বসে আছি এই যা।

দিলিপ—সত্যি আমায় ক্ষমা করবেন। হোষ্টেলের managing committeeর meeting ছিল। সাহেব আর কিছুতেই ওঠেন না, পরে আমি চলে এলাম।

চাকি—Most splendid!

চা আসিল, সবাই চা-পানে ব্যস্ত। বীণা দিলিপের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "এই কেকটা পছন্দ করেছিলেন বলে আমার বানিয়েছি, সবটা খেতে হবে কিন্তু।"

মিঃ চাকি কটমট করিয়া তাকাইলেন।

সবাই বীণাকে নানা বস্তু উপহার দিলেন। মিঃ চাকি একটা হীরার আংটি দিলেন। তিনি নিজেই পরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু বীণা পরে পরিব বলিয়া রাখিয়া দিল। দিলিপ পকেট হইতে একটা বেলফুলের ব্রেসলেট বাহির করিল। বীণা বলিল বা! বেশ সুন্দর তো! দিন আমার হাতে পরিয়ে দিন। দিলিপ পরাইয়া দিল। মিঃ চাকি কটমট করিয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার চোখের হিংস্র দৃষ্টি বীণার চোখে এড়াইল না।

একে একে সবাই চলিয়া গেল। কিন্তু মিঃ চাকি রহিয়া গেলেন। বীণার মা বলিলেন, "তোমরা গল্প কর আমি যাই, গল্পগুজবের কাবুলিওয়ালা গল্পটা শেষ করে ফেলি।"

চাকি সাহেব বলিলেন, বীণা, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার? কোথাকার একটা গাড়োল ছেলে, তার দু' পয়সা দামের ফুলটা কিনা সে তোমায় নিজে পরিয়ে দিল, আর আমার দু'শ টাকা দামের হীরার আংটি কিনা তুমি আঙ্গুলে পরলেই না।

বীণা—ফুল যে শুকিয়ে যাবে। হীরের আংটি তো শুকাবে না।

চাকি—I don't like that you should mix so freely with that fellow who is so shabbily dressed.

বীণা—Excuse me Mr. Chaki, you have no business to give me lessons about my conduct. You should mind your own affairs.

চাকি—I am really sorry if I have offended you. It was far from any intention. বীণা, তুমি

তো বুঝবে না, তোমার জন্য আমি কি না করতে পারি।

Believe me, when I tell you that you are the only thought of my walking hours—nay even of my dreams. বলিয়াই বীণার হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিতে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় বেয়ারা ঘরের বাহির হইতে বলিল, "দিদিমণি, খাবার তৈয়ার।"

মিঃ চাকি—Good night, Good night বীণা।

বীণা—Good night মিঃ চাকি বলিয়া বীণা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(বহরমপুরে সেনেদের বাড়ী)

দেবীপ্রসাদ বাবু—দিলিপের বাবা এক কথাতেই রাজী হয়েছেন, তবুও আমার মন উঠ্‌ছে না। যাক এখন এই বিয়ের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে—এই মাসেই কাজ হবে।

অনিলের মা—কি ক'রবে ব'লো? আর এখন তো কথাই দিয়েছো।

দেবীপ্রসাদ বাবু—তাই তো! রমেশ বাবু কিন্তু চিঠির উত্তর দিলেন না।

ভৃত্য ঘরে ঢুকিয়া একখানা চিঠি দেবী বাবুর হাতে দিয়া চলিয়া গেল। চিঠিখানা পড়িয়া দেবীবাবু মুখ গম্ভীর করিয়া কেবল বলিলেন, "না না দিলিপের সঙ্গে ঊষার কিছুতেই সম্বন্ধ হতে পারে না। আমি আজই কলকাতায় যাচ্ছি।

বীণার বাড়ী

দিলিপ—consumers surplus বুঝতেই আপনার একটা দিন কেটে গেল। আমি তাই বলি মেয়েদের Economics পড়তে যাওয়া ভুল।

মিঃ চাকি ঘরে ঢুকিয়া—এই যে good morning মিঃ গুপ্ত। ছাত্রীকে পড়ান হচ্ছে তা বেশ বেশ। দেখুন, বীণা literature দুটোই বেশ বোঝে। Economicsএ weak,

দিলিপ—weak তেমন কিছু নয়। আমার মনে হয় ইকনমিক্সে মনোযোগ দেন না। আমি আমার মনে বলে যাই, বক্ত দৃষ্টান্ত দি উনি যেন কিছুতেই বুঝতে চান না।

চাকি—(পাইপটা জোরে জোরে টানিয়া) তা বইকি পড়া বুঝতে হলে উনি যা বলেন সব শুনতে হবে। ওর কত সময় নষ্ট করে তোমায় পড়াতে আসেন সেটা তোমার বোঝা উচিত।

দিলিপ—সময় নষ্ট নয়। এতে আমারও যথেষ্ট উপকার হয়।

চাকি—Certainly, that's more or less revision of your lessons. It is very nice of you that you take so much trouble for Bina আজকে তো পড়া হয়ে গেছে ভেবেছিলাম তিনজনে মিলে একটা সিনেমায় যাব।

দিলিপ—আজকে আর হয় না। আর একদিন যেদিন বীণার সুবিধা হবে আমায় জানাবেন আমি যাব।

চাকি—That's all right. I shall fix up the date

বীণা—বেশ তো।

তিন দিন পর কলিকাতা হইতে ফিরিয়া দেবীবাবু গিন্নীকে জানাইলেন রমেশবাবুর ছেলে নরেনের সহিত ঊষার সম্বন্ধ একেবারে স্থির করিয়া আসিয়াছেন। যে তারিখে দিলিপের সহিত বিবাহের কথা চলিতেছিল সেই তারিখে বিবাহ হইবে। নরেন কৃষ্ণনগর কলেজে Philosophyর প্রফেসার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা ছেলে দুইশত টাকা বেতন পায়। দেবীবাবু ভাল লোকের কাছ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, দিলিপের মা খাইসিসে মারা গিয়াছিলেন। দিলিপের পিতাকে অতি সংক্ষেপে জানাইয়া দিলেন, সম্বন্ধ হইবে না।

মিঃ চাকি, অয়স্কোর্ডমিসন হোটেলে দিলিপের নিকট হাজির হইলেন।

মিঃ চাকি—চলুন না মিঃ গুপ্ত, কাল রবিবার ৩টার শোতে সিনেমায় যাই। সন্ধ্যার শোতে গেলে আপনার হোটেলে ফিরতে ৯৷৩০ দেরী হয়ে যাবে। বীণা যখন কাল যেতে পারবে না। তখন আমরা ম্যাটিনি শোতেই যাই।

দিলিপ—বেশ তাই যান। কোথায়? রূপবাণীতে?

মিঃ চাকি—yes, then It is fixed.

অরফেউস বিপন্ হোটেল হইতে মিঃ চাকি গেলেন শিবনারায়ণ দাস লেনে, বীণাদের বাড়ী। ইলেকট্রিক্ বেল টিপিতেই ভৃত্য আসিল। তিনি বসিবার ঘরে গিয়া দেখেন, বীণা ফুলদানগুলি পরিষ্কার করিতেছে।

মিঃ চাকি—Are you meant for this dirty lob why are the servants for ?

বীণা,—আজকের সন্ধ্যার শোতে সিনেমায় যাব ঠিক করলাম। মিঃ গুপ্ত direct চলে যাবে। আমি তোমাকে এসে নিয়ে যাব।

বীণা—বেশ তাই হবে। মিঃ গুপ্তকে আমরা তুলে নিয়ে যেতে পারতাম।

চাকি—তুমি পাঁচটা নাগাদ তৈরী থেকো।

বীণা—all right, thank you

• • •

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রফেসার নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর সহিত উষার বিবাহ হইয়া গেল।

দিলিপ পাগলের মত কয়েকটা দিন কাটাইয়াছে। অনিলের বহরমপুর যাওয়ার পূর্বদিন দিলীপ কাটোয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং পরের দিন সন্ধ্যার সময় কলিকাতা ফিরিল। সে নিজেকে সামলাইয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিল। মনকে বুঝাইল, দেবীপ্রসাদবাবুর অর্থ আছে, মান প্রতিপত্তি আছে, উষাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার নিকট বাতুলের স্বপ্ন ছিল। সে নিজেই জীবনে সব সহ্য করিবে। উষা সুখী হউক।

ফুলশয্যার দিন সন্ধ্যার পূর্বে দিলীপ যাইয়া নরেন্দ্র বাবুদের কলকাতার বাসাতে নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিল। উষার জন্য একছড়া বেলিফুলের মালা নরেনবাবুর হাতে দিয়া আসিল। উষার সহিত সেদিন তাহার দেখা হয় নাই।

দিলীপ ও মিঃ চাকি সিনেমা দেখিতে ব্যস্ত ছিলেন। Interval এর সময় মিঃ চাকি বলিলেন—"চলুন মিঃ গুপ্ত, আমার এক friend এর ওখান থেকে চা খেয়ে আসি।"

দিলিপ—চায়ের সময় এখনও ঠিক হয় নি। আচ্ছা, চলুন।

মিঃ চাকি দিলীপকে লইয়া রূপবাণীর বিপরীত দিকের রাস্তায় ঢুকিয়া একটা দোতলা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "just a minute, I am coming তিনি চলিয়া গেলেন এবং দুই, এক মিনিটের মধ্যেই আসিয়া দিলীপকে লইয়া গেলেন। সম্মুখের ঘরে দিলীপকে বসিতে বলিলেন। দিলীপ ঘরে প্রবেশ করিতেই একটি ২৪।২৬ বৎসরের স্ত্রীলোক সেই ঘরে প্রবেশ করিল "তাই তো আপনি এসেছেন বসুন।" কথাটা শেষ হইতে না হইতেই মিঃ চাকি বাহির হইতে দরজায় শিকল দিয়া বলিলেন "মিঃ গুপ্ত, আপনি চা খান, আমি এখন চললাম।"

দিলিপ যেন বাঘের মত লাফাইয়া উঠিল এবং পা দিয়া প্রাণপণে দরজা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি হাসিয়া দিলীপের গায়ে চলিয়া পড়িয়া বলিল "দরজা যে খুব মজবুত, অত সহজে ভাঙবে না। বসুন না, এতে দোষ কি, আপনি মদ খান তো? এই নিন্ শক্তি বাড়বে, তার পর দরজা ভাঙা সহজ হবে।" এই বলিয়া গ্লাসে মদ ঢালিয়া দিলীপের সম্মুখে ধরিতেই দিলীপ গ্লাসটা হাতের ধাক্কায় ফেলিয়া দিল। কিন্তু মদের খানিকটা অংশ তাহার জামা কাপড়ে পড়িয়া গেল। সে রাগের চোটে ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিল, চোখ দুইটা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। স্ত্রীলোকটি অবাক্ হইয়া দেখিতেছিল। সে যে ইহাতে অভ্যস্ত নয়। প্রায় আধঘণ্টাখানেক বাদে বীণাকে লইয়া মিঃ চাকি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মিঃ চাকি দরজা খুলিয়া দিতেই, দিলীপ রাগে গর্জিয়া মিঃ চাকির গলাটা শক্ত করিয়া ধরিল। তাহার পরিধেয় হইতে মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল।

বীণা বলিল,—আপনি যে একজন অপদার্থ তা জানতাম না। না জেনে কত freely আপনার সঙ্গে মেলামেশা করেছি। মিঃ চাকিকে ছেড়ে দিন।

দিলিপ আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াইল না।

অরফেউস বিপন হোটেল।

অনিল - এর আগে তো আমায় একদিনও বলিস নি যে, তুই ক'লকাতা ছেড়ে যাচ্ছিস্?

দিলিপ—এখানে খরচ চলা কঠিন বোধ হ'চ্ছে, তাই বাবা হয়ে যাচ্ছি। তোর সঙ্গে তো দেখাই হ'বে। উষার ওখানে মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই যাবি?

[আগামী বারে সমাপ্য]

নব্য বঙ্গে সচ্চিদানন্দ

দেখিতে দেখিতে মহাকালের তিনটি বৎসর অতীত হইয়া গেল। ১৩৫১ সালের ৭ই ফাল্গুন পুণ্যাত্মা সচ্চিদানন্দ এই ধূলিধূসরিত মাটির পৃথিবীতে তাঁহার নশ্বরদেহ রক্ষা করিয়া ঊর্দ্ধলোকবাসী হন। বাংলার কী ঘটনাসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তাহা ইতিহাসবেত্তাদের অজানা নাই। ১৩৫০-এর অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৫৩-র ফাল্গুন—বাংলার এ ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুর্ভিক্ষের মৃত্যুমিছিল, রাজকীয় অত্যাচার, সাম্প্রদায়িক পৈশাচিকতা, স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ এবং অবশেষে মহাত্মাজীর মৃত্যু। জাতির জীবনে এই দুঃখের ইতিহাস ভুলিবার নয়। এই ঐতিহাসিক বর্ষ-সূচনার মধ্যেই বহু পুণ্যাত্মার মতো আমরা হারাইয়াছি পুণ্যপ্রাণ সচ্চিদানন্দকেও।

ভাবময় ও কর্ম্মময় জীবনের মূর্ত্ত সাধক

এ দুর্ভাগা জাতির দুঃখজয়ের স্বপ্ন বিশেষভাবে যাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সচ্চিদানন্দ ছিলেন তাঁহাদেরই একজন। জাতির দুঃখ তিনি নিজের মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন, অনাহারের জ্বালা তিনি নিজের জীবন দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, পরাধীনতার অভিশাপে তাঁহাকে আমরা জর্জ্জরিত হইতে দেখিয়াছি! যুদ্ধ যখন সমস্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, যখন সেই যুদ্ধে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকেও বিজড়িত করিয়া সুচতুর এ্যাংলো-আমেরিকান শক্তি সাম্রাজ্যবাদী জাল বিস্তার করিয়া একহাতে সংহার ও আর একহাতে শান্তি-প্রতিষ্ঠানের নক্সা রচনায় উদ্যোগি, সেই সময় ক্রীপস্ আসিলেন ভারতে স্বাধীনতা চুক্তি লইয়া। কিন্তু এ্যাংলো-আমেরিকানের যে শান্তিপ্রয়াস, তাহা ছিল চোরা-বালীর উপরে বিশাল বটবৃক্ষরোপণের প্রহসনেরই নামান্তর মাত্র। ভারতীয় ঋষিদের শান্তিমন্ত্র তাঁহাদের কর্ণ-কুহরে যাইয়া প্রবেশ করে নাই। এই সময় "বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসান ও শান্তি সংস্থাপনের উপায়" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া সচ্চিদানন্দ স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের কাছে পাঠান। কিন্তু সুচতুর ইংরেজ বেপিয়াদের টিকিটি পর্য্যন্তও তাহাতে নড়ে নাই।

প্রতিদিন আমরা তাঁহার ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছি আর বিশ্ব-আগন্তিক সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পাইয়াছি তাঁহার বাণীতে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যে তিনি চিরকাল বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার বাণীমূর্ত্তি ছিল ঋষি ব্যাসদেব। ঋষিকল্পিত ভারতসভ্যতার ভিত্তিতেই তিনি নব্য ভারতকে কল্পনা করিতেন, ধ্যান করিতেন অন্তরে অন্তরে। ভারতীয় শিল্পের উন্নতি, ভারতীয় ভেষজের নবপ্রতিষ্ঠা, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনরুদ্ধার, মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান—এই ছিল মূলতঃ সচ্চিদানন্দের সারা জীবনের সাধনা এবং সেই সাধনায় অনেকাংশেই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। অপূরণীয়তার জন্য যে অপরিসীম জীবনের প্রয়োজন ছিল, তাহার পূর্ব্বেই তিনি অমৃতলোকে যাত্রা করেন। ইহার পিছনে ভগবানের কি বৃহত্তর ইঙ্গিত

পুরুষায়িত ছিল, তাহা দৈবেরই হাতে বিধৃত, কিন্তু এই মর-পৃথিবীর আমরা তাঁহাকে হারাইবার বেদনায় শীতের বনানীতে বিতত কিশলয়ের মতই বিরস চিত্তে আত্ম-নির্জ্জিত হইয়া রহিলাম। তাঁহার সমস্ত জীবনের সাধনা তিনি আত্ম-পৃথিবী হইতে বিস্তার করিয়া দিয়া গিয়াছেন দেশের জন-পৃথিবীর মধ্যে। তাহাকে রক্ষা করা, তাহাকে সাধন করা এবং তাহাকে অনুসরণ করাই আজ আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য।

দুই শ্রেণীর কর্ম্মীকে আমরা লক্ষ্য করি: চিন্তাকর্ম্মী ও ক্রীড়া-কর্ম্মী (Philosopher in thought and Soldier in action) এই দুইয়ের একত্র সমন্বয়ে সচ্চিদানন্দের জীবন ছিল পূর্ণ। সচরাচর মানুষের মধ্যে এই দুইটি বিরুদ্ধভাবের সমন্বয় সাধন দৃষ্ট হয় না। তাঁহার প্রত্যক্ষ কার্য্যসৃষ্টি এবং চিন্তাসৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিলেই সেই প্রসাদ-গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে বার্ষিকুক্রমিক সংখ্যায় দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে আমরা তাঁহার সেই (ক) কার্য্যসৃষ্টি ও (খ) চিন্তাসৃষ্টির বিপুলসম্ভার পুনরায় নূতন করিয়া উপস্থিত করিলাম। যথা:

(ক) ১৯১৮-২২ সাল—ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স কোং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, এস্‌কা মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ ও ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠা। এবং বুল লিমিটেড নামীয় একটি ইট তৈয়ারী কাপের ম্যানেজিং এজেন্সী গ্রহণ। ২২ সালের ১১ই নবেম্বর কমার্শিয়াল কার্বিং কোম্পানী (পাটু, দৌড়াটি, সিল্ক মোটর সার্ভিস) স্থাপন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সহিত সচ্চিদানন্দের মনিকাঞ্চনযোগেরও এই সময় প্রথম সূচনা।

১৯২৭ সাল—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ের সহযোগে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেডের পুনরুদ্ধার ও দি বেঙ্গল টেক্সটাইল এজেন্সী লিমিটেড্ স্থাপন।

১৯২৮ সাল—বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রশালা প্রতিষ্ঠা (বর্ত্তমানে ইহা ক্যালকাটা ক্লথ্‌স সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত)।

১৯৩০ সাল—বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্ স্থাপন এবং দি ন্যাশনাল-পলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা।

১৯৩১ সাল—দি ক্যালকাটা ক্লথ্‌স সোসাইটি লিমিটেড্ এবং দি ন্যাশনালিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড স্থাপন।

১৯৩৪ সাল—দি ইণ্ডিয়ান্‌টেক্স মোটর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী লিমিটেড্ প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৭ সাল—কমার্শিয়াল কার্বিং কোম্পানী (ই, বি, রেলওয়ের বিশালকর হেপনের ইউ, ডেলিভারী ও চিৎপুর সার্ভিস্ আরম্ভ)। বঙ্গলক্ষ্মী আয়ুর্বেদ ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠা।

১৯৪০-৪১ সাল—ইউনাইটেড্ মোটর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী লিমিটেড্ (সিল্ক ষ্টেট মোটর সার্ভিস) কোম্পানী স্থাপন।

১৯৪২ সাল—বঙ্গলক্ষ্মী কেমিক্যেল ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠা।

১৯৪২-৪৩ সাল—ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের পুনরুজ্জীবন ও পুনঃসংগঠন।

১৯৪৪ সাল—বঙ্গলক্ষ্মী অয়েল মিল প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী (৭ই ফাল্গুন, ১৩৫১) এই পুণ্যপ্রাণ কর্ম্মযোগীর জীবনাবসান ঘটে।

(খ) পাশাপাশি লক্ষ্য করি আমরা সচ্চিদানন্দের চিন্তা সৃষ্টিকে। বঙ্গশ্রী পূর্ণরে অবস্থানের বাণী লইয়া তাঁহার প্রত্যেকটি রচনা আরম্ভ হইয়া আছে:

১৩৩৯, মাঘ—'নিবেদন'। ১৩৪১, কার্ত্তিক—'মানুষের জীবন ও জীবন যাত্রা।' ঐ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৪২, ভাদ্র—'ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহা পূরণের উপায় (জনৈক অর্থনীতির ছাত্র নামে লিখিত)।

১৩৪২, চৈত্র—১৩৪৩, ফাল্গুন—'বঙ্গ-সমস্যা ভারতীয় কৃষিসমস্যার কথা'। ১৩৪৩, চৈত্র—১৩৪৪, ভাদ্র—'বঙ্গ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা ও কলিকাতার বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন।' ১৩৪৩, ফাল্গুন—'আধুনিক রাজনীতির প্রকৃতি।'

১৩৪৪, আশ্বিন—'পঙ্গুতা সংসার' (আলোচনা)। ১৩৪৪, শ্রাবণ—'আমরা কোন্ দিকে? আমাদের রক্ষার উপায় কি?'

১৩৪৫, ভাদ্র—'শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি ভাবিবার কথা।'

১৩৪৮-৪৯—'গীতা বিচার'—শেষ ষোল বিচার। ১৩৪৮, আষাঢ়—'আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা ও তাহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায়।' ১৩৪৮—'ভারতীয় বেদ, উপনিষদ ও দর্শন।'

ঐ ফাল্গুন—'বর্ত্তমান যুদ্ধের শিক্ষা'। ১৩৪৯, বৈশাখ—'যুদ্ধের পরিস্থিতি।' ঐ আষাঢ়—'যুদ্ধ সম্বন্ধে রাশিয়ার তত্ত্ব।'

ঐ শ্রাবণ—'পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা ও ভারতবাসীর দায়িত্ব।'

ঐ কার্ত্তিক—'পঙ্গুতার উদ্বেগ।' 'মানুষের দুঃখ দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষির কয়েকটি মোটা কথা।'

ঐ বোধ—'বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের বিক্ষিপ্ত সম্প্রদায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য।' ১৩৪৯, মাঘ—১৩৫০, বৈশাখ—চারিটি পত্র।'

১৩৫০, জ্যৈষ্ঠ—'যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা ও যুদ্ধ মিটাইবার আবশ্যকীয় উপকরণ।' ১৩৫০-৫১—শ্রীদুর্গা পূজার প্রয়োজনীয়তা।' ১৩৫১, ভাদ্র—'মানব-সমাজের বর্তমান সমস্যার পূরণে মানুষের পশুত্বের বিষাদ নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিবার প্রয়োজনীয়তা।'

১৩৫১—বর্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্যার নাম এবং ইহা সমাধানের সঙ্কেতের নাম।' বর্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্যা-সমূহের সমাধান করিবার পরিকল্পনা ও কার্য সঙ্কেত।' 'মানুষের ব্যক্তিগত অভাব ও অভিযোগ কারণ।' মৃত্যুকালে তাঁহার অসমাপ্ত রচনা ছিল 'মনুষ্য প্রকৃতি ও মনুষ্য স্বভাবের বিকাশক্রম।'

সচ্চিদানন্দ তাঁহার পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাদি ও চিন্তাপ্রসূত দার্শনিক তাৎপর্যতার ঐকাসাধন করিয়া সাধারণের মধ্যে যে মিলনসেতু গড়িয়া গিয়াছেন, আজও তাহা অব্যাহত মাধুর্যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যেখানেই পশুত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন, সেখানেই তাহার বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। শ্রমিক-মালিক বিরোধে আজ দেশে যে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, আজ হইতে দীর্ঘ বৎসর পূর্বেই তাহা সচ্চিদানন্দের চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল—যাহাকে পশুত্বের নিদর্শন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। নিম্নের আংশিক উদ্ধৃতিটি তাহার কিছু পরিচয় দিবে :

'আধুনিক মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর ধর্মের কার্যে একপ্রাণতার স্থলে সাম্প্রদায়িকতার, অর্থনৈতিক কার্যে প্রত্যেকের ঐশ্বর্য সাধন করিবার প্রযত্নের পরিবর্তে নিজ নিজ ধনপ্রাধান্য স্থাপন করিবার প্রযত্ন, রাষ্ট্র পরিচালনার কার্যে সমপ্রাণতার ও একতার কার্যের স্থলে উচ্চ-নীচ ভাবের ও দলাদলির কার্য, উপভোগ প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন করিবার কার্যে আবশ্যিক ও শক্তি প্রবৃত্তি বজায় রাখিবার প্রবৃত্তির স্থলে ইন্দ্রিয়োচিত রুচি ও ইচ্ছা পূরণ করিবার প্রবৃত্তি এবং শিক্ষাদান করিবার কার্যে মনুষ্যজাতির একজাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার প্রবৃত্তির পরিবর্তে স্থানগত জাতীয়তাবোধ, সাম্প্রদায়িকতাবোধ, ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যবোধ জাগ্রত করিবার প্রবৃত্তি—আমাদিগের বিচারানুসারে মনুষ্য স্বভাবের প্রাধান্যের অথবা পশুত্বের সাক্ষ্য।

'আধুনিক ধনীকতা ও শ্রমিকতা আন্দোলনে ধনীকগণের যে শ্রমিকগণের অভাবহীন জীবন-যাপনের দিক উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার প্রবৃত্তির আধিক্য এবং শ্রমিকগণের যে ধনীকগণের অবস্থার দিকে উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ সুখ বিধান করিবার প্রবৃত্তির আধিক্য দেখা যায়, তাহা ধনীক ও শ্রমিক এই উভয়েরই মনুষ্য স্বভাবের প্রাধান্যের অথবা পশুত্বের নিদর্শন।'

এই প্রসঙ্গে সচ্চিদানন্দের বিভিন্নকালীন রচনা হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতিও এখানে উল্লেখযোগ্য। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলি হইতেও তাঁহার চিন্তাশীল বিপ্লবী ও দেব-চরিত্রের বহুমুখী পরিচয় জনসাধারণের নিকট সুস্পষ্ট হইবে :

প্রত্যেক দেশের গভর্নমেণ্ট, নেতৃবর্গ এবং তাঁহাদের প্রজাবৃন্দ যাহাতে নিজদিগকে সমগ্র মানব-সমাজের এক একটি অংশ বলিয়া গণ্য করিতে পারেন এবং পরস্পরের মধ্যে যাহাতে ভ্রাতৃভাব পোষণ করিতে পারেন—তাহার জন্য তাঁহাদিগের প্রত্যেকের মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

•

আমাদিগের মতে মানুষের পক্ষে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসা স্বাভাবিক ; পরস্পরের মধ্যে পারস্পরিক হিতসাধনের প্রবৃত্তিও স্বাভাবিক। আর পরস্পর পরস্পরকে অপকোচে হত্যা করিবার প্রবৃত্তি তাহার পাশবিকতা। যখন পাশবিক প্রবৃত্তির এতদূর প্রাবল্য দেখা যাইতেছে, তখন মানুষ যে পতিত হইয়াছে—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

•

পয়সা না থাকিলে মানুষের কোন রকমের দুঃখ দূর হয় না এবং মানুষের পক্ষে সর্বতোভাবে সুখী হওয়া সম্ভব হয় না। পয়সা না থাকিলে মানুষের কোন রকমের দুঃখ দূর করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু পয়সা থাকিলেই যে মানুষের দুঃখদূর হয়, তাহা নহে। পয়সা না থাকিলে

মানুষের দুঃখ যতখানি তীব্র হয়, পয়সা থাকিলেও মানুষের দুঃখ তাহার চতুর্গুণ তীব্র হইতে পারে এবং আজকাল-কার দিনে সাধারণতঃ তাহাই হইয়া থাকে। আজকাল-কার দিনে সারা ভূমণ্ডল পয়সার অভাবগ্রস্ত মানুষে বোঝাই। পয়সা থাকিলেও যে কত রকমের দুঃখে ও দানবতায় মানুষের বুক বোঝাই থাকে, তাহা ঐ পয়সার অভাবগ্রস্ত মানুষের সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব হয় না। পয়সা-ওয়ালা মানুষ প্রায়ই অহঙ্কারে মত্ত ও আত্মপ্রতারক। পয়সার অভাবগ্রস্ত মানুষের বুদ্ধিতে নিজের দুঃখ ও পরের দুঃখ বুঝিবার যে বিচারশক্তি থাকে, সেই বিচারশক্তি পয়সাওয়ালা মানুষের আজকালকার দিনে থাকিতে পারে না এবং থাকে না। যাহার যত পয়সা বেশী, তাহার তত নিজের দুঃখ বুঝিবার ক্ষমতা কম এবং অপেক্ষাকৃত দুরবস্থাগ্রস্ত মানুষের দুঃখ অনুভব করিবারও ক্ষমতা কম। তাই বলিয়া পয়সাওয়ালা মানুষের বুদ্ধি নাই, এমন কথা বলা চলে না। তাহাদের বুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু ঐ বুদ্ধি পরের বেদনা বুঝিবার উপযোগি নহে। ঐ বুদ্ধি প্রধানতঃ পরকে এবং নিজেকে প্রতারণা করিয়া দুঃখ বৃদ্ধি করিবার ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিবার কার্য্যে এবং নিজে যে একজন কোন-না-কোন রকমের মহাপুরুষ, তাহা রকম-বেরকম ভাবে প্রচার করিবার কার্য্যে প্রকাশিত হয়।

•

বর্ত্তমান জগৎব্যাপী বিপ্লবের সমাধান করিতে হইলে প্রথমতঃ মানুষের জন্মিলেই মরিতে হয় কেন, দ্বিতীয়তঃ মানুষ জন্মিলেই সুখ-দুঃখ মিশ্রিত জীবনযাপন করে কেন, তৃতীয়তঃ মানুষের জীবন অবিমিশ্রভাবে সুখের হয় না কেন, চতুর্থতঃ মানুষের জীবন অবিমিশ্রভাবে সুখের করিয়া তুলিবার পদ্ধতি কি—এই চারিটি বিষয়ের তথ্য জানিতে হইবে। • • যে যে ব্যবস্থাসূত্রে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন সাধন করিলে ও পরিচালনা চালাইলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক নরনারীর সর্ব্ব রকমের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করা সুনিশ্চিত হয়—সেই ব্যবস্থাসূত্র সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ না করিয়া যতই সুচিন্তিতভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং পরিচালনা কার্য্য সাধন করা যাউক না কেন, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক নরনারীর দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর হওয়া কিছুতেই সুনিশ্চিত হইতে পারে না। বরং প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক নরনারীর নূতন নূতন রকমের দুঃখের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

•

ইচ্ছার উৎপত্তি না হইলে মানুষের ইচ্ছা পূরণের জন্য পদার্থ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন ভাল-মন্দ বিচার কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না ও হয় না। কাহারও আদেশ পালনের কার্য্যেও প্রথমতঃ ইচ্ছার উৎপত্তি হইয়া থাকে। নতুবা আদেশ পালন করিবার কার্য্য করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের শক্তি, মানুষের প্রবৃত্তি, মানুষের কাম, মানুষের ইচ্ছা ও মানুষের কার্য্য কাহাকে বলে, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যায় যে, মানুষের দ্বেষ-প্রবৃত্তি তাহার স্বভাবগত এবং উহা অন্যান্য প্রবৃত্তির তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল।

মানুষের দ্বেষ-প্রবৃত্তি যে তাহার স্বভাবগত এবং উহা যে অন্যান্য প্রবৃত্তির তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল, তাহা যুক্তিযুক্ত হইলে মানুষের পশুত্ব যে তাহার স্বভাবগত ও উহা যে তাহার অন্যান্য প্রবৃত্তির তুলনায় প্রবল, ইহা প্রমাণিত হয়।

মানুষের 'ইচ্ছা' কাহাকে বলে এবং উহার উৎপত্তি হয় কোন কার্য্যধারায় তাহা বলিতে পারিলে দেখা যায় যে, সুখের ইচ্ছা মানুষের অবয়বের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইহার কারণ, মানুষের ইচ্ছার উৎপত্তি হয় তাহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতির অংশের স্ব স্ব তৃপ্তি বোধের পূরণার্থক পদার্থ নির্ব্বাচনের কার্য্যে। সুখের ইচ্ছা মানুষের অবয়বের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে বলিয়া দুঃখ দ্বেষও মানুষের অবয়বের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে।

ইহার কারণ—মানুষ তাহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি এক একটি অবয়বাংশের তৃপ্তিবোধের পূরণের জন্য যে সমস্ত পদার্থ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত পদার্থে ঐ সমস্ত অবয়বাংশের তৃপ্তি হইলে মানুষ যেমন সুখলাভ করেন, সেইরূপ আবার তৃপ্তি না হইলেই দুঃখ বোধ করিয়া থাকেন। সুখলাভ করা যেমন

মানুষের ইচ্ছার বিষয়, সেইরূপ দুঃখ-দ্বেষও মানুষের ইচ্ছার একরকম বিষয়।

•

মানুষের পশুত্ব যেরূপ স্বভাবগত, মানুষের মনুষ্যত্বও সেইরূপ স্বভাবগত। ইহার কারণ, মানুষের জন্মগত সুখেচ্ছা প্রবৃত্তির বিদ্যমানতা বশতঃ শৈশবকালেই ব্যক্তি-বিশেষের বিরুদ্ধে এবং ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে যেরূপ দ্বেষ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, সেইরূপ মানুষের জন্মগত সুখেচ্ছা প্রবৃত্তির বিদ্যমানতা বশতঃই শৈশবকাল হইতে দ্বেষ-প্রবৃত্তি দূর করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে।

•

যুগপৎভাবে শরীরের পুষ্টি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও আরাম, মনের স্থিরতা ও শান্তি, বুদ্ধির ধীরতা ও বিচার শক্তি রক্ষিত হইলে মনের যে অবস্থার উদ্ভব হয়—সেই অবস্থার নাম 'তৃপ্তি'। মানুষের যখন জ্ঞানাভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন মানুষের জ্ঞানগত দারিদ্র্যের উদ্ভব হয়; মানুষের জ্ঞানগত দারিদ্র্যের উদ্ভব হইলে মানুষ তাঁহার শরীর অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির যে কোন একটির আরাম হইলে তৃপ্তিবোধ করিয়া থাকেন। শরীর ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই চারিটি অংশের যুগপৎ ভাবে আরাম না হইয়া কোন একটি অংশের আরাম হইলে যে অবস্থার উৎপত্তি হয়, সেই অবস্থা তৃপ্তির অবস্থা নহে; উহা উত্তেজনার অবস্থা।

•

সংক্ষেপ তাৎপর্য্যানুসারে কোন দেশের কোন জাতির স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় সেই অবস্থা, যে অবস্থায় দেশের সাধারণ মানুষ কার্য্য-কারণ-ভাব বুঝিতে পারে এবং পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্ব স্ব অর্থস্বচ্ছলতা, সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু সাধন করিতে পারে। ঋষিগণের কথানুসারে মানুষের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে, প্রথমতঃ শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্বীয় প্রয়োজনীয় বস্তু অর্জ্জন করিবার জন্য, ব্যক্তিগতভাবে যে যে কার্য্য করা দরকার, তাহা অভ্যাস করিতে হয়, এবং তৃতীয়তঃ, সমাজের অথবা জাতির অংশরূপে যাহা করা দরকার তাহা করিতে হয়। তাঁহাদের কথানুসারে মানুষের স্বীয় ইষ্ট সাধন করিতে হইলে যেরূপ ব্যক্তিগত-ভাবে তাহার কার্য্য করিবার প্রয়োজন, সেইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেও তাহার কার্য্য করিতে হয়। মানুষের স্বীয় ইষ্ট সাধন করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করার প্রয়োজন হয় বলিয়াই ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, প্রসাদ লাভ করিবার অন্যতম উপায় দ্বেষবিমুক্ত হওয়া।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥—গীতা

পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ থাকিলে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া যায় না এবং একতাও সাধিত হয় না। কাজেই ব্যাসদেবের মতে একতা-সাধনই মানুষের স্বীয় ইষ্টলাভ করিবার অন্যতম উপায়।

•

প্রকৃতভাবে স্বাধীন হইতে একদিকে যেমন দেশের গভর্ণমেণ্ট্ যাহাতে দেশবাসীর দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, সেইরূপ আবার দেশের জনসাধারণ যাহাতে পরমুখাপেক্ষী অথবা চাকুরীজীবী না হইয়া স্বাবলম্বনে জীবিকার্জ্জন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে।

আজ আমরা সচ্চিদানন্দের তিরোধান-দিবস-স্মরণে তাঁহার পবিত্র আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

রূপলোক

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'

আমরা গত মাঘ মাসে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা নাটক সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই নাটকখানি এক সময়ে দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতার প্রাণে যেরূপ জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেম উদ্দীপিত করিয়াছিল, তাহাতে সিরাজদ্দৌলা কেবল নাটক নহে, মনীষিগণ ইহাকে জাতীয় 'উপনিষদ্' হিসাবেই আখ্যা দিতেন। দেশ কিরূপে ও কাহার ষড়্‌যন্ত্রে বাঙ্গলার স্বাধীন নৃপতির হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া বিদেশী বণিকের হাতে আসিয়া নিপতিত হয়, গিরিশচন্দ্র তাঁহার অনন্যসাধারণ মনীষা ও নাট্যকুশলতার দেশবাসীর সমক্ষে জলন্তভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু কেবল নাটকেই ফলোদয় হয় না, অভিনয়ও প্রকৃষ্ট ও নাটকোপযোগী হওয়া চাই। গিরিশচন্দ্র অপূর্ব্ব প্রযোজনা-কৌশলে সে যুগে মিনার্ভা থিয়েটারে বারির পর রাত্রিতে জনকোলাহলপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে যে জাতীয়তার প্রবাহ সঞ্চার করিতেন, বহু-সংখ্যক শ্রেষ্ঠ বাগ্মীর বক্তৃতাতেও তাহা সম্ভব হইত না। আমরা জানি, সে সময়ে এই নাটক ও অভিনয়ের গুণে অনেক দেশবাসীর হৃদয়ে যে খাঁটি জাতীয়তা-বুদ্ধির সঞ্চার হইয়াছে, আজও তাহা অক্ষুণ্ণ আছে।

"ফিরিঙ্গিরে নাহি দিও
সূচাগ্র স্থান
বঙ্গের সন্তান
হিন্দু মুসলমান
বাঙ্গলার সাধহ কল্যাণ
শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে
কর পরিহার
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু
নহে আপনার
স্বার্থপর, চাহে মাত্র
রাজ্য অধিকার
হও সবে
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত—"

প্রভৃতি কথায় বিদ্যুৎ ছুটিত। কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে নাটক অভিনয়ও তৎকালীন ফিরিঙ্গি-শাসিত গভর্ণমেণ্ট বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। গভর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞায় উভয়ই বন্ধ হইয়া গেল।

সুখের বিষয়, জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠার অল্প পরেই মহাকবির প্রসিদ্ধ জাতীয়তামূলক তিনখানি নাটকের প্রতি (সিরাজদ্দৌলা, মিরকাসিম ও ছত্রপতি শিবাজী) নিষেধাজ্ঞা রহিত হইয়াছে ও সুপ্রসিদ্ধ নট শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী যে শ্রীরঙ্গমে সিরাজদ্দৌলা নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে বঙ্গশ্রীর পাঠকবর্গকে আমরা তাহা জ্ঞাত করাইয়াছি। কিন্তু পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, শ্রীরঙ্গমের অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই, বরং প্রযোজনার ত্রুটিতে মহাকবির রচনার তাহারা শ্রদ্ধা লইয়াও ফিরিয়া আসে নাই। নাটকের বিকৃত সম্পাদন ও অভিনয়ের অপটুতায় গিরিশচন্দ্রের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণের প্রাণে ইহাতে বিষম ব্যথা লাগে। এই ব্যথা সুবিখ্যাত নাট্যসংঘ গিরিশ-পরিষদ অন্যতম পরিচালক এমেচিয়ার শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনের একান্ত সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় এই ব্যথা দূরকরিয়া সাহিত্যের তৃপ্তি বিধান করিয়াছেন, পরন্তু নাট্যসম্রাটের বিশিষ্ট নাটকখানির যথার্থ তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া বাঙ্গালী জাতিরও অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

যে সময়ে সিরাজদ্দৌলা প্রথমে অভিনীত হয় বাঙ্গালী তখন এক নব জাগ্রত আন্দোলনে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরমের' প্রথম বিজয়ধ্বনি তাহাদিগের নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বোধিত করিয়া তাহাদের প্রাণে নূতন সাধনার সূচনা করিয়াছিল। বস্তুতঃ ফিরিঙ্গিচরিত্র তখনই বাঙ্গালীর চক্ষে প্রথম স্বপ্রকাশ হয়। এই সন্ধিক্ষণে এই নাটকের প্রতি কথায়, প্রতি ভাবসঞ্চারে, প্রতি হস্তপদ-বিন্যাসে দর্শক স্পন্দিত হইয়া উঠিত। আর সেই সময়ে বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করিতেন নটগুরু গিরিশচন্দ্র স্বয়ং ও তাঁহার ক্ষমতাশালী সুহৃদ অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফি। উভয়ে যথাক্রমে

কবির চাচা ও ধানশা কবিরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নূতন ভাবে আমোদের সঙ্গে বাঙ্গলার অবস্থা পরিজ্ঞাত করিতেন। আর সিরাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন নূতন দলের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অভিনেতা সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ ওরফে দানিবাবু। ক্লাইব হইতেন অন্যতম প্রসিদ্ধ নট ক্ষেত্রমোহন মিত্র, নীলমাধব চক্রবর্ত্তী বিরজাকর, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ জগৎশেঠ, মোহনলাল, তারক পালিত, ঘুসাদা হাঁদুবাবু, নীরমদন নন্টুবাবু। ইঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নট বাঙ্গলাদেশে তখন বিরলই ছিল। আর অহরা হইতেন সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী-চূড়ামণি তারাসুন্দরী, লুৎফুন্নেসা—কোকিলকণ্ঠী সুশীলা-বালা। সেকালে তারাসুন্দরীর অভিনয় দেখিয়া কোন দেশের রঙ্গালয়েও অন্যতমা শ্রেষ্ঠাভিনেত্রীর কল্পনাও কেহ করিতে পারিত না। মেহেটি ও ওটাটুলপত্নী হইতেন সুধীরাবালা। মধ্যে মধ্যে হইতেন লেডী মাাকবেথ ও তদীয় অবিসম্বাদী মনোধিকারিণী প্রখ্যাতনামা নাট্যসম্রাজ্ঞী ক্ষিরোদ্ধি দাসী প্রত্যেকটি ছোট-ভূমিকাও হইত অনিন্দ্য। কিন্তু আজ সেই সব অভিনেতা অভিনেত্রীর অভাবের কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। ইহার পরে আজ পর্য্যন্ত সেই প্রকৃষ্ট ও নিখুঁত অভিনয়ের ছায়াও কেহ অতিক্রম করিতে পারে নাই।

তথাপি একান্ত সুখের বিষয়, এখনও এমন একদল শ্রেষ্ঠ এমেচিয়ার যুবক-অভিনেতার আবির্ভাব হইয়াছে যে, তাহাদের অভিনয় দেখিয়া রঙ্গালয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি। সিরাজ, ধানশা, উমিচাঁদ, ওয়াটস্, সওকতজঙ্গ, পলাশীর যুদ্ধ, মোহন-লাল, মীরমদন, মীরণ ও মহম্মদীবেগ প্রভৃতির অভিনয় দেখিয়া আমাদের আশা হইয়াছে যে রঙ্গমঞ্চ আবার বাঙ্গলা দেশে নিজের শ্রেষ্ঠস্থান পুনরায় নির্দ্ধারণ করিয়া নিতে পারিবে আর পূর্ব্বের ন্যায়ই রঙ্গালয়ের সহায়তায় লোকশিক্ষা প্রদানে বাঙ্গলাদেশ কখনও পশ্চাদ্‌পদ হইবে না।

দ্বিতীয় আনন্দের বিষয়—সুপ্রসিদ্ধা বিনোদিনী ও সুকুমারী দত্ত, ক্ষিরোদ্ধি ও তারাসুন্দরী, সুশীলাবালা ও নরীসুন্দরীর দিন আর আসিবেনা। কৃষ্ণভামিনী (এক্ষণে স্বর্ণতা) সরযূবালা ভিন্ন আর মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি অভিনেত্রীর নাম এ যুগে করা যাইতে পারে। এক সময়ে গিরিশচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া বারাঙ্গনা শ্রেণী হইতে অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আজ সে শ্রেণীতেও অভিনেত্রীর দৈন্য পরিলক্ষিত হইতেছে। এই দুঃসময়েও ভদ্রসমাজের মেয়েরা যে কলাজ্ঞানে সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইয়া সফলকাম হইয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। এই নাটকের স্ত্রী-ভূমিকাগুলি বিশেষ কঠিন এবং শ্রম ও আয়াসসাধ্য। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইতিপূর্ব্বে কখনও অবতীর্ণ না হইয়াও শ্রীমতী জয়া দাস মেহেটির ভূমিকায়, শ্রীমতী জ্যোতিকণা রায় অহরার ভূমিকায়, কবি কমল-রাণী মিত্র আলিবর্দ্দি বেগমের ভূমিকায়, নবিতা সেনগুপ্তা লুৎফুন্নিসার ভূমিকায় ও মমতা সেনগুপ্তা ওয়াটসপত্নীর ভূমিকায় যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠকলাকুশলা অভিনেত্রীর অভাব অভিজাত সম্প্রদায় আবশ্যকমত পূর্ণ করিতে পারিবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মেহেটি ও অহরার হাব-ভাব, চাহনি (expression) ও কথাবার্ত্তা অপূর্ব্ব বলা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে গিরিশ-পরিষদ 'বলিদান' ও 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকের অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চের প্রধানা অভিনেত্রীদের সহায়তা লই-য়াছেন। তাহাদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পরিষদ এবার যে অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতিই সূচিত হইতেছে এবং এই সংস্কার ইতিহাসের দিক হইতে রঙ্গালয়ের পক্ষে বিশেষ স্মরণীয়। এ সম্বন্ধে আরও বলিতে হয় যে, শ্রীযুক্তা শ্রীমতী সাবিত্রী ঘোষ সঙ্গীত পরিচালনায় যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব ও হরপ্রিয়া ও অলকা দাস যে অদ্ভুত নৃত্যকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখনীয়।

* ওয়াটস—অমীর চন্দ্রো, পলাশীর যুদ্ধ—ঘুসাদা ওয়, সওকতজঙ্গ মনোহোর চট্টো,মোহনলাল হাঙ্ক রায়, মীরমদন—অনুপম চট্টো, মীরণ অমিতাভ রায়, আলির বেগ সুশীলাবালা, বাণিকচাঁদ অর্দ্ধেন্দু সেনগুপ্ত, ধীরে পড়িয়া রায়।

কিন্তু গিরিশ পরিষদ যে অপূর্ব্ব অভিনয়ে দর্শকবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বহুল পরিমাণে প্রযোজনা-কুশল নিউথিয়েটার্সের সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক শ্রীবিমল রায়ের অদ্ভুত মনীষারই সম্ভব হইয়াছে। তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া, অভিনয়ের সৌকর্য্যার্থে নাটকের কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়া, দৃশ্যাদির সংযোজনা ও পরিকল্পনা করিয়া যে অপূর্ব্ব সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় কেবল ছায়ালোকে নয়, রঙ্গমঞ্চের নাটকের প্রযোজনায়ও তিনি বর্ত্তমান সময়ে অনুকরণীয়। সঙ্গে সঙ্গে কবর দৃশ্যটিতে শ্রীতিময় সেন ও নির্ম্মল মেহরা যে নূতনত্বের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে সত্যই রঙ্গমঞ্চে অনেক অভিনব কলার উন্নতি হইতে পারিবে বলিয়া আশা হয়। শ্যামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সিতাংশু মিত্রের ব্যবস্থাপনাও প্রশংসনীয়।

'গিরিশ পরিষদ' ১৬ই মার্চ্চ রংমহলে এবং ২৮শে মার্চ্চ কালিকা-থিয়েটারে সমষ্টিভাবে এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনয় করিয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিগত কাহারও অভিনয়ের প্রশংসা না করিয়া সুপ্রসিদ্ধ 'দেশ' কাগজের মন্তব্যটিই উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করিতেছি। তবে ইহার উপরেও মিরজাফরের ও জগৎশেঠের চক্রান্তভাব বিশেষ-ভাবে ফুটিয়াছিল, আর অসিত সেনের উমিচাঁদের কলা-সম্মত হাস্যরসোদ্রেক ও মহীতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মহম্মদীবেগের expression ও বিকট হাসি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত মনোমোহন ঘোষের ক্লাইভের প্রশংসনীয় অভিনয়, সুসাহিত্যিক নরেন্দ্র বসুর রায়দুর্লভের আভিজাত্য মূলক ভূমিকা ও তথা সাহিত্যিক সুধীর কুমার মিত্রের হলওয়েলের মেক্-আপও বেশ ভাল হইয়াছে।

অবশেষে রূপদান সম্বন্ধে 'দেশ' কাগজের মন্তব্য উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম—

"এই নাটকে সিরাজের স্বদেশপ্রেম, হিন্দু মুসলমানের মিলিত চেষ্টায় বাঙ্গলাকে স্বাধীন ও গৌরব-দীপ্ত ক'রে তোলার প্রয়াস, ধূর্ত্ত ইংরাজের চক্রান্ত থেকে দেশকে বাঁচাবার আমৃত্যু সংগ্রাম একমাত্র গিরিশচন্দ্রই তাঁর নাটকে জলন্ত ও জীবন্তরূপে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সেই সঙ্গে দেশের সর্ব্বলোলুপ স্বার্থপর এবং ক্ষমতালোভী মীরজাফর আর উমিচাঁদের দলকে তিনি যেভাবে দেখিয়েছেন আজও গিরিশচন্দ্রদর্শিত সেই সব চরিত্র টাকার লোভে, ক্ষমতার মোহে স্বার্থের লিপ্সায় বাঙলার বুকে আগুন জ্বালিয়ে তুলছে। গিরিশচন্দ্রের এই নাটক পুরাতন হ'লেও আজও তার সার্থকতা আছে। এইজন্য গিরিশ-পরিষদের এই উদ্যোগকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

"এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউই পেশাদার অভিনেতা নন, কিন্তু অভিনয়-দক্ষতায় পেশাদারদের চেয়ে কোনো অংশে তাঁরা কম যেখান নি। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় সিরাজের ভূমিকায় সুনীল দাশগুপ্তের অভিনয়। যেমন সুললিত ও দৃপ্ত কণ্ঠস্বর, তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক বাচন-ভঙ্গী। এমন ধারার fine অভিনয় এ্যামেচার শিল্পীদের মধ্যে খুবই কম দেখা যায়। অন্যান্য সুকণ চরিত্রের মধ্যে—অনিল মিত্রের মিরজাফর, কার্ত্তিক মুখোপাধ্যায়ের জগৎ শেঠ এবং মহীতোষ চট্টোপাধ্যায়ের রাজবল্লভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানকা ফকিরের চরিত্রটি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়গুণে নূতন রূপে ফুটে উঠেছে। স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় লুৎফার ভূমিকায় নমিতা সেনগুপ্তর অভিনয়। কোথাও বাড়াবাড়ি নেই, আতিশয্য নেই, অথচ লুৎফার কোমল ও করুণ চরিত্রটির মর্য্যাদা তিনি পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন। তাঁর কণ্ঠের গান দুটিও সুমধুর। অহরার ভূমিকায় জ্যোতিকণা রায়ের অভিনয় প্রশংসনীয়। অল্প কয়েক দৃশ্যের ঘেসেটি বেগম ও রমলা সেনগুপ্তের ওয়াট্‌সপত্নী উল্লেখযোগ্য।"

মহাকবির সিরাজদ্দৌলা গিরিশ-পরিষদ কর্ত্তৃক যেরূপ প্রশংসনীয়ভাবে অভিনীত হইয়াছে, আমরা আশা করি বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চগুলি এই নাটকের অভিনয় করিয়া নট ভক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও দেশবাসীর হিতসাধন করিবেন। গিরিশ পরিষদ ও নাটকের মর্ম্ম লোকশিক্ষা হিসাবে সাধারণের নিকট আরও উপস্থিত করুন, ইহাও আমাদের একান্ত অনুরোধ।

গিরিশ পরিষদের অভিনয়ে রংমহলে প্রদান অভিনয়

হইয়াছিলেন নাট্যকার রাজা হরি হীরেন্দ্র নারায়ণ রায় এবং কালিকা-থিয়েটারে সভাপতি হইয়াছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এ, কে, এম, জেকেরিয়া ও প্রধান অতিথি হন সম্ভ্রান্তবংশীয়া শ্রীযুক্তা লেডী রাণু মুখার্জী। জেকেরিয়া সাহেব বাঙ্গলার সংস্কৃতি এবং হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সম্বন্ধে বড় মর্মস্পর্শী ও উপভোগ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর কন্যা শ্রীঅপর্ণা দেবী ও পুত্রবধূ শ্রীসুভাতা দেবী, শ্রীযুক্তা মাধুরী দেবী, রায়বাহাদুর যতেন্দ্রনাথ মিত্র, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর মেঘনাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধাংশুবন্ধু সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিরজাচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দু ঠাকুর, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী শতদল বিশ্বাস, মিঃ বি, এস, পাল-প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

পুস্তক ও পরিচয়

পলাতক: উপন্যাস। শ্রীনীরদ বরণ রায় গুপ্ত। কাত্যায়নী বুক হাউস: ২০৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—চার টাকা মাত্র।

আধুনিক বাঙ্গলা-সাহিত্যে মনস্তত্ত্বিক বিশ্লেষণ লইয়া যে কয়েক জন সুষ্টিধর্ম্মী কথাশিল্পী কলম ধরিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নীরদ বাবুর একটি বিশেষ আসন আছে। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার 'যযাতি-মা' বাঙ্গলা-সাহিত্যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই আলোড়নও ঐ মনস্তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ বা Psycho Analysis-এর ভিত্তিতেই। সেই মনোবিশ্লেষণের একটি বিশেষতর রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে আলোচ্য 'পলাতক' উপন্যাসে। নারীর মন লইয়া ইতিপূর্ব্বে অনুরূপা দেবীও শ্রদ্ধেয়া শৈলবালার মনোজ্ঞ রচনার সহিত আমরা একাধিক বার পরিচয় হইবার সুযোগ পাইয়াছি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের পর নীরদ বেন ছিন্ন এমন আর কোনো লেখকের বড় একটা পরিচয় আমরা পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না, যিনি নারীকে তাহার নিজের জবানীতে এমন সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছেন। এ কথা বলিব না যে, 'পলাতক' উপন্যাসের ভিত্তিতে একটি বিশেষতম সৃষ্টি (out standing figure) এখানে বৈধব্যব্রতপরায়ণা মাধবতী নারী একটি নারীর আধুনিক আত্মকাহিনীকে ভিত্তি করিয়াই মনঃসমীক্ষার একটি বিশেষ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাধা সন্ন্যাসরূপে নিজের দুঃখ, শোক, প্রেম, লালসা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিতেছে। নিপুণ শিল্পীর ন্যায় নিখুঁত ভাবে লেখক পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলির সহিত মাধবতীকে আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং বিশেষ সার্থকতারও পরিচয় দিয়াছেন। মাধার উন্মাদভাব এবং তাহার (পলাতক) কর্ত্তৃক সুক্ষ্ম উপায়ে তাহার হত্যায় শেষ মনস্তত্ত্বের প্রকট হইয়াছে। গ্রন্থপট এবং টাইটেল পেজে মুদ্রিত লেখকের নামের দুইরূপ সংপ্রয়োগে প্রকাশকের তাত্ত্বিকতার পরিচয় পাওয়া যায়: যেমন গ্রন্থপটে 'নীরোদ' এবং টাইটেল পেজে 'নীরদ'। এই সামান্য ত্রুটি আমাদিগকে যথার্থ তৃপ্তিদান করিতেছে

কয়েকটি বিদেশী গল্প: অনুবাদক—গোপাল ভৌমিক। সরস্বতী লাইব্রেরী: ৫৫, ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷০ মাত্র।

বাংলা ভাষায় আন্তর্জ্জাতিক সাহিত্যের অনুবাদের সার্থকতা সাম্প্রতিক কিছুকালের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি প্রসাদের এই বিশেষ দিকটির দিকে দৃষ্টিপাত দুই একজন সাহিত্যিক মাত্র দৃষ্টি দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় হইতেই বিশেষভাবে এই অনুবাদ প্রয়াসের সার্থকতা উপলব্ধি হয়। ইহার একটি কারণ খুব সম্ভবতঃ তরুণ শিল্পী সাধারণের আন্তর্জ্জাতিক চেতনাবোধ। সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। বাংলা-সাহিত্য ক্ষেত্রে ইহা যথেষ্ট আশার সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু ইহার একটি তরের দিকও রহিয়াছে। অনুবাদ-সাহিত্যের নামে এমন একাধিক অনুবাদ গ্রন্থও আমাদের চোখে পড়ে—যাহাতে অনুবাদ ও প্রকাশভঙ্গীর দুর্ব্বলতায় মূল গ্রন্থকে হত্যা করা হইয়াছে। এই জাতীয় অপটু শিল্পীর রচনা সম্পাদনা দ্বারা প্রকাশ করা আবশ্যক।

গোপালবাবু এ সম্বন্ধে সোড়া হইতেই সচেতন। দ্বিতীয়তঃ সম্পাদনা কার্য্যে তিনি নিপুণ, তাঁহার আলোচ্য 'কয়েকটি বিদেশী গল্প' আলেকজেণ্ডার কুপ্রিন, লেখভ, ভ্যালেরিয়ানোফ, টলষ্টয় চিরিকফ, আনি ভেন্সন, জন হেইনবেল, প্যাট্রেইক্ ওকেনেয়ার, উইলিয়েড্ সেট্‌ন্, ক্লাঁসোয়া কোপি, কে হিং, এ্যাণ্টোনেও এ, এম্, কিন্‌ডো, হাসে জেটার ট্রম, জিনো প্রেডেনসাল্, ইগ্‌নাৎসিও সিলোন এবং মৌপে সিলান্‌ত্রির গল্পই বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে চিরন্তন আবেদনের চাইতে সমসাময়িক যুগের আবেদনই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অতি অনাড়ম্বর সহজ ভাষায় গোপালবাবু প্রত্যেকটি কাহিনীর রূপ দিয়াছেন। এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশের এই গুণ যে, মূল গ্রন্থ পাঠে অসমর্থ বাঙ্গালী পাঠকও এই অনুবাদের সাহায্যে মূল গ্রন্থেরই রসোপলব্ধি করিতে পারেন। গোপালবাবুর এই গ্রন্থ দ্বারা বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার গভর্ণর কে হইবেন ?

সম্প্রতি একটী গুরুতর প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন শীঘ্রই ভারতবর্ষ হইতে গভর্ণর জেনারেল পদ ইস্তফা দিয়া বিলাত চলিয়া যাইবেন। যতদূর মনে হইতেছে, বাঙ্গলার গভর্ণর শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী মহাশয়েরই সেই পদপ্রাপ্তির কথা। তিনি যোগ্য ব্যক্তি, ইতিপূর্ব্বেও গভর্ণর-জেনারেলের কাজ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে গভর্ণর জেনারেলপদে সমাসীন দেখিলে আমরা বিশেষ খুসীই হইব।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত—বাঙ্গলার গভর্ণরপদে—কাহাকে নিয়োগ করা হইবে ? ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়কে সাময়িকভাবে এই পদের দায়িত্বভার দেওয়া হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার অশোক রায় মহাশয়ের নামও করিতেছেন। ইঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ, বাঙ্গলার এডুভোকেট জেনারেল ও ভারত গভর্ণমেণ্টের 'ল' মেম্বর হিসাবে ইঁহাদের মনীষা ও বুদ্ধি সম্বন্ধে কেহই দ্বিমত হইবেন না। কিন্তু ইঁহারা উভয়েই ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল গভর্ণমেণ্টের হাতহাড়-শাস্ত্র—সচিব। যত সব চণ্ডনীতিমূলক আইন দেশবাসীর জাতীয় সাধনায় বাধা দিয়াছে, বাঙ্গালী তথা—ভারতবাসীর জাতীয় জীবন নিষ্পেষিত করিয়াছে, সে সব কাজ ইঁহাদেরই পরামর্শে হইয়াছে। আজ যখন ত্যাগস্বীকার, কষ্টভোগ ও লাঞ্ছনা-পীড়নের পর দেশ স্বরাজ-সাধনায় সফলকাম হইয়াছে। আজও যদি দেশের খাঁটি ত্যাগব্রতী মুসলমানদের দাবী অগ্রাহ্য বা ক্ষুণ্ণ করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল আইন-কানুনের প্রতীক, পীড়নের সহায়ক, চণ্ডনীতির উদ্ভাবক-গণকে—হোক না কেন তাহারা যতই বুদ্ধিমান—দায়িত্ব-পূর্ণ পদগুলি অধিকার করিতে আহ্বান করা যায়, তবে আর দেশবাসীর লজ্জা ও অপমানের পরিসীমা থাকিবে না। তবুও করি দেশবাসী এইরূপ আত্মসম্মানহানিকর ব্যাপারে কখনও সম্মত হইবেন না।

আমাদের মতে ত্যাগ, দুঃখবরণ, পীড়ন সহ করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকারে বুদ্ধিমান ও কর্ম্মক্ষম এদিকে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িকভাব-সম্পন্ন এরূপ কোন বাঙ্গালীকেই এই পদে বরণ করা কর্ত্তব্য। আমরা প্রতিদিক হইতে উপরোক্ত গুণ সম্পন্ন এক ব্যক্তির নামই খুঁজিয়া পাইতেছি। ইতি-মধ্যে কয়েকখানি সংবাদপত্রে নামটি উত্থাপিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদেরও দৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় আমরা ঐসব কাগজের মন্তব্য সমর্থন না করিয়া পারিতেছি না।

সম্প্রতি শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর নামই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মনে করি—এ সম্বন্ধে সমগ্র বাঙ্গলা দেশে—কেবল বাঙ্গলাদেশে ই বা কেন বলি—সমগ্র ভারত ইউনিয়নে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি খুব অল্পই আছে। সকলেই জানেন ১৯২০ সালে অসহযোগ যখন ভারত-ভূমিতে তেমন দানা বাঁধিতেছিল না, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার বিপুল আয়, বাহ্যৈশ্বর্য্য, ইন্দ্রপদ পরিত্যাগ করিয়া দেশের কার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন, আর আলমুড় হিমাচল সমগ্র ভারতভূমিতে যেন একটা দাবানলের ন্যায় সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়া যায়। ঐ যে সোনার কাঠিতে ভারত হুহুঙ্কারে জাগিয়া উঠিল, উহার মূলেই ছিল চিত্ত-রঞ্জনের মহান্ ত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জন। অতঃপরে অসহ-যোগের জনক মহাত্মা গান্ধী ব্রহ্মরূপে আর উহার প্রাণ-শক্তি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিষ্ণুরূপে নূতন ভারত গড়িয়া তুলিলেন।

কিন্তু এই মহাব্রতপালনে কে পার্ব্বতীর ন্যায় শঙ্করের অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক পদবিক্ষেপে এই নব আন্দোলনে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন ? এই বাসন্তী দেবীই। ইনি কেবল স্বামীর ত্যাগ ও দুঃখময় জীবন যাপনের কথা শুনিয়া উহা মানিয়াই লন নাই, পরন্তু তাঁহার কর্ম্ম-সঙ্গিনী হইয়া বিপদসঙ্কুল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ দুস্তর নদীও

দুঃস্থ লোকের সহায়তায় উত্তীর্ণ হন, শ্রমিকগণকে উৎসাহ দেন ও সহায়তা করেন, অর্থসংগ্রহে লোক-সংগ্রহে, চরকা প্রচলনে প্রাণ-মন ঢালিয়া দেন। এই বাসন্তী দেবীই আদর্শ মাতা জননীর ন্যায় পুত্র চিত্তরঞ্জনকে প্রবীরের মত রণসাজে সজ্জিত করেন, অতঃপর জননীর ন্যায় নিজেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুত্রের পথানুসরণ করেন। সে-দিন বাঙ্গালী বধূ সর্ব্বপ্রথমে ভারতের স্বরাজসংগ্রামে জেলে নীত হন, সমগ্র বাঙ্গলাদেশ অভিনব অভূতপূর্ব্ব আকার ধারণ করে। স্বরাজ সংগ্রামে সহস্র সহস্র ছাত্র—যুবক-বালক-বৃদ্ধ ছুটিয়া আসে, রাজশক্তি পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়।

মনে পড়ে, যখন কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাব মাত্র সমগ্র দেশ দেশবন্ধুর উপর কিরূপ বিরূপ হয়, মহাত্মাজীর দেশবন্ধুর সঙ্গে মতদ্বৈধ হয়, কিন্তু আবার সত্যসন্ধ মহাত্মাজীই যখন ইহার যৌক্তিকতা বুঝিতে পারেন, তিনি নিজেই কংগ্রেসের সভাপতিরূপে কাউন্সিল-প্রবেশও তিনি কংগ্রেস-নীতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন, আর আজ সেই বাঙ্গলার রাজনীতিই ভারতে একমাত্র রাজনীতিরূপে অনুযুক্ত হইয়াছে। এবং বর্ত্তমান জাতীয় শাসনকর্ত্তাগণও সেই নীতিরই নিতান্ত শান্ত অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। কিন্তু এ-কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, এই কাউন্সিল-প্রবেশনীতি বাসন্তীদেবীর মুখ হইতেই বাঙ্গলার প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভানেত্রীরূপে প্রথমে ১৯২২ মার্চ্চ মাসে প্রথম প্রকাশ্য সম্মিলনীতে বাহির হয়। আবার মহাত্মাজী স্বয়ংও তাঁহার কর্ম্মশক্তি, মনীষা, চরকাপ্রীতি, হিন্দু মুসলমানে সমদর্শিতা নিপীড়িতদের প্রতি সমবেদনা দেখিয়া উৎফুল্ল হইতেন সকল মহিলাগণকে এই আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিতেন।

বাসন্তীদেবীর কার্য্যক্ষমতাও ছিল অপরিসীম। দেশবন্ধুর বিরাট সংসার, দান-ধ্যান, বৃত্তি, বহুলোকের প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' 'বাঙ্গলার কথার' বাসন্তীদেবীই প্রধান পরিচালিকা ছিলেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও কেবল দেশবন্ধু নহেন, তাঁহার অনুচর ও সঙ্গীগণ সকলেই অজস্র প্রশংসা করিতেন। বাসন্তীদেবীর পিতা স্বর্গীয় বরদা হালদার মহাশয় কন্যাকে ইংরাজী ভাষায়ও সুশিক্ষিতা করেন। জেলে যাইবার সময়ে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে ইংরাজ রক্ষীও প্রত্যুত্তরে অভিবাদন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাঁহার অসংখ্য অভিভাষণ দেশবাসীকে উদ্বোধিত করে। আর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভানেত্রীর অভিভাষণে বিরাট জনসঙ্ঘ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রশংসা-মুখর হইয়া উঠে।

স্বামীর মহাপ্রয়াণের এক বৎসর মধ্যে একমাত্র পুত্র চিত্তরঞ্জন চিরনিদ্রায় অভিভূত হওয়ায় স্বামীহীনা পুত্রহিনা পুত্রবধূ ও তাঁহার তিনটি নাবালিকা কন্যার যাবতীয় ভার নিজস্কন্ধে পড়ায় তিনি এতদিন বাহিরের কোন আন্দোলনে মন-প্রাণসংযোগে যোগ দিতে পারেন নাই, কিন্তু আজ পুত্রবধূ নিজেই সমাজহিতৈষণা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, পৌত্রীরাও একজন যোগ্য পাত্রে পড়িয়াছেন, আর একজনও সুশিক্ষিতা, সুতরাং দেশবাসীর উচিত এখন তাঁহাকে আবার পূর্ব্বের ন্যায় রাজনীতিমূলক কার্য্যে সর্ব্বময়ী দেশনায়িকারূপে বরণ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হওয়া। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, ভূপতি মজুমদার, হেম চন্দ্র নস্কর, নিকুঞ্জ মাইতি প্রভৃতি সকলেই দেশবন্ধুর একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। কর্ত্তব্যের খাতিরে দেশবাসীর মুখ চাহিয়া দেশের হিতকল্পে তাঁহারা সকলে এই মহীয়সী মহিলার কাছে নতজানু হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গলার অধিনায়কী শাসন-নায়িকারূপে বরণ করিয়া লইয়া আসুন, ইহাই আমাদের কাম্য ও সুচিন্তিত উপদেশ। ঘাঁটি মানুষকে তাঁহার ন্যায্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা জনসাধারণের—সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনায়কদেরও একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের স্বরাজসেবী রাষ্ট্র নেতৃগণ এ কর্ত্তব্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিবেন বলিয়া মনে হয় না। আজ কস্তুরীবা গান্ধী বা স্বরূপরাণী নেহরু থাকিলেও তাঁহাদিগকে যোগ্য সম্মান দেওয়াই দেশবাসীর কর্ত্তব্য হইত। কিন্তু যিনি আছেন, সেই দলমাকুল-দুর্গতা বাসন্তী দেবীর প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে দেশবাসী—দেশের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ—একান্ত উন্মুখ হইয়া উঠিলেই জাতির কর্ত্তব্য সাধন হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

নিষিদ্ধ কমিউনিষ্ট পার্টি

গত ৩০শে মার্চ সংশোধিত ভারতীয় ফৌজদারী আইনের বলে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ দল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারী তরফ হইতে এই নিষেধাজ্ঞা প্রচারের কারণও বিবৃত হইয়াছে। নূতন পুলিস-মন্ত্রী শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ের উক্তি অনুসারে সেই কারণের মোট কথা হইতেছে—"কলিকাতার 'কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে' কার্যতঃ এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টগুলির বিরুদ্ধে অবিরাম সকল দিক্ হইতে আক্রমণ চালানো হইবে এবং জনসাধারণকে অস্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া একটি গণ-বাহিনী গড়িয়া তোলা হইবে। গভর্ণমেণ্ট সন্দেহ করিতেছেন যে, বে-আইনীভাবে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা হইতেছে এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।"

দেশের প্রচলিত সংবাদ-পত্র ও পত্রিকাগুলিকে জনমতের মুখপত্র হিসাবে মানিয়া লইলে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার তাঁহাদের এই আকস্মিক কর্মপন্থার জন্য প্রায় অধিমিশ্রভাবেই দেশবাসীর সমর্থন পাইয়াছেন। তবে প্রতিবাদও যে কিছু হয় নাই, তাও নয়, দেশের একাধিক বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ দলের পরিভাষায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এই কার্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এই সমর্থক ও প্রতিবাদী দলের বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্য হইতে মুক্ত বাস্তব দৃষ্টি দিয়া ঘটনাটির বিচার করা প্রয়োজন। কিন্তু সেই বিচারের পূর্বে সমর্থক ও প্রতিবাদীদের উক্তিটাও কিয়দংশে জানা দরকার।

সমর্থকদের যুক্তিটা অংশতঃ এইরূপ: ভারতীয় কমিউনিষ্টদের রাজনৈতিক আনুগত্য আমাদের দেশীয় কোনো আদর্শের উপর তো নির্ভরশীল নয়ই, উপরন্তু আমাদের দেশের সকল আদর্শের প্রতি তাহাদের সর্বাঙ্গীণ বিরূপতাটাই প্রকট। কমিউনিষ্টগণ বিদেশী রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুগত। সেই কারণে উক্ত রাষ্ট্রের গৃহীত বৈদেশিক নীতি ও আদেশ পালনই হইল ভারতীয় কমিউনিষ্টদের একমাত্র নীতি। বিগত যুদ্ধের সময় হইতেই কমিউনিষ্টদের এই পররাষ্ট্রনীতির প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। হিটলার কর্তৃক আচম্বিতে রাশিয়া আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং হিটলার ও ষ্ট্যালিনের মধ্যে গলাগলি থাকা পর্যন্ত ভারতীয় কমিউনিষ্টরা সেই যুদ্ধকে বলিত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, সুতরাং বর্জনীয়। কিন্তু রাশিয়া আক্রান্ত হইবার পর হইতেই তাহারা সেই একই যুদ্ধকে রাতারাতি জনযুদ্ধে পরিণত করিয়া ফেলে। শুধু তাই নয়, রাশিয়া যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যে ইংরেজ ও তাহাদের রাষ্ট্রীয় নেতা চার্চিল সাহেব তাহাদের চোখে আর্ক ইম্পিরিয়ালিষ্ট ও ষোল আনা প্রতিক্রিয়াশীলরূপে গণ্য ছিল, রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পরই সেই একই ইংরেজ ও চার্চিল গণতন্ত্রের প্রহরের রক্ষক হিসাবে তাহাদের চোখে প্রতিভাত হইয়া ওঠে। এমন কি, সেই সময় যখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সহিত ভিতরে ও বাহিরে আতাতবাদী ভারতের জীবনপণ করা সংগ্রাম সুরু হইয়াছে তখনও কমিউনিষ্টরা জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া ভারতের শত্রু সাম্রাজ্যবাদেরই সব চেয়ে বড় সমর্থক হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পর যুদ্ধ শেষ হইবার পর ইংরেজ পক্ষ যখন নেহাৎ আত্মরক্ষারই দায়ে ভারতের সহিত আপোষ করিয়া ভারত ত্যাগ করে এবং বিভক্ত ভারতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভাঙ্গাঘরের সংস্কার ও পুনর্গঠনে মনঃসংযোগ করিতেছেন, তখনই কমিউনিষ্টরা আবার তাদের চিরাভিপ্রেত গণতান্ত্রিক (?) সরকার স্থাপনের জন্য ভারতের সমুদয় পুনর্গঠনের কাজে বাধা দিতেছে। যেমন করিয়াই হোক, উৎপাদন বৃদ্ধি করা এখন ভারতের পক্ষে জীবন-মরণের সমস্যা। কিন্তু সেই সমস্যার সুচারু ও শান্তিপূর্ণ সমাধান কমিউনিষ্টদের আকাঙ্ক্ষিত নয়। কেন না, দেশের শান্তিপূর্ণ অবস্থাওয়া কমিউনিষ্টদের পক্ষে মৃত্যুর তোতক। শ্রমিকদের অসন্তোষকে জিয়াইয়া না রাখিলে তাহাদের অস্তিত্বও লোপ পায়। এই জন্যই কমিউনিষ্টরা ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গলার সকল ক্ষেত্রেই অসন্তোষ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার বীজ ছড়াইতেছে। এমতাবস্থায় শিশুরাষ্ট্রের পক্ষে আত্মরক্ষার জন্য অসন্তোষের উস্কানিদাতাদের দমন করা ভিন্ন আর কী উপায় ছিল?

গভর্ণমেণ্টের কার্যের যাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছেন

তাঁহারা অবশ্য সমর্থকদের এই অভিযোগটা খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এমন কি, এই অভিযোগটার ধার দিয়াও তাঁহারা যান নাই। তাঁহাদের মূল বক্তব্য হইতেছে এই যে: অতীত হইল অতীত, বর্তমানের বিচার বর্তমান ধারাই করিতে হইবে। বর্তমানের সেই বিচারে কমিউনিষ্টদের যে আইনী ঘোষণা করার অর্থই হইল ভারতবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকার করা। স্বাধীনভাবে মতকে ব্যক্ত করার অধিকারই যদি না পাওয়া গেল, তবে কী লাভ হইল আমাদের স্বাধীনতা পাইয়া? সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কমিউনিষ্টদের ঐ স্বাধীনতা হরণ করিয়া আইনতঃ কংগ্রেসের আদর্শেরই অবমাননা করিয়াছেন এবং এতদ্বারা কংগ্রেসনেতাদের ক্রমবিকাশমান ফ্যাসিষ্ট মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

উক্ত সমর্থক এবং প্রতিবাদীদের বক্তব্য দুটিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া যে-কথাটা মনে হয় সেটা এই যে, ঐ-দুটির কোনটাই ঘটনার সর্বাংশের অভিব্যক্তিকে বিচার করিয়া গঠিত হয় নাই, হইয়াছে পুর্ব হইতেই অবলম্বিত অনুকূল বা প্রতিকূল ভাবপ্রবণতার উপর ভিত্তি করিয়া। সমস্যাটি উপযুক্তরূপে অনুধাবন করিতে হইলে, এই ভাবপ্রবণতাকে পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। সেই দিক দিয়া ঘটনাটিকে আমরা এইভাবে বিচার করিতেছি:

অবশ্য প্রতিবাদীদের একটি অভিযোগ অন্ততঃ স্বীকার্য যে, বিরোধী দলকে আইনের বলে দমন করা নির্দোষ গণতন্ত্র-সম্মত নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কার্যের সমর্থকদেরও অভিযোগটা না মানিয়া উপায় নাই যে, কমিউনিষ্টদের রাজনৈতিক আনুগত্যের উৎসটা স্বাদেশিক নয়, বৈদেশিক। সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি অনুসারেই যে বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট-পার্টিদের রাজনীতি রচিত হইয়া থাকে এই অভিযোগও আজও পর্যন্ত সন্তোষজনক ভাবে খণ্ডিত হয় নাই। তাছাড়া, সশস্ত্র বিদ্রোহ-প্রচেষ্টার যে সন্দেহে সরকারপক্ষ নিষিদ্ধ পার্টিটির বিরুদ্ধে করিয়াছেন, সেটাও উপেক্ষণীয় নয়। কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক কলিকাতায় দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যতীতও কমিউনিষ্ট-পার্টির গঠনতন্ত্র অনুসারেও এই প্রচেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'পিপিল্‌স্ পাবলিশিং হাউস' কর্তৃক প্রকাশিত 'Principles of Party organisation নামক পুস্তিকার ১৫শ পৃষ্ঠায় এই অনুজ্ঞা স্পষ্টভাবেই লিপিবদ্ধ আছে—"Every possibility of providing the workers with weapons should most eagerly be taken advantage of"—এ ক্ষেত্রে কোন দেশেরই গভর্ণমেণ্ট আত্মরক্ষার জন্য নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন না, তাহারা গণতন্ত্রবাদী হইলেও না।

কিন্তু তথাপি আমরা কংগ্রেসী সরকারের এই কর্মধারাকে সমর্থন করিতে পারিতেছি না। কেন না, আমাদের মনে হয়, যে উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করার ফলে সেই উদ্দেশ্যটাই পণ্ড হইবে। কারণ, বলিতেছি। গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য দেশের সম্পদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দেশকে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিপর্যয় হইতে বাঁচানো,—সেই জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিঘ্নকর্তারা যাহাতে দুর্জনের চক্রান্তে পথভ্রান্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা। উদ্দেশ্যটা সাধু এবং সমর্থনযোগ্য, সন্দেহ নাই—ভারতকে বাঁচাইতে হইলে ভারতীয় শ্রমিকদের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষকে সত্বাই প্রশমিত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু শ্রমিক অসন্তোষ দূর করিতে হইলে তো কেবল মাত্র উস্কানিদাতাদের সরাইলে দিলেই হয় না, অসন্তোষের কারণও তো দূর করা চাই। আমাদের যেন না ভুল বোঝা হয়। অসন্তোষের কারণ বলিতে আমরা কেবল অর্থনৈতিক কারণটাই ইঙ্গিত করিতেছি না। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অসন্তোষটার উপশম কেবল মুখের কথাতেই হইবে না, সেজন্য সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত কার্যপদ্ধতি এবং গঠনকার্য প্রয়োজন এবং কংগ্রেস সেই কার্যপদ্ধতি সত্বরপর গতিতে ও উপযুক্ত আন্তরিক প্রচেষ্টাতে পূর্ণ করিতে বদ্ধপরিকর। আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে-প্রক্রিয়ায় কমিউনিষ্টগণ ভারতীয় শ্রমিকদের অসন্তোষকে প্রজ্বলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই শ্রমিকদের বুঝাইতে হইবে কংগ্রেসের আদর্শের আন্তরিকতা। শ্রমিকদের মধ্যে গিয়া

তাহাদিগকে কংগ্রেসের আপাত গুরুত্বের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে সচেতন করিতে হইবে এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টায় এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়টা সম্বন্ধে শ্রমিকদের সর্ব্বতোভাবে সজাগ করিতে হইবে যে, প্রাপ্যকে পাইতে হইলে তাহাদের সর্ব্বাগ্রে সেই প্রাপ্যের পরিমাণকেই জীবনপণে বৃদ্ধি করিতে হইবে, নতুবা শত ধর্ম্মঘটেও তাহাদের কপাল ফিরিবে না। এক কথায় কংগ্রেসকে প্রত্যক্ষভাবে গণ-মনের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতে হইবে। যে-কারণেই হোক্, অধুনা কংগ্রেসের আদর্শ সম্বন্ধে বঞ্চিত ভারতবাসী ক্রমেই আশাভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, সকল গঠন-মূলক কাজের জন্য দেশবাসীর সেই ভ্রষ্ট আশায় প্রাণ সঞ্চার করা প্রয়োজন। ইহা ব্যতিরেকে বিরোধী পক্ষকে যে-আইনী ঘোষণা করিলে জনগণের ক্রমভাগমান সন্দেহ কেবল বৃদ্ধিই পাইবে এবং শত্রুপক্ষেরও সেইদিক দিয়া সুবিধা হইবে। কেননা, এ-কথা কে না জানে যে, ধ্বংস করাই যাহাদের কাজ, লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াই তাহারা সেই কার্য্য সমাধা করিতে পারে সব চেয়ে ভাল-ভাবে এবং সেই গুপ্তবৃত্তিকেই তাহারা ভালবাসে সব চেয়ে বেশী।

পূর্ব্ববঙ্গের মাইনরিটি ও 'জনাব' জিন্না

আমাদের জনৈক মনস্তত্ত্ববিদ্ বন্ধু মিঃ জিন্নার চরিত্র সম্বন্ধে একটি ভারী কৌতূহলোদ্দীপক থিয়োরী রচনা করিয়াছেন। সেই থিওরীটি হইল এই যে, জিন্না সাহেবের জীবনে একমাত্র কাম্য নাকি কেবল সংবাদ-পত্র মারফত বিখ্যাত হওয়া—যেমন করিয়াই হোক্, সংবাদপত্রগুলির হেড্-লাইনের বড় হরফের অক্ষরগুলির মধ্যে তাঁহার নামের জন্য জায়গা করা চাই। এই কাম্য বস্তু লাভের জন্য তিনি নাকি কোন কাজ করিতেই পশ্চাদপদ নহেন—আত্মঘাতী পরিকল্পনা দ্বারাই হোক্ বা মারাত্মক রকমের মিথ্যা বিবৃতি দ্বারাই হোক্ অথবা যেমনতরই অন্তুত কর্ম্ম পদ্ধতি দ্বারাই হোক্, তাঁহার নামকে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তিনি বিজ্ঞাপিত করিবেনই। আমাদের বন্ধুটি মিঃ জিন্নার এই মনোবৃত্তির নামকরণ করিয়াছেন Publicity complex. মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ রকমের সীমাবদ্ধ,—কাজেই জোর করিয়া আমরা বলিতে পারি না, বন্ধুটির এই থিয়োরিটা প্রকৃতই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-সম্মত কিনা। তবে বন্ধুটি তাঁহার থিয়োরীর প্রমাণকল্পে যে সব নজির আমাদের সামনে ধরিয়াছিলেন, সেগুলিকে উড়াইয়া দিতে পারি নাই।

বন্ধুটির দেখানো এই নজিরগুলি বঙ্গশ্রীর পাঠকদের সামনে হাজির করার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উপযুক্ত স্থানাভাবে সেটা আপাতত সম্ভব হইল না। কারণ, সেই নজিরের পরিমাণ মহাভারততুল্য, প্রথম মুদ্রোত্তর ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রায় সমস্ত পাতাগুলিতেই সেই প্রমাণগুলি ছড়াইয়া আছে। আমরা বর্ত্তমানে কেবল জনাব জিন্নার পূর্ব্ববঙ্গ-সফরকালে উচ্চারিত কয়েকটি বিবৃতির উল্লেখ করিতেছি।

একটি বিবৃতিতে জিন্না সাহেব বলিয়াছেন, 'পাকিস্তানের মাইনরিটি সম্প্রদায় ভারতীয় ডোমিনিয়নের সকল অংশের মাইনরিটি অপেক্ষা সুখে আছে, তাহাদের সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতাও পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মাইনরিটিদের স্বাধীনতার তুল্য।"

আর একটি স্থলে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, "পূর্ব্ব-বঙ্গ হইতে মাইনরিটি সম্প্রদায় যে বাস্তুত্যাগ করিতেছে সেটা মুসলমানদের দোষে নয়, ভারতীয় নেতৃবৃন্দেরই হঠকারিতার ফলে। কারণ, ভারতের নেতারাই ক্রমশঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাহাদের যুদ্ধঘোষণার রব তুলিতেছেন। এই উস্কানির মধ্যেও পাকিস্তানের মুসলমানরা যে এখনো কিরূপে মাইনরিটিদের উপরে সদয় হইয়া আছে, এইটাই আশ্চর্য্য!"

তৃতীয় একস্থলে মিঃ জিন্না পাকিস্তানী মুসলমানদের সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন—"শত্রুকে চেনো। তাহাদের কোন কথাতেই কান দিও না, বরঞ্চ তাহাদের ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হও।"

জিন্না সাহেবের উপরোক্ত তিনটি বিবৃতিই যে বর্ণে বর্ণে মিথ্যা, এ-কথা প্রমাণ করিবার জন্য বোধ করি আমাদের মনস্তাত্ত্বিক বন্ধুটির দেওয়া নজিরের অপেক্ষা

করিতে হয় না, তবু বন্ধুটির দেওয়া প্রমাণই আমরা উল্লেখ করিতেছি :

(১) ঢাকায় প্রায় শতাধিক বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত জন্মাষ্টমী মিছিল এবারে প্রধান মন্ত্রীর সহযোগিতায় যাওয়া যাহির করা সম্ভব হয় নাই। (মাইনরিটির স্বাধীনতা)।

(২) সমস্ত হিন্দুদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে। কারেদে আজম কাণ্ডের জন্য জোর করিয়া চাঁদা আদায় করা হইতেছে। (মাইনরিটির স্বাধীনতা এবং মাইনরিটি সুখে আছে)।

(৩) পাকিস্তান বিধান-পরিষদে কংগ্রেসী সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র বসুমহাশয় বাঙলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম পরিষদীয় ভাষা (Assembly Language) হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে, পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি খাঁ সেই প্রস্তাবকে মুসলমানদের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করিবার চক্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর পূর্ববঙ্গে ভাষা-আন্দোলনে আর যোগ দেওয়া হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। (মাইনরিটির স্বাধীনতা)।

(৪) কিন্তু ভাষা আন্দোলন হইতে সর্বতোভাবে হিন্দুরা সরিয়া দাঁড়াইলেও যখনই কোনও জেলায় যে হাঙ্গামা হয় তাহাতে দুইজন হিন্দু নিহত হয় এবং তিনজন স্ত্রীলোক সহ সতেরো জন হিন্দু আহত হয়। ঢাকাতে শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ দাশগুপ্তকে প্রহার করা হয়। (মাইনরিটি সুখে আছে)।

(৫) গ্রামাঞ্চলে বিগ্রহ ভঙ্গ, চুরি—ডাকাতি এবং নারীনির্যাতনের মাত্রা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাণিকগঞ্জের একটি গ্রামের ঘটনা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। (মাইনরিটি সুখে আছে)।

আমাদের বন্ধুটি আরও বহু উদাহরণ দাখিল করিয়াছিলেন, আমরা প্রধান কয়টিকে বাছিয়া নিয়াছি। কায়েদে আজমের বিবৃতির সত্যতা আশা করি এই কয়টিতেই প্রমাণিত হইবে। আমাদের বন্ধুটি ইহার পর তাঁহার বিয়োগী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে—কায়েদে আজম অজ্ঞাতসারে এই মিথ্যা কথাগুলি উচ্চারণ করেন নাই, জানিয়া শুনিয়া এবং অনেক চিন্তা করিয়াই বলিয়াছেন। কেননা, তিনি জানেন যে, সত্য কথা বলিলে তাহার কথাগুলি নিয়া সংবাদপত্রগুলি এত হৈ চৈ করিত না, একবার উল্লেখ করিয়াই থামিয়া যাইত। তারপর তাঁহার এই উক্তি যে ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থেও হিন্দুদের অন্ধ ও সম্প্রদায়িকতাবাদী অংশের চোখে ধুলা দিবে একথাও তাঁহার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এমন একটা মারাত্মক কথা না বলিলে যে, মুসলমানদের শুভার্থী এবং ধর্মান্ধ হিন্দুদের এই দুইটা শ্রেণীকেই এক সঙ্গে প্রতিবাদ-মুখর করা যায় না, এ কথা জনাব জিন্না ভালো করিয়াই জানেন, আর জানেন প্রতিবাদ করার মত কিছু না বলিলে ভারতবর্ষীয়রা তাঁহার অদ্ভুত কথা নিয়া বড় একটা মাথা ঘামাইবে না। আমাদের মনে হয়, আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলি বন্ধুটির উক্ত বিয়োগীর উপযুক্ততা উপলব্ধি করিয়া মিঃ জিন্নার সকল রকম বিবৃতি উল্লেখ করিতে পারিলে কাগজের এই মাগ্‌গির বাজারে সহজেই অনেকখানি কাগজ বাঁচাইতে পারিবেন।

প্রাদেশিক সীমানার পুনর্গঠন

১৯৪৬ সালের কংগ্রেসের ইলেকশান ম্যানিফেস্টোতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল যে, "যতদূর সম্ভব ভারতঃ প্রদেশগুলির সীমানা ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত একতার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা হইবে।" একটুখানি গভীর দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলেই বুঝা যাইবে যে, দুটি ঐতিহাসিক সত্য এই প্রস্তাবটির মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু যুক্তি দিয়া বিশ্লেষণ করিলেই অস্পষ্ট সত্য দুইটির তথ্য স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে। সেই দুটির একটি হইল এই যে, বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের শোষণাত্মক শাসনের সর্ববিধ সুবিধার জন্য নিজেদের খুশীমতই প্রদেশগুলিকে ভাগ করিয়াছিল। দ্বিতীয়টি হইল এই যে, এবম্বিধ স্বার্থ-প্রণোদিত ভাগাভাগির জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাভাষীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় নাই, দেশ মুক্ত হইলে এই অন্যায় দূর করা হইবে।

প্রায় মাস আষ্টেক হইতে চলিল দেশ কার্যতঃ

বিদেশীর শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছে এবং এই বাস আটেক বরিয়াই আমাদের এই মুক্ত দেশের ভগ্ন পূর্ব্বের সর্ব্ববিধ অন্যায় হইতে একটি মুক্ত শাসনতন্ত্র রচনায়ও তোড়জোড় চলিতেছে। কাজেই এখন বোধ করি পূর্ব্বোক্ত প্রাদেশিক পুনর্গঠনের কংগ্রেসী প্রতিশ্রুতির প্রশ্নটি উত্থাপিত করা খুব অন্যায় হইবে না।

আর কোনো প্রদেশের ক্ষেত্রে না হইলেও, নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন ভারতবাসী মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে এই প্রশ্ন উত্থাপনটা কেবল অপরিহার্য্যই নয়, ইহা পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশবাসীর পক্ষে জীবন-মরণেরও প্রসঙ্গ; কেননা—এই সম্পর্কে বাঙ্গলা দেশ ব্রিটিশ শাসক-সাম্রাজ্য কর্তৃক যে পরিমাণে অন্যায় ভাবে নিগৃহীত হইয়াছে, ততখানি সম্ভবতঃ আর কোন দেশই হয় নাই। এই উক্তি নিছক উচ্ছ্বাস-প্রসূত নয়, ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা-সিদ্ধ, এবং এই ইতিহাস সুদূর অতীতেরও নয়, মাত্র তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের পুরাতন ঘটনা। অতি সংক্ষেপে আমরা সেই ঘটনা স্মরণ করিতেছি:

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশের বিস্তৃতি ছিল ২ লক্ষ বর্গ মাইল এবং উহার লোকসংখ্যা ছিল আট কোটির মত। বাঙ্গলা তখন ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের সর্ব্ববৃহৎ প্রদেশরূপে গণ্য ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দশক পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা ব্রিটিশ সরকারের অনুগত প্রজা ছিল। কিন্তু শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ বাঙ্গালীরা বিদেশী শাসনের আনুগত্য বেশী দিন সহ্য করিতে পারে নাই, বিদেশী শোষণের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহারা অস্থির হইয়া ওঠে। তখন বাঙ্গলার এই বেয়াদপি সায়েস্তা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন লর্ড কার্জ্জন। কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের বোমাদাদ আসিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই হীন আঘাতের প্রতিবাদে সর্ব্ববাঙ্গলার প্রত্যাঘাতও দুর্দ্দম হইয়া উঠিল। ফলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বাঙ্গালীর সহিত সন্ধি করিতে হইল বটে, কিন্তু বাঙ্গালীকে তাহারা সহজে ছাড়িয়া দিল না। ১৯১১ সালে বাঙ্গলার পুনর্গঠনের সময় সয়তানি কূটনীতি দিয়া সে বাঙ্গলার অঙ্গহানি করিয়া বাঙ্গালীকে পঙ্গু করিল। বর্ত্তমান বিহারের পূর্ব্ব-সীমান্তের জিলা কাঁটি যথা মানভূম, সিংভূম, এবং পূর্ণিয়া প্রভৃতি হইল মূল বাঙ্গলার উক্ত ছিন্ন অঙ্গ।

কৃত্রিম ভৌগোলিক সীমানা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইলেও এই জেলা কয়টি যে বিহারী বনিয়া না গিয়া আজও খাঁটি বাঙ্গালীই আছে, সে কথা এই স্থানগুলির ভাষা ও ঐতিহ্যের পরিচয় পাইলেই প্রমাণিত হয়। ১৯৩১ সালের সেনসাস্ অনুযায়ী দেখা যায় যে, মানভূমের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ, তন্মধ্যে হিন্দুস্থানী ভাষা-ভাষী অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র প্রায় ৩ লক্ষের মত, অবশিষ্ট সবই প্রায় বাঙ্গলা ভাষা-ভাষী; সিংভূমেও মোট প্রায় ৯ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র প্রায় ৮১ হাজার লোক হিন্দুস্থানিতে কথা বলে, বাকী সবই প্রায় বাঙ্গালী। পূর্ণিয়ার এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী বাঙ্গলা ভাষার কথা বলে; কিন্তু একক ভাষাভাষী হিসাবে এই সংখ্যাই সর্ব্বাধিক! সংস্কৃতির দিক দিয়াও এই জেলা কয়টিতে বাঙ্গালী ঐতিহ্যই আজও পর্য্যন্ত অটুট রহিয়াছে।

সুতরাং আজ ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে যখন কংগ্রেসের আদর্শকে পূর্ণ করিতে বিগত প্রাদেশিক সীমানার পুনর্বিচারের প্রশ্নটি স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তখন পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশেরও সীমানার দাবীটা সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সংশ্লিষ্ট পক্ষ বলিতে আমরা কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় কর্তৃপক্ষের কথাই বলিতেছি। দুঃখের বিষয়, অধুনা এ বিষয়ে উক্ত উভয় পক্ষেরই নিষ্ক্রিয়তা এবং উৎসাহের অভাব অত্যন্ত বেদনাদায়ক! তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় বিভাগের আচরণ অপেক্ষাকৃত মর্ম্মন্তুদ। সম্প্রতি প্রায় সমুদয় অন্ধ্রভাষাভাষীদের লইয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠন করিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রদেশ-বাসীদের এবং সম্পর্কিত দাবীকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু ধ্বংসাত্মক প্রাদেশিকতা বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, বাঙ্গলার এই দাবী সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাব-প্রসূত নয়; বাঙ্গালী চিরদিনই সর্ব্বভারতীয় আদর্শের পূজারী এবং এই আদর্শের প্রবর্ত্তক সে-ই; বাঙ্গালীর এই দাবী তাহার জীবন ধারণের তাগিদে পরিতক্ত ভারতেই বাঙ্গলা

প্রদেশ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা লোকবহুল এবং জনপ্রতি কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাঙ্গলার ছিল সর্ব্বাপেক্ষা কম (৪৭ একর বিহারে ও উড়িষ্যায় ৬১ একর, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজে ৭৪ একর) ইহার উপর বাঙ্গলা দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত উর্ব্বর জমিগুলি পূর্ব্ববঙ্গের ভাগে পড়াতে পশ্চিম বঙ্গে জনবাহুল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং স্বল্পপরিমাণেই জনপ্রতি কর্ষিত ভূমির পরিমাণও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার শেষ হয় নাই, পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে আগত বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের সংখ্যা উক্ত সমস্যাকে দিন দিন ভয়াবহ করিয়া তুলিতেছে। এই বিরাট জনসংখ্যাকে পশ্চিমবঙ্গ মাত্র ২৮০০০ বর্গ মাইল ভূমিতে স্থান দিবে কোন্ যাদুবিদ্যার বলে? শুধু মাত্র ধ্বংসাত্মক প্রাদেশিকতা বলিয়াই এই সমস্যাটাকে এড়ান যায় না। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সেই চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া উঁহাদের সেই আচরণ আমাদের ব্যথিত করিয়াছে। বাঙ্গালী প্রাদেশিকতা পোষণ করিতে চায় না, সে তাহার ন্যায্য পাওনারই প্রত্যাশী।

আর একটা কথা। কেবল মাত্র প্রয়োজন বলিয়াই যে পশ্চিমবঙ্গ বিহারের পূর্ব্বোক্ত জিলা কটিকে গায়ের জোরে দাবী করিতেছে, তাও নয়; দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরিয়া দখল রাখার ফলে উক্ত জিলা কয়টির উপর বিহারের দাবীটাকেও অন্যায় বলিতে পারি না; কিন্তু ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসেই আমরা এই শিক্ষা পাইয়াছি যে, দুই পক্ষের দুটি আপাত-ন্যায্য দাবীর চরম মীমাংসা স্থানীয় অধিবাসীদের সমর্থনের বিচারেই সাধিত হইতে পারে। বিহার-অন্তর্গত বাঙ্গালী জেলাগুলি সম্বন্ধেও আমরা সেই মীমাংসার উপায়ই প্রার্থনা করিতেছি।

দুটী বহু আকাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনা

যুদ্ধাহত সৈনিকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রত্যেক দেশ ও জাতিরই যুদ্ধোত্তর সমাজ-ব্যবস্থার অনিবার্য্য কর্ত্তব্য। জাতীয়তাবাদী স্বাধীন ভারতও এই কর্ত্তব্য এড়াইতে পারে না। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে সব বীর সৈনিকগণ মৃত্যুবরণ করিয়া, নির্য্যাতন ও অত্যাচারকে উপেক্ষা করিয়া অথবা সশস্ত্র প্রতিরোধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যে কারণেই হোক্, সেই সব বীর যোদ্ধাদিগকে আজ জীবন-সংগ্রামে কিছুটা পরাজয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতের এই সব বীর সন্তানদের পরিবারের অবস্থা শোচনীয়। পূর্ব্বতন রাজশক্তি ইহাদিগকে জীবনসম্পদ্ হইতে সর্ব্ব-প্রকারে বঞ্চিত রাখিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট ছিল, যে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও রাজরোষের ভয়ে ইহাদিগকে কোনপ্রকারে কোনও সহায়তা দানে সক্ষম হয় নাই। ফলে দুর্ব্বিষহ অভাবই ছিল ইহাদের দৈনন্দিন জীবনের একমাত্র পাথেয়। বলা বাহুল্য, আমরা নিশ্চিহ্নিত রাজনৈতিক কর্ম্মী এবং আজাদ হিন্দ্ সৈনিকদেরই কথা বলিতেছি।

অত্যন্ত সুখের বিষয়, কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট্ এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট্, এইসব দুস্থাবস্থ সৈনিকদের জন্য দুইটি প্রশংসনীয় পরিকল্পনা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট্ গ্রহণ করিয়াছেন আজাদ হিন্দ সৈনিকদের সম্পর্কিত পরিকল্পনাটি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনাটি বঙ্গীয় রাজনৈতিক কর্ম্মীদের জন্য। এতদ্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাটিই অগ্রে উল্লেখযোগ্য, কেননা, সেটি ইতিমধ্যেই পুরাপুরি সরকারী সমর্থন লাভ করিয়াছে। এই পরিকল্পনানুযায়ী স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে ত্রিশ লক্ষ টাকা ভাতা ও ক্ষতিপূরণ হিসাবে আজাদ হিন্দ্ সৈনিকদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থানুসারে বণ্টন করা হইবে। কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিভাগে আজাদ হিন্দ্ সৈনিকদের বহাল করা এতদিন প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। অতঃপর উপযুক্ত বিবেচিত হইলেই কর্ম্মপ্রার্থী সৈনিকদিগকে হোম গার্ড বাহিনী, দেশীয় রাজ্যের সৈন্যবাহিনী এবং সশস্ত্র পুলিশবাহিনীতে গ্রহণ করা হইবে—বেসরকারী শাসনবিভাগেও তাহাদের বহাল করাতে কোনরূপ আইনগত বাধা থাকিবে না। চাকুরী পাওয়ার সকল ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলি সৈনিকদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনাটি এখনও অবশ্য বিশুদ্ধ আইনের দিক দিয়া পুরাপুরি সরকারী রূপ পায় নাই, কিন্তু কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে। কাজেই সে-টিকেও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। এই প্রতিশ্রুত পরিকল্পনাটি প্রধানতঃ আমাদের অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের। গত ২রা এপ্রিলের সংবাদপত্র বৈঠকে এই সম্পর্কে তিনি যে বিবৃতি দিয়াছেন, আমরা নিম্নে সংক্ষেপে সেটুকু উল্লেখ করিতেছি :

সাহায্য গ্রহণের পাত্রদিগকে এইভাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইবে—(১) পরলোকগত লাহিড়ি কর্মীদের দুর্গত পরিবার, (২) বৃদ্ধ ও অক্ষম কর্মী এবং (৩) বর্তমানে কার্যাভাবে দুঃস্থ অথচ কার্যক্ষম কর্মী। প্রথম দুইটি শ্রেণীর জন্য সরকার তাঁহাদের সাধ্যমত অন্নবস্ত্র-ভাতার ব্যবস্থা করিবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য তাঁহারা সাধ্যমত জীবিকার সংস্থান করিবেন। কোন বিশেষ পদের জন্য কোন লাহিড়ি রাজনৈতিক কর্মী অন্য সব বিষয়ে উপযুক্ত গণ্য হইলে, বয়সের নিয়মের ক্ষেত্রে চার বৎসর পর্যন্ত সেই নিয়ম শিথিল করা চলিবে; সরকারী চাকুরিতে দেশসেবা অতিরিক্ত গুণ হিসাবে ধার্য হইবে।

বঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে আমরা উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত দুইটির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়কেই অভিনন্দন জানাইতেছি।

ভারতের খাদ্যের বর্তমান পরিস্থিতি

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান খাদ্যদ্রব্য কয়টি ব্যতিরেকে আর প্রায় সকল অবশ্যব্যবহার্য বস্তুর উপর হইতে কন্ট্রোল উঠিয়া যাইবার পর, উক্ত দ্রব্যগুলির মূল্য যে আকাঙ্ক্ষিত পরিমাণে কমে নাই, এবিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। বলা বাহুল্য, গভর্নমেন্টের এই কন্ট্রোল রহিত-নীতির এবম্বিধ ব্যর্থতা দেশবাসী আশা করে নাই। এই জন্যই আজকাল দেশবাসীর একটি অংশ গভর্নমেন্টের সমুদয় আশুরিক প্রচেষ্টাগুলির সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সন্দেহ আবার সামগ্রিক অবিশ্বাসরূপেও আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের খাদ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টাটিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কন্ট্রোল ও রেশনগ্রথা-বিরহিত কাপড়ের দুর্ভিক্ষের পর দেশবাসীর মনে ক্রমেই এই আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে যে, গভর্নমেন্ট নাকি আশানুরূপ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, এই কারণেই শীঘ্রই তাঁহারা তাঁহাদের অক্ষমতার লজ্জা হইতে অব্যাহতি পাইবার বাসনায় খাদ্যদ্রব্য হইতেও কন্ট্রোল তুলিয়া লইবেন। অতঃপর খাদ্যশস্যের অবস্থাও কন্ট্রোল-রহিত কাপড়ের অবস্থাতেই পরিণত হইবে।

সান্ত্বনার বিষয় এই যে, এখনও পর্যন্ত উক্ত অমূলক আশঙ্কাটি কেবল মাত্র দেশবাসীর অল্পতম অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু জনতার সন্দেহ বস্তুটি বড় সংক্রামক; সময় থাকিতে থাকিতে সন্দেহের পাত্র সন্দেহের কারণটা মোচন করিতে না পারিলে অল্পতম এবং সব চেয়ে ভিত্তিহীন সন্দেহও ক্রমশঃ সামগ্রিক ভাবে দেশের সকল অধিবাসীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। আমাদের শিশুরাষ্ট্রের পক্ষে সেই ব্যাপার মারাত্মক রকমের ক্ষতিকারক। এইজন্যই আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতানুযায়ী জনতার এই সন্দেহটি দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি।

ভারতের খাদ্যের অবস্থা মোটামুটি খুব সন্তোষজনক না হইলেও, হতাশ হইবার মতও নয়। খাদ্যবিভাগের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে খাদ্যশস্যের আমদানি ও আভ্যন্তরীণ সরবরাহ ক্রমশঃই উন্নত হইতেছে এবং শেষ পর্যন্ত আশা করা যাইতেছে যে, পুরাতন রিজার্ভ ভাণ্ডারে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টন খাদ্যশস্য সঞ্চিত করা সম্ভব হইবে। অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্য ক'টি স্থান হইতে গত মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য পাওয়া গিয়াছে। এতৎসম্পর্কেও কয়েকটি চুক্তির ফলে বাহিরে রপ্তানিকারী দেশগুলি হইতে যে এই বৎসরে আরও ১২ লক্ষ টন খাদ্য মিলিবার প্রতিশ্রুতি মিলিয়াছে, সে বিষয়টাও উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজ ও পশ্চিম বঙ্গে যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টন এবং ১ লক্ষ ৮ হাজার টন খাদ্যশস্য গত মার্চ মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের উৎপাদন কিছুটা আশাপ্রদ, এই কারণে

উক্ত প্রদেশের একটীর বরাদ্দ হইতে ৩৫ হাজার টন খাদ্য ইতিমধ্যেই বাঁচানো সম্ভব হইয়াছে; এবং পূর্ব্ব-পাঞ্জাব হইতেও কিছুটা শস্য উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যকোনো বস্তুর বিনিময়ে বিদেশ হইতে অন্ততঃ ২৫ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানি সম্ভব কিনা এই নিয়াও সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে আশাজনক আলোচনা চলিতেছে। তা ছাড়া, আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য-প্রতিষ্ঠানের সহিতও সম্প্রতি ভারতের গম সম্পর্কে একটি পঞ্চবর্ষ মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে আগামী আগষ্ট মাস হইতে ৫ বৎসর কাল হ্রাসযুক্ত মূল্যে বৎসরে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন গম পাওয়া যাইবে।

বাতিল কর্পোরেশন

বহু বাদপ্রতিবাদের পর পশ্চিম বঙ্গ সরকার কলিকাতা কর্পোরেশন সম্বন্ধে তাঁহাদের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কর্মপন্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপ:

১৯৪৯সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের কার্য্য-পরিচালনার ব্যাপারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য্যনির্ব্বাহক-দের কোনো হাত থাকিবে না; পূর্ব্বোক্ত মেয়াদকাল উত্তীর্ণ না হওয়া অবধি সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন প্রশাসকর্ত্তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কর্পোরেশনের সর্ব্ববিধ কার্য্য পরিচালিত হইবে। মূলতঃ কর্পোরেশনের কার্য্য-পদ্ধতির সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যেই গভর্ণমেণ্ট উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং সেই কারণেই এই জাতীয় সংস্কার সাধনের সুবিধার জন্য উক্ত সরকার-নিযুক্ত কর্ম্মসচিবটিকে অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে। তদনুযায়ী নব নিযুক্ত কর্ম্মসচিব নির্ব্বাচক মণ্ডলীর তালিকা সংশোধন করিবেন এবং সংশোধিত তালিকা অনুসারে নির্ব্বাচনের পর নবগঠিত কর্পোরেশনের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন।

অনেক দিন হইতেই যে কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্যপরিচালনা-পদ্ধতিতে কলঙ্কময় গলদ প্রবেশ করিয়াছিল, এ বিষয়ে কলিকাতাবাসী প্রায় সকলেই অবহিত ও অবহিত। নানাবিধ উপায়ে সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের নিকট কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারে একটা সার্ব্বজনীন উপদ্রবের বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। সাধারণ নাগরিকদের অনেকেই তাই উক্ত জাতীয় ঐতিহ্যযুক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে ঠাট্টা করিয়া বলিত 'চোর-পোরেশন'; জনসাধারণের এই অসন্তোষের তীব্রতা উপলব্ধি করিয়াই কিছুকাল পূর্ব্বে মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী স্বয়ং কর্পোরেশনের ব্যাপারে সরকারী তদন্ত দাবী করেন এবং বর্ত্তমান অবস্থায় দায়িত্বপালনের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া পদত্যাগ করেন। এটা অবশ্য বেশ কিছুদিন আগেকারই ঘটনা, সেই হেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত প্রয়োজনের বিচারে অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত বলিয়াই মনে হইতে পারে, তথাপি গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদার্হ।

প্রথম হইতেই গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা-বহির্ভূত থাকার জন্য কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠানটি ছিল আমাদের দেশের বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতীক-স্বরূপ। এইরূপ একটি গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী প্রতিষ্ঠান অক্ষমতা ও অসাধুতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইল, ইহা অতি বেদনাদায়ক বিষয়। স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপে আমাদের দেশের এই স্বাধীন সত্তার প্রথম নিদর্শনটি এবারে উক্ত বেদনার কারণ হইতে মুক্ত হইবে, ভবিষ্যতের জন্য আমরা এই আশাই রাখিব।

চেকোস্লোভাকিয়ার শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ও ব্রাসেলস্ চুক্তি

সম্প্রতি, প্রায় সিকিপিঠ বেছুইটি রাজনৈতিক ঘটনা ইউরোপে সংঘটিত হইয়াছে যে দুইটি যুদ্ধোত্তর আন্তর্জ্জাতিক রাজ-নীতির ক্ষেত্রে দুইটি বিবর্ত্তনশীল ধারার আদর্শ ও নিয়মের চরম সূচকরূপে গ্রহণ করা চলে। এমন বাহুল্য ঘটনা দুইটি যথাক্রমে চেকোস্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক শাসন পরিবর্ত্তন এবং ব্রাসেলস্-এ অনুষ্ঠিত বৃটেন, ফ্রান্স ও বেনেলুক্স দেশ কয়টির মধ্যে সম্পাদিত পঞ্চাশবর্ষব্যাপী চুক্তি। অতঃপর ইউরোপ তথা সমগ্র পৃথিবীই যে দুইটি বিভিন্ন শক্তিধারার ব্লকে বিভক্ত হইয়া গেল এবং বহু আশঙ্কিত তৃতীয় মহাযুদ্ধকে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিল, এ বিষয়ে বাস্তববুদ্ধিযুক্ত সন্দেহের অবকাশ কম।

চেকোস্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক বিপ্লব (?) ঘটনা পূর্ব্বতন বামপন্থী গভর্ণমেণ্টকে সরাইয়া কমিউনিষ্ট পার্টির অধিনায়কত্বে

সম্মিলিত বামপন্থী দলের গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চেকো-স্লোভাকিয়ার আসল ব্যাপারটা আজও আমাদের ভারতবাসীর কাছে দুর্বোধ্য রহস্যই রহিয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে বিরুদ্ধ দুইটি শিবিরের পারস্পরিক অভিযোগের ধূম্রজাল ভেদ করিয়া ঘটনার সত্য বিবরণটি আবিষ্কার করিতে মোট কথা কেহই সক্ষম হন নাই। সেই হেতু আমরা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষ দুইটি যে-সব বিবৃতি প্রচার করিয়াছে, সেগুলির মূল অংশ-টুকু মাত্র উপস্থিত করিয়া ক্ষান্ত হইব।

চেকোস্লোভাকিয়া তথা ইয়োরোপের পূর্বখণ্ড-শিবিরের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, তথাকার শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন বিশুদ্ধ গণতন্ত্র-সম্মত উপায় দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। এ ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ নাই। এই সম্পর্কে এই ব্যাপারটাকে যে তিনটার অনুষ্ঠিত 'Cong' এর সহিত তুলনা করা হইতেছে, সেটাও নিতান্ত অহেতুক বিদ্বেষমূলক—কেননা, এই পরিবর্তনের কোন স্তরেই বিদেশী সৈন্যের কোনরূপ ভূমিকা নাই। তা ছাড়া চেকোস্লোভাকিয়ার, শাসন-পরিষদে কমিউনিষ্ট সদস্যরাই ছিল কার্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, তদুপরি এই পরিবর্তনের পূর্বে অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সদস্যগণও কমিউনিষ্টদের সহিত যোগ দিয়াছিল; ফলে পরিষদে সমগ্রভাবে এই নূতন সম্মিলিত দলই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পক্ষান্তরে সোভিয়েট-বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ ইঙ্গ-আমেরিকান শিবির এই বলিয়া প্রত্যাভিযোগ করিতেছে যে, এটা কেবল সত্যকে ঢাকিবার জন্য মিথ্যা ঘটনা। চেক্-পরিষদের ৩০০ জন সদস্যের মধ্যে ১১৪ জন কমিউনিষ্ট সদস্য এবং ৩৯ জন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সদস্য দ্বারা গঠিত নূতন সম্মিলিত দলটি আইনের দিক দিয়া হয় তো সংখ্যাগরিষ্ঠই এবং সেই হিসাবে তাহাদের দ্বারা শাসনযন্ত্র গ্রহণের ব্যাপারকেও গণতন্ত্রসম্মতই বলা যাইতে পারে। কিন্তু শাসনযন্ত্র গ্রহণ করিবার পর যেভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদিগকে উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থাদ্বারা নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইতেছে সেটা কোন্‌দেশী গণতন্ত্র? তদুপরি উক্ত শাসন পরিবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে চেকোস্লোভাকিয়ায় রুশ রাষ্ট্রদূতের আকস্মিক আগমনের ব্যাপারকেই কী ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে? ডঃ মাসারিকের অপ্রত্যাশিত আত্মহত্যারই বা কী কৈফিয়ৎ? বস্তুতঃ চেকোস্লোভাকিয়ার এই রক্তহীন বিপ্লব(?)ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির Cong-এর অবিকল সমধর্মী। সেখানে যে ভাবে কমিউনিষ্টরা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীর সহিত কোয়ালিশন এবং করিয়া শাসনযন্ত্রের অঙ্গে অঙ্গে কমিউনিষ্ট-পন্থী কর্মীদের ঢুকাইয়া দিয়া সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ প্রচার করিয়াছে এবং পরে যে কোনো একটা শাসনসঙ্কট উপস্থিত করিয়া স্থানীয় গভর্নমেন্ট নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়াছে—চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যাপারেও তাহার অবিকল পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।

ব্রাসেল্‌স্-এর চুক্তিটা চেক্ ঘটনার পাল্টা উত্তর। এই চুক্তির ফলে বৃটেন, ফ্রান্স এবং বেনেলুক্স (বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্ এবং লুক্সেম্বার্গ এই দেশ তিনটির নামের আদ্যাক্ষর গাঁথিয়া 'বেনেলুক্স' নামের উৎপত্তি) দেশ কয়টির মধ্যে একটি পঞ্চাশবর্ষ মেয়াদের সন্ধি হইয়াছে। সন্ধির সর্তানুযায়ী মোটামুটি ভাবে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি উক্ত সময়ের মেয়াদ পর্যন্ত পরস্পরকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামরিক প্রায় সকল ব্যাপারেই সাহায্য করিবেন এবং পরামর্শ দিবেন। মার্কিনের ইয়োরোপীয়ান রিকভারি প্রোগ্রাম-এর ব্যয়-বরাদ্দও প্রধানতঃ এই চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হইবে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান্ তাঁহার দেশের তরফ হইতে এই চুক্তিকে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

ব্রাসেল্‌স্-চুক্তির মর্মার্থের মধ্যে তেমন কোনো জটিলতা নাই। এই চুক্তির দ্বারা পূর্বোক্ত দেশ কয়টি প্রায় খোলাখুলি ভাবেই মার্কিন ডলারের অধিনায়কত্বে সোভিয়েট-বিরোধী শিবির গঠন করিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানী ফরিয়াদ

পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষা প্রতিযোগিতায় বাংলাভাষা ও উর্দুভাষার যে ঘোড়-দৌড় সুরু হয়, তাহারই ভিত্তিতে গত ১৫ই মার্চ পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন-সংগ্রাম-পরিষদ এক আপোষ প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন। আপোষ প্রস্তাবের সর্তাবলী নিম্নরূপ ছিল:

(ক) ভাষা-সম্পর্কিত আন্দোলনে যাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই মুক্তি দেওয়া হইবে।

(খ) গত ১১ই মার্চ ঢাকায় পুলিশ জুলুম চালাইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, প্রধানমন্ত্রী সে সম্পর্কে তদন্ত করিয়া একমাসের মধ্যে বিবৃতি দিবেন।

(গ) এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বে-সরকারী প্রস্তাব আলোচনার দিনে এবং বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন

করা হইবে এবং বাংলাভাষাকে উর্দুর সমান মর্য্যাদা দিয়া পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হয়, তজ্জন্য সুপারিশ করা হইবে।

(খ) পূর্ব্ববঙ্গের সংসদীয় ভাষা হিসাবে যাহাতে ইংরাজীর স্থলে বাংলাভাষা গ্রহণ করা হয়, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একটি বিল উত্থাপন করা হইবে এবং বাংলাকে শিক্ষার বাহন বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

(গ) আন্দোলনে যোগদানের অপরাধে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া হইবে না।

(ঘ) সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(ঙ) বিভিন্ন জেলার ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(চ) প্রধানমন্ত্রী যুক্তিতে পারিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের শত্রুদের প্ররোচনায় এই আন্দোলন পরিচালিত হয় নাই।

প্রধানমন্ত্রী ইউনাইটেড্ প্রেস অব ইণ্ডিয়াকে জানান যে, অবিলম্বে এই চুক্তি অনুযায়ী কাজ করা হইবে।

কিন্তু কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই পাকিস্তান-রাষ্ট্রের স্রষ্টা ও অধিনায়ক কায়েদে আজম জিন্না ঢাকা সফরে আসিয়া বাংলাভাষার বিরুদ্ধে বিষাক্ত বিস্ফোরক তুলিয়া পূর্ব্বীয় আত্মস্বরূপকে চমকিত করিয়া দিলেন। ২১শে মার্চ্চ তাঁহার পঞ্চাশ মিনিটকালের এক বক্তৃতায় ভাষা-সম্পর্কিত প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুই হইবে, অন্য কোনো ভাষা হইতেই পারে না।

পাকিস্তানের অধিনায়কের এই উক্তির পর পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, অতঃপর তাঁহার ১৫ই তারিখের স্বাক্ষরিত চুক্তির কতটুকু মূল্য রহিল? প্রাদেশিক ক্ষমতা পরিচালনা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে বানচাল করিয়া গভর্ণর জেনারেলের এই ডিক্টেটরী নীতি প্রয়োগ সম্ভবতঃ একমাত্র পাকিস্তান ডোমিনিয়নেই সম্ভব! সংগ্রাম-পরিষদের নিকট প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আত্মসম্মান রক্ষার অতঃপর খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন, তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

মিঃ কাসিম রেজভীর উক্তি

গত ৩১শে মার্চ্চ ডায়াস-সালোয়ে মজলিসের হেড-কোয়ার্টারে রাজাকরদের এক বিরাট সমাবেশে ইত্তেহাদ-উল-মুসলমিনের সভাপতি মিঃ কাসিম রেজভি বলেন: 'ইস্‌লামিক কর্ত্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত হায়দরাবাদের মুসলমানদের উদ্যুক্ত তরবারি কোষবদ্ধ করা চলিবে না।' 'হায়দরাবাদ অন্তরীক্ষ' সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে মিঃ রেজভি এই বক্তৃতা দেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি এ কথাও ঘোষণা করেন যে, রাজাকরেরা সম্পূর্ণ সশস্ত্র, যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত। ভাগ্য বিষয়টা সমাবেশের হুমকির সুরে ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়া রেজভি সাহেব ইত্তেহাদ-উল-মুসলেমিন সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয়টি ভুমায়ুন-রূপের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

কৌতূহলবশতঃ তাঁহার বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। তিনি এই বলিয়া বিষোদ্গার তুলিয়াছেন যে—'হায়দরাবাদ ঐস্‌লামিক রাষ্ট্র। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান এই মুস্‌লিম রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের চেষ্টা চালাইতেছে। স্মরণ রাখিবেন, ভারতীয় ডোমিনিয়নের সাতে চারিকোটি মুসলমান নর-নারী ইস্‌লামের নিশান উড়াইবার জন্য হায়দরাবাদের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। এই মুস্‌লিম রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য হয়ত আমাদের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং আমার মনে হয়, তাহা বেশী দূরে নহে। সহস্র বৎসর পরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র দেশশাসন ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। শাসনকার্য্য পরিচালন-ক্ষমতা তাঁহাদের মোটেই নাই। এই কারণে তাঁহারা মুসলমানদের নিকট রাজ্য হারাইয়াছিলেন। ক্ষমতালাভের পর তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, চোখ রাঙাইয়া ও হুমকি দিয়া তাঁহারা আমাদের দাবাইয়া রাখিতে পারিবেন। স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যে আগুন স্বয়ং প্রজ্বলিত করিবে, তাহাতে তাহারা জ্বলে হইবে, হিন্দু শাসন, হিন্দুপ্রাধান্য হিন্দুসাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। হিন্দুসাম্রাজ্য বলিতে কোনোকালে কিছু ছিলনা। খোদার ফজলে, ভবিষ্যতেও তাহা সম্ভব হইবে না।'

অবিলম্বে রেজভি সাহেবের এই উক্তিতে সম্ভবতঃ নিজাম সাহেব তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া সাধুবাদ দিতে শতমুখ হইয়া উঠিবেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত হায়দরাবাদ একবৎসরের স্থিতাবস্থাচুক্তিতে আসিয়া সম্প্রতি পরোক্ষে একি আগুন ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন? আমরা মিঃ রেজভীর এই উক্তি সম্পর্কে নিজামবাহাদুরের নিকট হইতেই ইহার স্পষ্ট জবাব চাই।

তারা দু'টী

শিল্পী—শ্রীমুকুন্দ মজুমদার

"ত্বমীস্বরী ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত

পঞ্চদশ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৫ | ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার সমসাময়িক নাট্য-সমালোচনা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১২৮৪ সালে স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ভারতী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তখন নাট্যকার এবং অভিনেতারূপে বাঙ্গালা দেশে যশ লাভ করিয়াছেন। সে-সময়কার 'ভারতী' পত্রিকা যাঁহাদের রচনা-সম্ভারে ঐশ্বর্য্যশালী হইত তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১২৮৮ সালের 'ভারতী' পত্রের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় গিরিশ বাবুর পাঁচখানি বইয়ের সমালোচনা ক্রমে বাহির হইয়াছিল। সেই বই পাঁচখানা হইতেছে—(১) রাবণবধ দৃশ্যকাব্য, (২) অভিমন্যু বধ, (৩) আনন্দ রহো, (ভারতী ফাঃ ১২৮৮) (৪) সীতার বনবাস, (৫) লক্ষ্মণবর্জ্জন। 'ভারতী'র মাঘ সংখ্যার সংক্ষিপ্ত সমালোচনার মধ্যে রাবণবধ দৃশ্যকাব্য এবং অভিমন্যু বধ দৃশ্যকাব্যের সমালোচনা আছে। এই সমালোচনা বাঙ্গলা সন ১২৮৮ এবং ইংরাজী ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমালোচক এই গ্রন্থ দুইখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন :—"সেদিন আমরা একখানি বাঙ্গলা কবিতা-গ্রন্থে দেখিতেছিলাম, সীতাদেবীকে বনবাস দিয়া লক্ষ্মণ যখন চলিয়া আসিতেছেন, তখন সীতাদেবী সকাতরে তাঁহাকে একটু দাঁড়াইবার জন্য এই বলিয়া মিনতি করিতেছেন—

"লক্ষ্মণ দেবর কেন যাওয়া যাওয়ি যাও রে
তোমার দাদার কিরে বারেক দাঁড়াওরে।"

এমন কি, মাইকেলও তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে শূরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণদেবকে কি রঙ্গে আঁকিয়াছেন। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে, যে-লক্ষ্মণকে আমরা রামায়ণে শৌর্য্যের আদর্শস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম,—যে-লক্ষ্মণকে আমরা কেবলমাত্র ভ্রাতৃস্নেহ ও নিঃস্বার্থ উদারতা ও বিক্রম বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছি, সেই লক্ষ্মণকে মেঘনাদবধ কাব্যে একজন ভীরু স্বার্থপর—"গোঁয়ার" মাত্র দেখিলে আমাদের বুকে কি আঘাতই লাগে! কেনই বা তা হইবে না? কল্পনার আদর্শভূত একটি পশু-পক্ষীরও একগাছি লোমের হানি করিলেও আমাদের সহ্য হয় না।

সুখের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র আমাদের প্রাণে সে আঘাত দেন নাই। কি তাঁহার অভিমন্যুবধ, আর কি তাঁহার রাবণবধ—এই উভয় নাটকেই তিনি রামায়ণের ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিত্র অতি সুন্দররূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ইহা সামান্য সুখ্যাতির কথা নহে। এখনও কল্পনার মধ্যে সূর্য্যের আলোক ও প্রবেশই করিতে পারে না, কিন্তু এখনও স্ফটিকে শুদ্ধ যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে এমন নয়, তাহার স্ফটিকাভ্যন্তরে সেই কিরণ সহস্র বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া সূর্য্যের মহিমা ও স্ফটিকের স্বচ্ছতা প্রচার করে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বাবুর কল্পনা সেই স্ফটিক-খণ্ড এবং তাঁহার অভিমন্যুবধ ও রাবণবধ প্রকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতিফলিত রশ্মিপুঞ্জ। অভিমন্যুর নাম উচ্চারণ হইলেই আমাদের মনে যে ভাব উদয় হয়, অভিমন্যুবধ কাব্য পড়িয়া সেভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, বরং সে ভাব আরও উজ্জ্বলতর রূপে ফুটিয়া উঠে।

অভিমন্যু বিশ্ববিজয়ী অর্জ্জুন ও বীরাঙ্গনা সুভদ্রার সন্তান, তাঁহার তেজস্বিতা ত থাকিবেই, অথচ অভিমন্যুর কথা মনে আসিলেই সূর্য্যের কথা মনে আসে না, কারণ তাহা বলিলেই কেবল প্রখর তীব্র তেজোরাশির সমষ্টি বুঝায়—কিন্তু অভিমন্যুর সঙ্গে যেমন একটি সুকুমার সুন্দর সুখের ভাব ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযোজিত আছে যে, তাহার জন্য অভিমন্যুকে মনে পড়িলেই চন্দ্রের কথা মনে হওয়া উচিত, কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, কারণ চন্দ্রের তেজস্বিতা ত কিছুই নাই। সেই জন্য অভিমন্যুকে আমরা চন্দ্র-সূর্য্য-মিশ্রিত একটি অপরূপ সামগ্রী বলিয়াই মনে করি। অভিমন্যুবধের অভিমন্যু আমাদের সেই মহাভারতের অভিমন্যু—সেই কল্পনার আদর্শীভূত অভিমন্যু। এই বঙ্গীয় নাটকখানিতে যেখানেই আমরা অভিমন্যুকে পাইয়াছি—কি উত্তরার সঙ্গে প্রেমালাপে, কি সুভদ্রার সঙ্গে স্নেহবিনিময়ে, কি সপ্ত-রথীর দুর্ভেদ্য ব্যূহমধ্যে বীরকার্য্য সাধনে,—সকল স্থানেই এই নাটকের অভিমন্যু প্রকৃত অভিমন্যুই হইয়াছে। বলিতে কি, মহাভারতের সকল অভিনেতাই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের হস্তে যেরূপ সুচারুরূপে, ঠিক সেইরূপ সুচারুরূপে প্রাণত্যাগ করে নাই। ব্যাসদেবের কথা অনুসারে, যাহার যখন মৃত্যু আবশ্যক, গিরিশবাবু তাহাই করিয়াছেন। মাইকেল মহাশয় যেমন অকারণে লক্ষ্মণকে অসময়ে মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে মারিয়াছেন, অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্মণের বধে সাধন করিয়াছেন, গিরিশবাবু অভিমন্যুকে, কি অর্জ্জুনকে, কি কৃষ্ণকে কোথাও সেরূপ হত্যা করেন নাই—ইহা তাঁহার বিশেষ গৌরব। তাঁহার আরও গৌরবের কথা বলিতে বাকী আছে। তাঁহার কল্পনার পরিচয় দিতে আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেছি। স্বপ্নদেবীর সঙ্গে রজনীর যে আলাপ আছে, তাহা আমাদের অত্যন্ত প্রীতিকর বোধ হইয়াছে, এবং রোহিণীও আমাদের প্রিয়সখী হইয়া পড়িয়াছেন। স্বপ্ন ও তদীয় সঙ্গিনীগণের স্থানে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তবে দোষ দেখাইয়া দেওয়া সমালোচকদের কর্ত্তব্য ভাবিয়াই বলিতে হইল যে, নাটকের রাক্ষস-রাক্ষসীদের কথাগুলিতে "বেণীসংহারের" কথা আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু তাহা মনে পড়িলেও আমরা একথা বলিতে সঙ্কুচিত হইব না যে, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র একজন প্রকৃত কবি—একজন প্রকৃত ভাবুক। তাঁহার রাবণবধে যদিও রাম-লক্ষ্মণের প্রকৃতি বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয় নাই, তবুও তাঁহার রাবণ, মন্দোদরী এমন জীবন্ত হইয়াছে যে, সেইজন্যই রাবণবধ নাটকখানি এত প্রীতিকর লাগে। রাবণের মহান্ বীরত্ব ও মন্দোদরীর কবিত্বময় তেজস্বিতা এত পরিস্ফুটরূপে রাবণবধ নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে যে তাহার উপরে আমাদের একটি কথা কহিবার আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ দেবী আরাধনা ও দেবীস্তোত্রগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। কেবল মৃত্যুবাণ আনয়ন ঘটনাটি ও সেইস্থানের বর্ণনাটি আমাদের ঠিক মনঃপূত হয় নাই। আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া ছন্দের উদ্ভব প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ

বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।"

আনন্দ রহো—ঐতিহাসিক নাটক।

এইবার আমরা গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক 'আনন্দ রহো' সম্বন্ধে যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। এমনতর মাথামুণ্ড-বিরহিত নাটক আমরা কখনও দেখি নাই। ইহাতে না আছে শৃঙ্খলা, না আছে অর্থ, না আছে ভাব, না আছে একটা পরিষ্কার উপন্যাস। লেখকের কল্পনা, লাগাম খুলিয়া লইয়া, এই ৭৭ পৃষ্ঠার মধ্যে উনপঞ্চাশ বায়ুর দৌড়াদৌড় করাইয়াছেন। গিরিশ-বাবুর লেখায় আমরা এরূপ অরাজকতা আশা করি নাই।"

'আনন্দ রহো' নাটকের পরেই 'সীতার বনবাস' ও 'লক্ষ্মণ বর্জ্জন' নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

সীতার বনবাস। দৃশ্যকাব্য। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১এক টাকা।

লক্ষ্মণবর্জ্জন। দৃশ্যকাব্য শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা।

গিরিশবাবুর রচিত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যগুলিতে তাঁহার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিষয়গুলির সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব কবির ন্যায় বুঝিয়াছেন ও তাহা অনেক স্থলে কবির ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। সীতার বনবাসে লক্ষ্মণের বীরত্বই যথার্থ বীরত্ব। রাম যে কর্ত্তব্যজ্ঞানের ভরসাতে অভিভূত হইয়া সীতাকে বনবাসে দিতে পারিয়াছেন, লক্ষ্মণের নিকট সে কর্ত্তব্যজ্ঞান নিতান্ত লঘু। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে যে নির্দ্দোষী সীতাকেও বনবাসে দিতে হইবে, ইহার কর্ত্তব্যতা লক্ষ্মণ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তবুও সেই সীতাকে বনবাসে দিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। রাম ত' আজ্ঞামাত্র দিয়া গৃহের মধ্যে লুকায়িত হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ স্বহস্তে সেই সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিলেন। সীতার বনবাসে রামকে নায়ক না করিয়া লক্ষ্মণকে নায়ক করিলে একটি অতি মহান্ চিত্র অঙ্কিত করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সীতা-বিসর্জ্জন আমাদের সমালোচ্য দৃশ্যকাব্যের এক অংশ মাত্র, উহাই সমস্ত নহে; সুতরাং সীতা-বিসর্জ্জনের মধ্যে যতটা কবিত্ব আছে, তাহা ইহাতে পূর্ণ পায় নাই। সীতা-বর্জ্জন ব্যাপারে রামের বাহ্য ঘটনার সহিত হৃদয়ের দ্বন্দ্ব, কর্ত্তব্যজ্ঞানের সহিত অনুরাগের সংগ্রাম; লক্ষ্মণের কর্ত্তব্যের সহিত কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনৈক্য, করুণার সহিত নিষ্ঠুরতার অন্তর্দ্বন্দ্ব সংবাদ; সীতার জীবনের সহিত মরণের তর্ক-বিতর্ক অর্থাৎ মরণের প্রতি অনুরাগের ও জীবনের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানের সংঘর্ষ,—এই যে-সকল দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব ও কর্ত্তব্যের সহিত হৃদয়ের সংগ্রাম আছে, তাহা এই দৃশ্যকাব্যে পরিস্ফুট হয় নাই। যতগুলি ঘটনা লইয়া এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে, তাহা একটি ক্ষুদ্রায়তন দৃশ্যকাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট ভাবে বর্ণিত হইতে পারে না, ইহাতে সমস্তটার একটি ছায়া মাত্র পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতে কবিত্বের অভাব নাই। সীতা-বর্জ্জনের ভার লক্ষ্মণের প্রতি অর্পিত হইলে লক্ষ্মণ রামকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর। যদিও বনবাসের পর সীতার বিলাপ সংক্ষেপ ও মর্ম্মভেদী হয় নাই, দীর্ঘ ও অগভীর হইয়াছে, তথাপি সীতার শেষ প্রার্থনাটি অতি মনোহর হইয়াছে। যখন পৃথিবীতে জীবনের কোন বন্ধন নাই, অথচ জীবন রক্ষা করিবা, তখন দেবতার কাছে এই প্রার্থনা করা, সন্তান বাৎসল্য ভিক্ষা করা,—

"জগৎ মাতা,
শিখাও গো দুহিতারে জননীর প্রেম।
ছিন্ন অঙ্গ তুমি,
প্রেমেশ্বরী বেশ না সংসারে?
তবে, কে অভাগা এসেছে জঠরে?"

অতি সুন্দর হইয়াছে।

"যবে গভীরা যামিনী, বসি দ্বারে।
শিশু দুটি ঘুমায় কুটিরে,
চাঁদপানে চাহি কাঁদি সই,
চাঁদ মুখ পড়ে মনে।"

এই সরল কথায় সীতার যেন একটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। অধিক উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই, উদ্ধৃত করিলাম না।

লক্ষ্মণবর্জ্জন বিষয়টি অতি মহান্, কিন্তু তাহা দৃশ্যকাব্য রচনার উপযোগী কিনা সন্দেহ। লেখক রাম-চরিত্রের

অর্থ, রামচরিত্রের মর্ম ইহাতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। রামের সমস্ত কার্য্য, সমস্ত বীরত্ব-কাহিনীকে তিনি দুইটি অক্ষরে পরিণত করিয়াছেন। সে দুইটি অক্ষর—প্রেম। এই সংক্ষেপ মুক্তকাব্যখানিতে লেখক একটি মহাকাব্যের রেখাপাত মাত্র করিয়াছেন। ইহাতে লক্ষ্মণের মহত্ত্ব অতি সুন্দর হইয়াছে। কবি যাহা বলেন, তাহার মর্ম এই যে, বীরত্ব মানব গুণ স্বাবলম্বী গুণ নহে, উহা পরমুখাপেক্ষী গুণ। যেখানে বীরত্ব দেখা যাইবে, সেইখানেই দেখিতে হইবে, সে বীরত্ব কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সে বীরত্বের বীরত্ব কি লইয়া। কেহ কত মানুষ খুন করিয়াছে তাহা লইয়া বীরত্ব বিচার করা উচিত নহে, কাহাকে কিসে বীর করিয়া তুলিয়াছে, তাহাই লইয়া বীরত্বের বিচার। কেহ বা আত্মরক্ষার জন্য বীর, কেহ বা পরের প্রাণ রক্ষার জন্য বীর। জননী সন্তান-স্নেহের জন্য বীর, দেশহিতৈষী স্বদেশ-প্রেমে বীর। তেমনি লক্ষ্মণও বীর বলিয়াই বীর নহেন, তিনি বীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিসে তাঁহাকে বীর করিয়া তুলিয়াছিল? প্রেমে। রামের প্রেমে। অনেকে প্রেমকে হৃদয়ের দুর্বলতা বলেন, কিন্তু সেই প্রেমের বলেই লক্ষ্মণ বীর। যখন সীতার অনুরোধে রাম লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিলেন, তখন লক্ষ্মণ কহিলেন,—

"সেবা মম পূর্ণ এত দিনে,
আত্ম-বিসর্জনে পূজা করি সম্পূরণ!
ত্যাগ শিক্ষা মোরে শিখাইলা ভগবান,
করি আপনা বঞ্চন,
রঘুমণি,
সেই প্রেম ধরি, সেই প্রেমবলে,
তিনি অবহেলে পুরন্দর-জয়ী অরি,
পশু আমি লঙ্ঘিনু সুমেরু।
সেই প্রেমবলে
না টলিনু শক্তি-শেল হেরি,
উচ্চ হৃদে পেতে নিনু শেল
রাম-প্রেমে পেলে পাইনু ত্রাণ।"

রাম ও লক্ষ্মণ, হিংসা, ঘৃণা, যশোলিপ্সা বা দুরাকাঙ্ক্ষার বলে বীর নহেন, তাঁহারা প্রেমের বলে বীর। তাঁহাদের বীরত্ব সর্বোচ্চ শ্রেণীর বীরত্ব। এই মহান্ ভাব এই সংক্ষেপ মুক্তকাব্যখানির মধ্যে নিহিত আছে।"

গিরিশচন্দ্রের এই নাটক কয়খানির "ভারতী" পত্রে কে সমালোচনা করিলেন, সে বিষয়ে একটা কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। অনেকে মনে করেন—সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরিশচন্দ্রের নাটকের সমালোচনা করিয়াছিলেন। 'ভারতীর নাটামক'-'প্রণেতা—নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস লেখক ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তৎপ্রণীত গ্রন্থের ৯১৫ পৃষ্ঠায় এই সব সমালোচনা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া—গিরিশ বাবুর ছন্দ সম্বন্ধে 'ভারতী'তে প্রকাশিত মন্তব্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, গিরিশচন্দ্রের এই নাটক কয়খানির সমালোচনা করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ বিষয়ে আমাদের যুক্তি এই যে—রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ কালে মাত্র কুড়ি বৎসর-বয়স্ক, তরুণ হইলেও 'ভারতী' পত্রে প্রবন্ধ, কবিতা, গান, অনুবাদ এবং গ্রন্থ সমালোচনা করিতেন। কিন্তু কোনও কবিতা, প্রবন্ধ ও সমালোচনার নীচে নাম প্রকাশ করিতেন না। সে কালের মাসিক ও সাময়িক পত্রিকার ইহাই ছিল রীতি। ১২৮৮ সালের 'ভারতী' পত্রের কার্তিক সংখ্যা হইতে রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস, তাঁহার কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা যেমন—পরাজয়-সঙ্গীত এবং সম্পাদকের বৈঠকে হুইটম্যান, রোসেটি, মেথু আর্নল্ড, হুয়ার্ট মুকানন্, শেলি প্রভৃতি খ্যাতনামা বিদেশী কবিগণের কবিতার অনুবাদ দেখিতে পাইবেন। এই কবিতাগুলি যে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ তাহা সকলেই জানা আছেন। তাঁহার গান সমাপন, কবিতা-সাধনা, গান, অনুগ্রহ, মহাস্বপ্ন, সম্রাট-সঙ্গীত, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রভৃতি কবিতা, সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু লেখকের নাম কোথাও নাই। বিবিধ প্রসঙ্গের অনেক প্রসঙ্গই রবীন্দ্রনাথের লিখিত। পরবর্তী কালে 'সাধনায়' প্রসঙ্গ কথা হইতেও জানা যায়। আর একটা বিষয়ও এখানে উল্লেখযোগ্য যে—রবীন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই ছিলেন নাট্যানুরাগী, কাজেই নাটক ও কবিতার বই সমালোচনার ভার ছিল তাঁহারই হাতে। বাঙলা শিশু-

শিল্পী—শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যের মাসিক পত্রিকা 'বালক' সম্বন্ধে এবং উহার সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পর্কে সবিশেষ জানিবার জন্য শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরীকে পত্র লিখিলে তিনি আমার পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন—

"যার নাম সম্পাদিকা হিসাবে থাকিলেও বালক সম্পর্কিত প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প যাহা কিছু সমুদয়ই রবি কাকা করিতেন।" পুরাণো 'বালক' পত্র দেখিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। অতএব আমাদের মনে হয়—গিরিশ বাবুর নাটকের সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁহার তরুণ মন সেকালেই গিরিশচন্দ্রের ছন্দ, নাটকীয় প্রতিভা এবং তিনি যে একজন প্রকৃত কবি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া রবীন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারিয়াছিলেন।

আমাদের মনে হয়, নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক তত্ত্বের হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবেন। আমার এ বিষয়ে যেরূপ মনে হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিলাম। আমার নিকট ১২৮৮ সালের যে ভারতী-পত্রিকাখানি আছে, তাহাতে সূচী নাই, কাজেই সেদিক দিয়াও হয়ত ভুল হওয়া অসম্ভব নহে।

কলম্বাসের আবিষ্কার

মূল লেখক—ইলিয়া ইলফ ও ইউজীন পেট্রোভ অনুবাদক—শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

"ঐ স্থল। ঐ স্থল দেখা যাচ্ছে।" মাস্তুলের সমান উঁচু জায়গায় বসে থাকতে থাকতে একজন নাবিক আনন্দে চীৎকার করে উঠল।

দুইপায় কলম্বাসের উৎকণ্ঠা এবং অনিশ্চয়তাপূর্ণ দুঃসাধ্য অভিযান শেষ হল। অবশেষে স্থলভাগ দেখা গেল। জাহাজে বসে কলম্বাস একটা ছোট দূরবীক্ষণ-যন্ত্র তুলে ধরল।

"আমি একটা বিশাল পর্বতমালা দেখতে পাচ্ছি—" সে তার সঙ্গীদের বলল। কিন্তু কি আশ্চর্য! এতে জানালা নেই বলে মনে হচ্ছে। এই আমি প্রথম জানালাযুক্ত পর্বতমালা দেখলাম।"

"একটা নৌকায় অধিবাসীরা আসছে—" একজন উচ্চৈঃস্বরে বলল।

পালকওলা টুপি নেড়ে এবং চিলা জামার লম্বা ঝুলটাকে পিছনে ফেলে পর্যটনকারীরা তাড়াতাড়ি জাহাজের সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

অদ্ভুত ধরণের সবুজ রঙের পোশাক-পরা দু'জন অধিবাসী জাহাজের ওপর উঠে এল এবং নিঃশব্দে কলম্বাসের হাতে একটা বড় বাদাম এগিয়ে দিল।

"আমি তোমাদের দেশ আবিষ্কার করতে চাই।" কলম্বাস সম্পর্কে বলল। স্পেনদেশের রাণী ইজাবেলার নামে শপথ করে বলছি যে, এই দেশের অধিকার···

"তাতে কি আসে যায়? আগে এই প্রশ্নগুলির জবাব দাও।" একজন অধিবাসী বিরক্তভাবে বলল।··

"তোমার নাম, পদবী শেষ এবং তুমি কোন জাতি, বিবাহিত কি না, চোখের কোনও অসুখ আছে কি না বল, আর আমেরিকার সভ্যমেন্টের ব্যবস্থাকে উল্টে দেবার কোনও ষড়যন্ত্র করছ কি না তাও জানাও এবং তুমি একজন মূর্খ কি না বল।"

কলম্বাস তার তরবারিটা বার করবার জন্য হাত বাড়াল। কিন্তু নিজে মূর্খ নয় বলেই মনে মনে প্রশমিত হল।

"আমরা এখানকার অধিবাসীদের ধার ধারি না।" সে তার সঙ্গীদের বলল। অধিবাসীরা নিশ্চয়ই সভ্য। তাই মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে অদ্ভুত আচার-ব্যবহার দেখা যায়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি এ কথা বলছি।"

"তোমার কাছে কি ফিরে যাবার টিকিট এবং পাঁচশ ডলার মুদ্রা আছে?" একজন অধিবাসী প্রশ্ন করল।

"ডলার কি জিনিষ?" হতবুদ্ধি হয়ে নাবিক-প্রবর জিজ্ঞাসা করল।

"এই প্রশ্নপত্রের উত্তরে বললে যে, তুমি মূর্খ নও, তবে কেন আবার বলছ—ডলার কি জিনিষ জান না? তাহলে তুমি এখানে কি করবে মতলব করেছ?"

"আমি আমেরিকা আবিষ্কার করব।"

"তোমার কি কিছু প্রচার দরকার?"

"প্রচার? এরকম কথা এই প্রথম শুনছি।"

লোকটি কলম্বাসের আপাদমস্তক ধীরে ধীরে নিরীক্ষণ করল এবং অবশেষে বলল, "প্রচার কাকে বলে তুমি জান না?"

"কই না ত।"

"অথচ তুমিই আমেরিকা আবিষ্কারের মতলব করেছ? আমি আর শুধু শুধু তোমার কাছে থাকব না, মিঃ কলম্বাস?"

"কেন? তুমি কি মনে কর যে, এই সমুদ্র ও উর্বর দেশ আবিষ্কার করা আমার সাধ্য নয়?" ভ্রূকুঞ্চিত করে জেনোয়াবাসী প্রশ্ন করল।"

কিন্তু লোকটি তখন হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে সরে গেছে এবং আপন মনে অস্পষ্ট ভাবে বলছে, "প্রচার ছাড়া উন্নতি নেই!"

ইতিমধ্যে জাহাজগুলো পোতাশ্রয়ের ভেতর এসে ঢুকল। এই অঞ্চলে শরৎকাল অতীব রমণীয়। সূর্য কিরণ দিচ্ছে এবং সামুদ্রিক হাঁসগুলো জাহাজের পিছন দিকে চক্রাকারে ঘুরছে, নতুন দেশে পদার্পণ করে কলম্বাস গভীর ভাবে বিচলিত হল। তার একহাতে মালায় জামায় ঐকটা ছোট মোড়ক রয়েছে···যার বিনিময়ে সে সোণা এবং হাতীর দাঁত লাভ করবার মতলব করেছে। তার অপর হাতে স্পেন দেশের একটা পতাকা। কলম্বাস যেদিকেই তাকাল কোথাও তার সুপরিচিত ইউরোপের প্রশান্ত

মূর্তির বা তার মাটি, ঘাস ও গাছের সামান্য মাত্রও দৃষ্টি-গোচর হল না। এখানে কেবল ইট-পাথর, সুরকী, সিমেণ্ট আর ইস্পাত-লোহা ভিন্ন কিছুই নেই।

অধিবাসীদের একটা বড় জনতা পেন্সিল, নোট-বই, ক্যামেরা নিয়ে তাকে ছাড়িয়ে ছুটে গেল। তারা একজন খাঁটিনমো মুষ্টিযোদ্ধাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—যে সবে মাত্র একটা জাহাজ থেকে নেমে এসেছে। সেই ভদ্রলোকের কান দুটো খাড়া এবং গলাটা অস্বাভাবিক রকমের মোটা। কলম্বাসের দিকে তারা কেউ ফিরে তাকাল না, কেবল মাত্র মুখে রঙ-মাখা স্থানীয় দু'জন স্ত্রীলোক তার কাছে এগিয়ে এল।

"পতাকা হাতে ঐ অদ্ভুত লোকটি কে?" একজন প্রশ্ন করল।

"মনে হয়, স্পেনের কোনও রেস্তোরাঁর বিজ্ঞাপন" অপর স্ত্রীলোকটি বলল।

তারপর তারাও তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে লম্বা কানওলা ভদ্রলোকের দিকে তাকাল।

আমেরিকার মাটিতে কলম্বাসের পতাকা স্থাপন করা সফল হল না। প্রথমেই তাকে একটা ফাঁকা কুচকাওয়াজ দেখাতে হল। তরবারিটা ভেঙ্গে না যাওয়া পর্য্যন্ত সে সেটা রাস্তায় ঠুকতে লাগল। তারপর তাকে সেই ভারী ও স্বর্ণখচিত পতাকা বয়ে নিয়ে ঘুরতে হল। সৌভাগ্যক্রমে মালার ঘানাগুলো তাকে বইতে হয়নি, কারণ কর না দেওয়ার জন্য সেগুলো শুল্কবিভাগ থেকে আগেই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে।

এখানে শতসহস্র লোক নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাটির নীচে ডুব দিচ্ছে, খাচ্ছে, পান করছে এবং ব্যবসা করে চলেছে, কেউই ধরা পড়েছে বলে সন্দেহ করছে না।

কলম্বাস বিরক্ত হয়ে ভাবল,"আমি অজস্র অর্থব্যয় করে কটিকা-সঙ্কুল মহাসমুদ্র পার হয়ে, জীবনকে পর্য্যন্ত বিপন্ন করে অভিযান চালালাম, আর আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।"

সকরুণ মুখে সে একজন অধিবাসীর দিকে এগিয়ে গেল এবং সগর্ব্বে বলল: "আমি খৃষ্টোফার কলম্বাস।"

"কি বলছ তুমি?"

"খৃষ্টোফার কলম্বাস।"

"গানান কর" অধীর হয়ে লোকটি বলল।

কলম্বাস গানান করল।

"অস্পষ্টভাবে আমার স্মরণ হচ্ছে বলে মনে হয়। লোকটি বলল."হালকা যন্ত্রপাতির ব্যবসা কর নাকি?"

"আমি আমেরিকা আবিষ্কার করেছি—" কলম্বাস ধীরে ধীরে বলল।

"বল কি? কবে থেকে?"

"এই এখন, প্রায় পাঁচ মিনিট আগে।"

"বেশ মজার ব্যাপার ত। এখন ঠিক করে বল ত মিঃ কলম্বাস, কি তোমার চাই?"

"আমার মনে হয়," যথাসাধ্য সবিনয়ে বলল, "এতে আমার কিছুটা খ্যাতি লাভ হবে।"

"কিন্তু জাহাজ-ঘাটায় তোমার সঙ্গে কারও দেখা হয়েছে কি?"

"একটি প্রাণিও না। অধিবাসীরা আদৌ জানতে পারেনি যে আমি আবিষ্কার করতে এসেছি।"

"তোমার তাদের খবর পাঠান উচিত ছিল। কেউ আবার এমন কাজ করে? তুমি যখন একটা নতুন দেশ আবিষ্কার করতে যাচ্ছ, তখন সবার আগেই ত একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে, গোটা দুই মজার গল্প বানিয়ে সংবাদ-দাতাদের হাতে দেবে, আর পত্রদানের ছবি তুলে তৈরী রেখে দেবে। নইলে তোমার কিছুই হবে না। যতই কর প্রচার তোমার আগে চাই-ই।"

"প্রচার। এই নিয়ে দু'বার আমি এমন অদ্ভুত কথা শুনলাম। কিন্তু কথাটার অর্থ কি? এটা কি একটা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না পৌত্তলিকদের যজ্ঞ?"

লোকটি সকরুণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকাল।

"ছেলেমানুষি ক'রো না," সে বলল। "প্রচার প্রচারই মিঃ কলম্বাস। তোমার জন্য তার কিছুটা করতে চেষ্টা করব। সত্যিই তোমাকে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে।"

কলম্বাসকে সে একটা হোটেলে নিয়ে গেল এবং পঞ্চত্রিংশতলায় তার জন্য একটা ঘর ঠিক করে দিল। তার পর আরও কিছু করা যায় কিনা তার চেষ্টা করবে—

এই আশ্বাস দিয়ে তাকে একলা সেই ঘরে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

আধঘণ্টা পরে ঘরজোড়া খুলে গেল এবং সেই লোকটি আরও দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল। তাদের মধ্যে একজন সর্বসময়েই কি যেন একটা চিবিয়ে চলেছে। অপর জন একটা তেপায়া নিয়ে এসে তার ওপর একটা ক্যামেরা রাখল এবং বলল :

"এবার আর হাস। জোরে হাস! বুঝতে পারছ না? বেশ, তাহলে আমি যে রকম করছি তুমিও তাই করতে থাক, হাঃ-হাঃ-হাঃ!" তারপর সেই আলোকচিত্রকর না হেসেই দাঁত বার করল এবং মুখ বিকৃত করল।

খৃষ্টফার কলম্বাসের হাড় নিথিল হল এবং সে পাগলের মত হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আলোর একটা ঝিলিক খেলে গেল, ক্যামেরার 'টিক্' শব্দ হল এবং আলোকচিত্রকর বলল—'ধন্যবাদ'।

এইবার অপর লোকটি কলম্বাসকে নিয়ে পড়ল। চর্বণ করতে করতেই সে একটা পেন্সিল বার করল এবং বলল।

"তোমার নাম?"

"কলম্বাস"।

"বানান কর। ক-ল-ম-ব-এ-স-আকার ব-স্ব'-স?"বেশ ভাল। তোমার নামটা যাতে অন্য কারও নামের সঙ্গে গুলিয়ে না যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। কতদিন হল তুমি আমেরিকা আবিষ্কার করেছ মিঃ কোল্‌ম্যান্? আজ? ভাল ভাল। আমেরিকা তোমার কেমন লাগছে বল ত?"

'এই ঊর্বর দেশটাকে পুরোপুরি দেখবার সৌভাগ্য এখনও আমার হয়নি, বুঝলে।"

সংবাদদাতা চিন্তামগ্ন হয়ে বলে রইল।

"তা হ'লে? আচ্ছা বল দেখি মিঃ কোল্‌ম্যান্ নিউ-ইয়র্কের কোন্ চারটে জিনিষ তোমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে?"

"তাই ত বলা বড় শক্ত"—

সংবাদদাতা আবার চিন্তা-নিমগ্ন হল। সে দুষ্টিযোদ্ধা ও চলচ্চিত্র-অভিনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অভ্যস্ত। কলম্বাসের মত নিশ্চল এবং মূক লোককে নিয়ে কাজ করা তার পক্ষে দুরূহ হল। অবশেষে সে তাকে আর একবার যাচাই করে দেখবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল এবং অদ্ভুত ধরণের একটা প্রশ্ন উপস্থাপিত করল :

"মিঃ কলম্বাস, তুমি কি বলতে পার কোন্ দুটো জিনিষ তোমার একেবারে পছন্দ হয়নি।"

কলম্বাস একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। কখনও সে এমন উভয়-সঙ্কটে পড়েনি। কপালের ঘাম মুছে সে সভয়ে তার অধিবাসী বন্ধুর দিকে তাকাল।

"হয়ত আমরা প্রচার ছাড়াও চলতে পারি?"

'তুমি পাগল হয়েছ' সমর অধিবাসী বলল "তুমি যে আমেরিকা আবিষ্কার করলে তার কোন মানেই হবে না যদি আমেরিকা তোমায় আবিষ্কার না করে।

সংবাদদাতা অনেক কিছু চিন্তা করবার পর এই প্রশ্ন উত্থাপন করল :

"আমেরিকার মেয়েদের তোমার কেমন লাগে?"

কোনও জবাবের প্রতীক্ষা না করে সে তাড়াতাড়ি লিখতে আরম্ভ করল। কখনও বা সে আধপোড়া সিগারেটটা মুখ থেকে বার করে কানের পাশে আটকে রাখল। কোন সময় পেন্সিলটা মুখের ভেতর পুরে দিয়ে চেহারার জন্য ওপর দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর আবার লিখে চলল। লেখা শেষ হবার পর সে বলল—ঠিক হয়েছে এবং মহমলের পোষাকপরা বিরূঢ় কলম্বাসের পিঠে একটা মৃদু চপেটাঘাত করে তার করমর্দন করল।

"বেশ, এখন সবই সুন্দর দেখাচ্ছে", দয়ালু অধিবাসী বলল। "চল, সহরের ভেতর দিকে একটু বেড়িয়ে আসা যাক। তুমি যখন এই দেশকে আবিষ্কার করেছ তখন এটা তোমার ভালভাবে দেখে নেওয়া দরকার। কিন্তু এই পতাকা হাতে তোমার 'ব্রডওয়েতে' যাওয়া হবে না। ওটা বরং রেখে দিয়ে যাও।"

'ব্রডওয়ের' ভেতর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে তারা পঞ্চত্রিংশ সেন্ট (বেড়টাকা) প্রবেশমূল্যের একটা 'রঙ্গ-শালায়' এসে ঢুকল। সেখান থেকে খৃষ্টফার আগুনে বলদানো বেড়ালের মত বেরিয়ে পালাল। রাস্তার ওপর

দিয়ে দৌড়াবার সময় সে সামনের লোকদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সজোরে প্রার্থনা করতে করতে চলল।

ঘরে এসে পৌঁছবার পর সে নিজেকে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং উত্তোলিত গাড়ীর শব্দের মাঝেও গভীর নিদ্রায় মগ্ন হল।

পরদিন সকালে কলম্বাসের রক্ষক ছুটে এসে ঘরে ঢুকল এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে নাচতে থাকল। পঁচাশি পৃষ্ঠার ভয়ার্ত নাবিক নিজের বিকৃত মুখভঙ্গী দেখতে পেল। কাগজের শিরোনামায় লেখা আছে যে, আমেরিকার মেয়েদের—যাদের সে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌষ্ঠবসম্পন্না প্রাণী বলে মনে করে, তাদের প্রতি সে আসক্ত হয়েছে, সে ইথিওপিয়ার বিলাশ সেলাসীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু এবং একই সঙ্গে তাকে 'হারভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে' ভূগোলের বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে।

সুযোগ্য জেনোয়াবাসী শপথ নিয়ে বলতে গেল যে, এ বিষয়ে সে একটা কথাও বলেনি, কিন্তু সেই সময় অনেকগুলো নতুন দর্শনপ্রার্থী এল। শিষ্টাচার নিয়ে সময় নষ্ট না ক'রে তারা সরাসরি কাজের কথা আরম্ভ করল। প্রচারের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সুরু হয়েছে, কলম্বাসকে হলিউডে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

"দেখ মিঃ কলম্বাস," দর্শন প্রার্থীরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল, "আমরা তোমাকে ঐতিহাসিক ছায়াচিত্র আমেরিগো ভেসপুচীর" প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে বলি। একবার ভাব দেখি, আমেরিগো ভেসপুচীর ভূমিকায় অভিনয় করছে স্বয়ং খৃষ্টফার কলম্বাস। দর্শকরা একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। সব চেয়ে বড় কথা এই যে এর সংলাপ ব্রডওয়ের চলিত ভাষায় তৈরী হবে। বুঝতে পারলে? পারলে না? আচ্ছা তা হলে গোড়া থেকেই এর সম্বন্ধে বলি। আমাদের একটা চিত্রনাট্য আছে, এটা আলেকজাণ্ডার ডুমার বিখ্যাত উপন্যাস 'কাউন্ট অফ মন্টিক্রিষ্টো' নামক উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত; কিন্তু সেইটাই এত বড় কথা নয়। আমরা এটাকে ভেঙ্গে আমেরিকা আবিষ্কার ঢুকিয়ে দিয়েছি। কলম্বাসের মাথা ঘুরতে লাগল, তার কম্পমান ঠোঁট দিয়ে কথা সরল না, মনে হল যেন সে প্রার্থনা করছে।

কিন্তু হলিউডের অধিবাসীরা পূর্ণ উদ্যমে বলতে থাকল:

"তা'হলে মিঃ কলম্বাস, তুমি আমেরিগো ভেসপুচী—যার প্রতি স্পেনদেশের রাণী প্রেমাসক্তা, তার ভূমিকায় অভিনয় করবে। সেও কিন্তু রাশিয়ার রাজকুমারী গ্রীষ্টার সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ। এদিকে কার্ডিন্যাল রিচলু আঁদ্রোডাগামাকে ঘুস দিয়ে এবং লেডী হ্যামিল্টনের সাহায্যে তোমাকে আমেরিকা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। তার পৈশাচিক চক্রান্ত সহজ এবং স্বচ্ছ। জলদস্যুরা সমুদ্রের ওপর তোমার আক্রমণ করল। তুমি সিংহবিক্রমে তাদের সঙ্গে লড়াই করলে। এই দৃশ্য-কল্পনা তিনশত মাত্রায় লম্বা। তুমি বোধ হয়, সেটা অভিনয় করতে পারবে না। যাই হোক, সেটাই আসল নয়।"

"কোনটা আসল তবে? কলম্বাস রাগত ভাবে প্রশ্ন করল।"

"প্রচার! জনসাধারণ ইতিমধ্যেই তোমাকে চিনেছে এবং তোমার মত সুযোগ্য এবং বিজ্ঞানী লোক যে জলদস্যুর সঙ্গে লড়াই করবে—তা দেখবার জন্য বহু লোক এসে জুটবে। তোমার আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এর অবসান হবে। কিন্তু সেটাই আসল কথা নয়——। আসল কথা হচ্ছে জলদস্যুর সঙ্গে লড়াই। এখন তুমি যা খুসী বেছে লও—টাঙ্গি, হাতুলি, বর্শা, আগুনে অস্ত্র। এককথায় মধ্যযুগের নাট্যমঞ্চের যত সাজ-সরঞ্জাম হলিউডে মজুদ আছে। তোমার দাড়িটা কিন্তু কামিয়ে ফেলতে হবে। দর্শকেরা রাশিয়ার চলচ্চিত্রে এত বেশী দাড়ি ও গোঁফ দেখেছে যে, তারা প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অতএব তুমি প্রথমে দাড়ি কামিয়ে ফেল এবং পরে ছয় সপ্তাহের একটা চুক্তি-পত্রে সই করে দাও। রাজী আছ ত'?"

"বহুত আচ্ছা", কলম্বাস বলল, তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে।

সেইদিন মাঝ-রাত্রে সে তার টেবিলে বসে স্পেন-দেশের রাণীকে একটা চিঠি লিখল।

"আমি অনেক দুরদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু কোথাও এমন অদ্ভুত ধরণের অধিবাসী দেখিনি। এরা নিস্তব্ধতা সহ্য করতে পারে না, তাই যত বেশী সম্ভব গোলমালকে উপভোগ করবার জন্য শহরের চারিদিকে বিশেষ রকমের রাস্তা তৈরী করেছে। এই রাস্তাগুলো উঁচু লোহার খুঁটির ওপর প্রস্তুত হয়েছে এবং দিনরাতই এই রাস্তা দিয়ে ভারী গাড়ী যাতায়াত করছে। এই কারণে এখানকার অধিবাসীদের কাছে গোলমাল খুব প্রিয়।"

"আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না যে সত্যসত্যই এরা নরখাদক কি না, তবে এ-কথা সত্য যে, এরা কুকুরের মাংস পর্য্যন্ত খায়। আমি নিজে স্বচক্ষে এমন অনেক জায়গা দেখেছি, সেখানে পথচারীদের কুকুরের মাংস খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয় এবং এটা খেতে যে সুস্বাদ তাও বুঝা যায়।

এখানে সকলের দেহ থেকে একটা গন্ধ নিঃসৃত হয়, যাকে এখানকার ভাষায় বলে 'গ্যাসোলিন'। সব রাস্তা-গুলোই এই গন্ধে ভরপুর—যা ইউরোপবাসীদের নাকে খুবই অরুচি ও অপ্রীতিকর লাগে। এমন কি এখানকার সুন্দর জিনিসেও এই গন্ধ মিশিয়ে আছে।

আমার স্থির ধারণা হয়েছে যে, এখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক। তাদের অনেক দেব-দেবী আছে, যাদের নাম অগ্নি অক্ষরে এদের ঘরে ঘরে লেখা রয়েছে। মনে হয়, এরা সব চেয়ে বেশী 'হোকেন ড্রুগিষ্ট সোডা ফাফিশালা দেবী' গ্যাসোলিন গন্ধী মহাদেবতা ফোর্ডের উপাসক। সেই এদের 'জিউস্' (দেবরাজ ইন্দ্র)।

অধিবাসীরা অদ্ভুতরকম রকমের পেটুক এবং অনবরত কিছু না কিছু চিবিয়ে চলেছে।

দুর্ভাগ্য বশতঃ, এতোরা এখনও পর্য্যন্ত এদের ধরা দেয় নি। আধুনিক স্পেনীয়দের উন্মত্ত আবেগের জীবন-যাত্রার তুলনায় আমেরিকানরা অতিশয় ধীরগামী—এমন কি পায়ে হেঁটে চলাও তাদের কাছে দ্রুত গমনশীলতার লক্ষণ। এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার জন্য এরা বহু রকমের জিনিষ প্রবর্ত্তন করেছে—যাদের এরা স্বয়ং-গতিশীল গাড়ী বলে থাকে। এখন এরা শব্দুকগতিতে ঘুরে বেড়ায় এবং এতেই এরা সব চেয়ে বেশী আনন্দ হয়।

এখানে ব্রডওয়ে নামক জায়গায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় যে আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হয় তা আমাকে স্তম্ভিত করেছে। অনেক লোক একটা বাড়ীতে এসে সম্মিলিত হয়, তাকে এরা 'রঙ্গশালা' বলে থাকে। কতকগুলো স্ত্রীলোক মঞ্চে উঠে দাঁড়ায় এবং একপ্রকার চাকের চম্‌চাম্ আওয়াজ ও সাক্সোফোনের কাঁদুনে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একে একে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ খুলতে থাকে। উপস্থিত লোকের সবাই শিশুর মত হাততালি দিতে থাকে। স্ত্রীলোকেরা যখন নগ্নপ্রায় হয় এবং প্রেক্ষাগৃহের লোকেরা ঘরের উত্তাপে তপ্ত হয় তখন এই আশ্চর্য্যজনক অনুষ্ঠানের সব চেয়ে দুর্ব্বোধ্য অংশ অভিনীত হয়: যে কোন কারণেই হোক যবনিকা নেমে আসে এবং সকলেই নিজের বাড়ী ফিরে যায়।

আমি এই আজব দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার অনুসন্ধান-কার্য্য আরও চালিয়ে যাবার আশা রাখি। এখানে আমার জীবনের কোন আশঙ্কা নেই। অধি-বাসীরা সকলেই সুবিবেচক, অকপট এবং আগন্তুকদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন।"

রবীন্দ্রনাথের তিনখানি পত্র

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই তিনখানি পুরাতন পত্র কাশীধামে যাইয়া প্রবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র তিনি আমার গত পূর্ণ বৎসরে দিয়াছেন। তৃতীয় পত্রখানি তাঁহার নিকট হইতে ১২ বৎসর পূর্ব্বে পাইলেও, তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে উহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করায়, এতকাল রাখিয়া দিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে আর বাধা না থাকায়, তিনখানি পত্রই একসঙ্গে প্রকাশ করা হইল।

প্রথম পত্র

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যভোগ করিবার সময় আমাকে যে স্মরণ করিয়াছেন তাহাতে আমিও আপনাদের সেই ভোগের অংশ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আমি যাঁহার কাজ করি তিনি আমাকে ছুটি দিলেন না—তিনি এই এক জায়গাতেই আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—ভালই করিয়াছেন। আর কত ঘুরিব—যেখানে আছি এইখানে বসিয়া বসিয়াই যতটা পাওয়া যায় তাহাই শেষ করিতে অনেক দেরি আছে—কাজেই চলাফেরা প্রায় বন্ধ হইবার জোগাড় হইল। আপনারা আমার সাদর অভিবাদন জানিবেন। ইতি ২৩শে ফাল্গুন ১৩১৭।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রখানি ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ যুক্তপ্রদেশের গাজীপুর-প্রবাসী রায় বাহাদুর গগনচন্দ্র রায়কে লিখিয়াছিলেন। গগনবাবু তখন কাশ্মীরে। রবীন্দ্রনাথ সে সময় শান্তিনিকেতনের কার্য্যে কিরূপ ভাবিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই ভাবটী পত্রে সুপরিস্ফুট।

যে সকল প্রবাসী বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে স্বীয় অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে গগনচন্দ্র রায় অন্যতম। তাঁহার সহিত কলিকাতায় ঠাকুরপরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা এবং সামাজিক সম্পর্ক ছিল। সুপ্রসিদ্ধ সাধু পওহারী বাবার তিনি একান্ত অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন এবং স্বীয় গুরুর একখানি জীবনচরিতও লিখিয়া গিয়াছেন। তখনকার দিনে প্রায় উদ্দেশ্যে বা পওহারী বাবার দর্শনার্থে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীগণের মধ্যে যাঁহারাই গাজীপুরে গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই গগনবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কবিবর রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গগনচন্দ্র রায় মহাশয় গাজীপুরস্থ গবর্ণমেণ্ট অপিয়ম ফ্যাক্টরীর সর্ব্বপ্রধান দেশীয় কর্ম্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পনের বৎসর হইল, নব্বই বৎসর বয়সে তিনি পরলোকে গমন করেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় তাঁহার একমাত্র পুত্র।

দ্বিতীয় পত্র

ওঁ

শিলাইদহ

কুষ্টিয়া

প্রীতি সম্ভাষণ নিবং

কলিকাতা হইতে অদ্য উত্তর প্রাক্ত হইয়াছি। বলেন্দ্রনাথের বিবাহ আগামী ২২শে মাঘ মঙ্গলবার স্থির হইয়াছে, আশা করি উক্ত সময় আপনাদের সুবিধাজনক হইবে। ইতি ২৪ আশ্বিন। ১৩০২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রখানি ৪২ বৎসর পূর্ব্বে শিলাইদহ হইতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন। ঠিক কাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা জানা না যাইলেও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ সম্পর্কে কন্যাপক্ষেরই একজনকে যে লিখিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৩০২ সালে পত্রোক্ত ২২শে মাঘ তারিখেই ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মাহানা দেবীর

(বিষয়ান্তরের অনুবর্ত্তনায়)

সহিত বলেন্দ্রনাথের (বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র) শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

তৃতীয় পত্র

বল্যাণীয়াসু

আমাদের বিজ্ঞালয়ে Science পড়াইবার সুবিধা আছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞালয়ের Laboratoryতে তোমাকে শিক্ষা দিতে গেলে সকলের সাম্‌নে তোমাকে বাহির হইতে হইবে—সে কি সম্ভব হইবে। বীরুকে লইয়া বরিশালে গিয়াছিলাম, তাই তোমার চিঠি পাইতে দেরি হইয়াছে। বড় বৌমার শরীর অসুস্থ হওয়াতে তিনি আপাতত ২।৩ মাস বোলপুরে যাইবেন না স্থির করিয়াছেন। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি ১০ই আষাঢ়, ১৩১৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পোষ্টকার্ডে লেখা এই পত্রখানি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ স্বর্গত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী সাহানা দেবীকে পাঠাইয়াছিলেন। বলেন্দ্রনাথ অতি অকালে মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে ১৩০৬ সালের ৩রা ভাদ্র তারিখে পরলোক গমন করেন। সাহানা দেবীর বয়স তখন ১৬ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। জীবনের এই নিদারুণ শোকাবহ ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে শিলাইদহে অবস্থান-কালে একজন ইংরাজ শিক্ষকের কাছে তিনি পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন। যখন শান্তিনিকেতনে যাইয়া বিজ্ঞান-শিক্ষা লাভের বাসনা প্রকাশ করেন, তখন সাহানা দেবীর বয়স প্রায় ২১ বৎসর। [পত্রখানিতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এদেশে সহ-শিক্ষা, সহ-সঙ্গীত ও সহ-অভিনয় প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতার অগ্রদূত মহাশক্তিমান্ রবীন্দ্রনাথকেও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সে সময় পর্য্যন্ত সঙ্কোচে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি শান্তি-নিকেতনে স্বীয় তরুণী আত্মীয়ার বিজ্ঞান-শিক্ষার পিপাসা মিটাইতে সাহস করেন নাই।]

Mrs. B. Tagore
C/o. Mrs. F. Chatterji
Allahabad

[Post Mark]
BARA-BAZAR
25 Ju. 07
CALCUTTA

পত্রে মীরা—কবির কনিষ্ঠা কন্যা এবং বড়বৌমা অর্থাৎ শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঠিকানা (ইংরাজিতে):—
মিসেস্ বি, ঠাকুর
কেয়ার অফ্ মিসেস্ এফ, চ্যাটার্জ্জি
এলাহাবাদ

ডাকঘরের ছাপ
বড়বাজার
২৫ জুন—০৭
কলিকাতা

মিসেস্ এফ, চ্যাটার্জ্জি—সাহানা দেবীর মাতা। পত্রখানি রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাটী হইতে লিখিয়া-ছিলেন।

নির্দ্দোষী মেঘ

শ্রীসুধীন সেন

নির্ম্মল নভে ধীরে ধীরে আসে
ওই দেখ মেঘ-পুঞ্জ ;
নিষ্ঠুর বায় দুষ্কর পানে
ধায় করে—পত গুঞ্জ।
মুক্ত আকাশ মুক্তির সুখে
চায়ে উহার চক্ষে ;
প্রণয়-বন্যা জাগে বারি' বারি'
শুভ শুভ তাহে বক্ষে।
বিজয়-বার্ত্তা থেকে থেকে মেঘ
ঘোষিছে ঘনিষ-যন্ত্র।
স্বর্গের দেবী নির্দ্দোষী লাগি
ফেলিছে নয়নচন্দ্র।

পথ ও পথিক

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

এক

ট্রেণের গতি ক্রমশঃ মন্থর হইয়া শিলুয়ার লাইনের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিল। কখনও উচ্চ কখনও মৃদু কণ্ঠে ইঞ্জিন তাহার আগমন ঘোষণা করিতেছে, একরাশি করিয়া শুভ্রধূম বারে বারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া যেন ক্লান্তি জানাইতেছে। আপাদমস্তক কম্বলে আবৃত করিয়া কেবলমাত্র মুখটি বাহির করিয়া অসিত ইণ্টারক্লাশ কম্পার্টমেণ্টের একটি জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার শুভ্র শীর্ণ ললাট স্পর্শ করিয়া বায়ু বহিতেছে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা ডিসেম্বরের হিমেল হাওয়া। তাহা হউক, অসিতের মনে হইতেছে যেন তাহা পরিচিত জনের স্নেহস্পর্শ, সে বাংলাদেশে পৌঁছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বহু অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামে বাস করাইয়া শেষ কয় বৎসর লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে তাহাকে রাখা হইয়াছিল। সেইখানেই সে তাহার অসমাপ্ত পাঠের কতকটা পরিসমাপ্তি করিয়াছে। জেলে বসিয়া সে বি-এ পাশ করিয়াছে, তাহার পর এম-এ, ডিগ্রিতে এম এ। শুধুমাত্র দেশের ইতিহাস, জাতির ইতিহাস ভাল করিয়া জানিবার জন্যই তাহার ইতিহাসে এম-এ পড়া। বন্ধন-পীড়িত নির্য্যাতিত জাতি, তেমনি মিথ্যা দিয়া গঠিত ইতিহাস, তবু তাহারই ভিতর দিয়া কিছু সত্য সহসা দর্শন দিয়াছে। ঐতিহাসিকের সে বন্ধনপীড়িত জাতির মুক্তির জন্য আর্ত্তনাদ। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, দেশের অধিকাংশ জনতা জানে না যে, তাহারা আবদ্ধ, তাহারা পরাধীন। ক্রীতদাসত্ব বোধ করি ক্রমে অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যায়। কেহ সে শৃঙ্খল উন্মোচনের চেষ্টা করিলে সে-ই শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। তাহা না হইলে দুর্ভেদ্য সিপাহীশ্রেণী ও বন্দুকধারির অন্তরালে থাকিয়াও তাহারা ধরা পড়ে? ইংরাজ ধরিতে আসে নাই, আসিয়াছিল তাহাদের সি, আই, ডি, অন্নভোজী ক্রীতদাস অসিতেরই দেশের লোক। ইহাদের উপর রাগ হয় না, দুঃখ হয়। অন্যমনস্ক অসিত আপন মনেই মৃদু হাসিল। দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে সে দেশে ফিরিল। দেশকে চিনিতে দেরী হয় নাই। যে মুহূর্ত্তে সবুজ শস্যাবৃত ভূমি, ছোট ছোট চালাঘর, পানাপুকুর চোখে পড়িয়াছে, অমনি অসিত মনে মনে আবৃত্তি করিয়াছে—

নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম
জননী বঙ্গভূমি।—

নিশীথ ষ্টেশনে আসিবে কি না কে জানে? কত বড়টি সে হইয়াছে? কেমনতর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার প্রকৃতি?

অসিত ভাবিতেছিল। ১২ বৎসরের বালক ছিল নিশীথ। এখন তাহার বয়স আটাশ। বিবাহ হইয়াছে আর একটি সন্তানও হইয়াছে, কি যেন নাম? ভারতী। নামটি শুনিলে মনে হয় নিশীথ বোধ করি তাহার দাদাকে বুঝিয়াছে। ভারতী ভারতী। সব্যসাচী ও ভারতী।

ট্রেণের গতি ক্রমশঃ মন্থর হইয়া গেল। জনকোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে গাড়ী। কত অসংখ্য মানুষের মেলা। কি অনন্তার কোলাহল। অসিত চাহিয়া বসিয়াছিল, তাহার নামিবার তাড়া নাই, সকল যাত্রী নামিবার পর নামিলেই তাহার চলিবে।

তাহাকে লইতে নিশীথ আসিবে। সে টেলিগ্রাম করিয়াছিল। released হইবার কয়দিন পূর্ব্ব হইতেই তাহার জ্বর হইয়াছিল, সেজন্য সঙ্গী অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদিগের সহিত একসঙ্গে সে আসিতে পারে নাই। প্রায় চৌদ্দদিন জ্বর ভোগ করিয়া অবশেষে সুস্থ হইয়া সে মাসখানেক পরে আসিল।

"দাদা"।

অসিত চমকিয়া চাহিল, সহাস্য মুখে দুয়ারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটি যুবক। দৃপ্ত সুন্দর বলিষ্ঠ আকৃতি। তাহারই যৌবনের প্রতিকৃতি যেন।

সাশ্রুনয়নে অসিত চাহিল। এই নিশীথ? তাহারই ছোট ভাই! হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া নিশীথ তাহার সুটকেসটি হস্তে তুলিয়া লইল। আসুন দাদা।

আর অসিত তাহার হাতটি আপন শীর্ণ মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া শুব্ধ হইয়া রহিল।

দুই

শ্যামবাজারের একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে নিশীথের বাটী। দুই পার্শ্বের ত্রিতল অট্টালিকার বাধা কাটাইয়া রৌদ্র-বাতাস প্রবেশের পথ পায় না, সেজন্য সব ঘরগুলিই প্রায় অন্ধকারে ঢাকা হইয়া থাকে। তবে ঘরগুলি, তবু ঘরগুলি কেন সমস্ত বাটীখানি পরিষ্কার হইয়া আছে।

রাস্তার দিকটি খোলা, সেইদিক হইতে সামান্য রৌদ্র উপভোগ করা যায়। রাস্তার উপরকার দিকে দ্বিতলের বড় ঘরখানি অসিতের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অপরাহ্ণকালের পড়ন্ত রৌদ্রের সোনালী রেখা ধীরে ধীরে গতিতে আসিয়া অসিতের শয্যায় পড়িয়াছে। তাহারই উপর পা-দুটি মেলিয়া দিয়া অসিত আধশোয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়িতেছিল।

ভারতী বোধ করি এখন ঘুমাইতেছে, তাহা না হইলে তাহার প্রেমের আঘাতে অসিতের কাগজ পড়া চলিত না।

ক্ষুদ্র চার বৎসরের শিশুর আবদার এত বেশী, তাহা তো অসিতের জানা ছিল না। সবিস্ময়ে অসিত ভাবিতে থাকে। আর নিশীথের পত্নী নীলিমা এত ভাল মেয়ে, তাহাও অসিত জানিত না।

ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর সমাহিত শ্রীশ্রী দেখিয়া অসিতের মনে হয়, আবার যেন সে তাহার শৈশব হইয়া নূতন হইয়া সংসারে ফিরিয়া আসিয়াছে।

চঞ্চল চরণে চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া নীলিমা কাজ করিয়া বেড়ায়। তাহারই ভিতর ভারতীর দেখাশুনা।

সম্প্রতি তার আর একটি শিশু বাড়িয়াছে—অসিত।

আসিয়াই অসিত জ্বরে পড়িয়াছিল। অতখানি জানি তাহার দুর্বল দেহে সহ্য হয় নাই।

সেই প্রবল জ্বরের ঘোরেও সে অনুভব করিয়াছে নীলিমার স্নেহকোমল সেবা ও নিশীথের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও উদ্বেগ।

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা হাত আসিয়া উত্তাপ নিয়াছে। পায়ের লেপ টানিয়া দিয়াছে। ফিতে-কাপের বালি, লেবুর রস খাওয়াইয়াছে। না খাইতে চাহিলে নীলিমা ধরিয়াছে। এমন সেবা সে হস্পিটালেও পাইয়াছে, ঘড়ি ধরিয়া টেম্পারেচার দেখা, সময়ে পথ্য খাওয়ানো, সব। কিন্তু সেই সেবার অন্তর্নিহিত সে স্নেহের, সে উদ্বেগের উত্তাপ ছিল না। তাই তাহা ছিল যেন যান্ত্রিক সেবা। আর ইহারা?

শ্রম ক্লান্ত অসিতের মধ্যে মধ্যে মনে হয়; নোঙর-ছেঁড়া দিক্‌ভ্রান্ত তরী জাহাজ—সে যদি এমন করিয়া এক বন্দরের বুকে স্থান পাইল, তাহা হইলে মেয়াদী শেষ কয়টা দিন সে এখানেই কাটাইবে নাকি?

অসমাপ্ত তাহার কাজ? কাজ ব্যতীত অসিত থাকিতে পারিবে না। তাহাদের প্রত্যহ কাজের কঠিন এই ষোল বৎসরে ছিন্ন-ভিন্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

নূতন করিয়া পথ গ্রহণ করিতে হইবে।

এই ষোল বৎসরে দেশের পরিবর্তন হইয়াছে বহু।

দেশের স্বাধীনতা খুঁজিবার জন্য কত অসংখ্য মত, কত অসংখ্য পার্টি গড়িয়া উঠিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টি, সোস্যালিষ্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, লেবার ইউনিয়ন। কাগজ দেখিয়া মনে হয়, আন্দোলন অগ্রসর হইয়াছে অনেকখানি। এই দীর্ঘ দিন কারাগারে আবদ্ধ থাকিবার পর এই আন্দোলনের ফলেই তো তাহাদের মুক্তি দিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী-নির্দ্দেশিত অহিংস পথা সমগ্র জন-সাধারণকে যেন জাগাইয়া তুলিয়াছে। নিশীথও কংগ্রেসী। mass কে জাগাইয়া তুলিবার মত এমন পথা আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু এই পথ দিয়া স্বাধীনতা আসিবে কি? শান্তির পথ দিয়া কি স্বাধীনতা আসে? ইহা গান্ধীজির প্রবর্ত্তিত নব পথা, দেখা যাক্। বিমনা অসিত সংশয়াকুল চিত্তে ভাবিতে থাকে।

ধীরে ধীরে ভাসিয়া ওঠে গহন গভীর জঙ্গল-পলাশিত কয়টি তরুণ। সকল দুঃখ-কষ্ট উপেক্ষা করিয়াছে, স্নেহ: মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে দেশের স্বাধীনতার জন্য। যাহারা বাঁচিয়াছে তাহাদের মাঝে এই ছিল প্রধান যন্ত্র। প্রতিপক্ষ যে কত প্রবল, তাহা জানিয়াও তো চেষ্টার বিরাম ছিল না?

মনের সেই দুর্জ্জয় শক্তি কোথায় চলিয়া গেল?

সকল আরাম—মায়ের স্নেহ-কোড়-পিতার আশা—সব

ছাড়িয়া যে-অসিত চলিয়া গিয়াছিল, আর আজ যে আশ্রয় খুঁজিতেছে—উভয়েই কি একই অসিত ?

আর্টিষ্ট শুধু ছবি আঁকিয়াছিল—বন্দিনী যেন নাটুকা। গভীর গহন অরণ্যের এক অন্ধ গিরিগুহায় হতাশপ্রাণা এক নারী গভীর হতাশায় চাহিয়া আছে।

চক্ষু দুটি সে আঁকিয়াছিল চমৎকার। যেন কত যুগের হতাশা ও প্রতীক্ষা সঞ্চিত হইয়া আছে সেই চক্ষুতে, বন্ধন খুলিবার সে আবেদন।

তাহারা চিত্র ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বন্ধন খুলিবে। কিন্তু তাহা তো হইল না ? হিটলারও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ? ভয়চকিত অসিত ভাবিতেই থাকে।

একবার দেশের বাটিতে তাহাকে যাইতে হইবে, যেখানের মাটিতে তাহার জন্ম, যেখানে তাহার পিতা মাতা স্বর্গগত হইয়াছেন, যেখানে চেতনার উন্মেষণ হইয়াছিল, তাহা একবার স্পর্শ করিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু কথাটা তুলিবার পর নিশীথ ও নীলিমা বকিবে প্রচুর।

একদিন কথাটা উত্থাপন করায় গম্ভীর হইয়া নীলিমা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তা হলে আমার আর ভারতীর জিনিসও গুছিয়ে নিই ?"

বিস্মিত অসিত—বলিয়াছিল "কেন ?"

নীলিমা আরো বেশী বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিল "কেন ? এই রকম শরীর আর এইরকম আশুতোষ লোককে একা ছাড়া যায় ? তুমি চুপ করে আছ যে ?"

নিশীথ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নিশীথের দিকে ফিরিয়া নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি চুপ করে আছ ? তোমার বুঝি ইচ্ছে যাওয়া যান ?"

আকস্মিক আক্রমণে বিব্রত নিশীথ বলিয়াছিল "আমি কি তাই বলছি ? না দাদা, যাবেন না, আমি বকুনী খেতে পারব না।"

অঙ্ক গোপন করিতে করিতে অসিত হা হা করিয়া হাসিয়াছিল। কোথায় ছিলি না তুই ? যখন বনে জঙ্গলে এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমির প্রান্তরে জনপদে একা অসিত ঘুরিয়া বেড়াইত অনাহারে অনিদ্রায় ?

কিন্তু সে অসিত আর এ অসিত এক নয়।

তাহার চক্ষে ছিল অগ্নি, ইহার চক্ষে জল। তাহার দৃঢ় বলিষ্ঠ হস্তে থাকিত অমিতশক্তি মারণাস্ত্র। ইহার দীর্ঘ দুর্বল হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলে থর থর করিয়া কাঁপে। ষোল বৎসর। দীর্ঘ ষোল বৎসর তাহাকে জীর্ণ শীর্ণ দীর্ণ করিয়া দিয়াছে। রুদ্ধ কারাকক্ষে তাহার দৃপ্ত শক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

তিন

সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্বে অসিত তাহার গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। অনেক কষ্টে অনেক অনুনয় অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়া তবে অসিতের একা আসিবার ও কয়দিন থাকিবার অনুমতি নীলিমা ও ভারতী মঞ্জুর করিয়াছে।

স্বল্পভাষী নিশীথ কথা কহে নাই, তবে তাহার বাকুল বিব্রত অবস্থা দেখিয়া দূরে দাঁড়াইয়া হাসিয়াছে।

ঘর সাজিবার পর প্রথম দুইমাস পুনরায় ওই কথা তুলিতে গেলেই নীলিমা কথা না কহিয়া গম্ভীরমুখে প্রস্থান করিয়াছে।

ভারতী গোপনে গোপনে কহিয়াছে—আড়ুমনি, না তীষণ রেগে গেছে তুমি যাবে বলেছ বলে, আজ তাই কম খেয়েছে।

তাহার পর না যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া অনেক কষ্টে বালিকার অভিমান দূর করিতে হইয়াছে।

তাহার পর 'আজ নয়, কাল' করিয়া বহুদিন গিয়াছে। অবশেষে বহু কষ্টে চারদিনের ছুটি ও একাকী আসিবার ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে।

চারদিনের পর নীলিমা ও ভারতী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিবে, তাহাও জানাইয়া দিয়াছে।

অসিত তাহার গাত্রাবরণে তাড়াতাড়ি চক্ষু দুইটি মুছিয়া লইল। তিনটেই পাগল।

জন-বিরল ষ্টেশন। ষ্টেশনের বাহিরে দুই চারি খানা ট্যাক্সী, ঘোড়ার গাড়ী ও রিক্সা রহিয়াছে। তবে চালকদিগের বিশেষ ব্যস্ততা নাই—আরোহীদিগের প্রতি। যাহারা কলিকাতায় চাকুরী করে, তাহাদের অধিকাংশই পায়ে হাঁটিয়া গৃহে ফেরে। যাদের ঘর বাটি তাহারা ষ্টেশনের ভিতরে সাইকেল রাখিয়া যায়, আসিয়া তাহাতেই ফেরে। মৃতপ্রায় নটবরের

সমেত যাত্রী ও বিদেশীর দাহের, যেন দেখিয়া ইহারা ব্যস্ত হইয়া উঠে। তাহাদের নিকট লাভ আছে। অসিতের সহিত সটবহর অর্থাৎ বেডিং ও সুটকেস দেখিয়া দু'একজন রিক্সাচালক কিছু উৎসাহ দেখাইয়া ডাকিল—আসুন বাবু।

কিন্তু ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া অবস্থার বনস্থলির মধ্য দিয়া বিসর্পিত পায়ে-চলা পরিচিত পথটি দেখিয়া অসিত স্থির করিল সে হাঁটিয়াই যাইবে। কুলীকে প্রশ্ন করিল, "তুম লাগেজ লে কে হামারা সাথ চলেগে?"

কুলীটি কহিল, "বকসিস্ মিলনেসে কাহে নেই জায়গা বাবু?"

"আচ্ছা তব্ চলো," বলিয়া অসিত অগ্রসর হইল। কাকাকে খবর দেওয়া আছে যে, অসিত এই সপ্তাহের মধ্যে যে-কোন দিন তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে। তবে কবে তাহা সঠিক জানানো হয় নাই। কাকার নিকট হইতে সাদর আহ্বান আসিয়াছে। কাকা প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস-কমিটীর সেক্রেটারী। অসিতের ইচ্ছা ছিল নৈত্রিক বাটিতে ওঠা, যাহা ভালোরূপ অবস্থায় কাকার জিম্মায় আছে। কিন্তু তাহাতে কাকাও সম্মত হন নাই, এবং নিশীথ মৌলিমাও নয়। কয় পরীরে একা বাটীতে তাহার থাকা চলিবে না। তাহাতে অসিত বলিয়াছিল যে,বিপ্লবীকে গৃহে স্থান দিলে কাকার অসুবিধা হইতে পারে। নিশীথ হাসিয়া বলিয়াছিল, "সে-দিন চলে গেছে দাদা। কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্টের ভূপে ও ভয় করো না। আর তোমাদের উপর তো আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে। তাহারই মাঝে অসিত পথ চলিতে লাগিল। কুমোরবাড়ীর চালা-গুলি যেন তেমন সুসংস্কৃত নাই। তবে লোকজন ঘরে রহিয়াছে। সাঁজাল দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রচুর ধূম নির্গত হইতেছে কিন্তু তবুও মশার কামড়ে উত্তপ্ত গাভীগুলির পা ঠুকিবার ও লেজ আছড়াইবার আওয়াজ শুনা যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে হাঁকা হাঁকা রব করিতেছে। কোন কোনও গৃহে সাঁঝ দেখাইয়া শঙ্খধ্বনি হইতেছে। কল্যাণবতী মাতা এতক্ষণে তুলসীমূলে সন্তানের জন্য কল্যাণ কামনা করিতেছেন।

কেমন করিয়া যেন তাহার নিজের মায়ের কথা মনে পড়িয়া যায়।

দুই পার্শ্বের ঘন বনস্থলির মাঝে সঙ্কীর্ণ বনপথ। বেহারী পয়লার আম-বাগান, এই বাগানের একপার্শ্বে তাহার ঘর। কেমন অকস্মাৎ লোকটা মারা গেল। দুধ বেচিয়া দ্বিপ্রহরে বেচারা গৃহে ফিরিতেছিল বাগানের ভিতর দিয়া। একটা গাছে একটা বড় মৌচাক হইয়াছিল। মধু খাইবার লোভে হনুমানে চাক ভাঙিয়া-ছিল। মস্তবড় চাকের কৃষ্ণ মৌমাছি দেখিয়া ভীত হইয়া হনুমান সরিয়া পড়ে। ঠিক সেই সময়ে বেহারী তাহার তলায় উপস্থিত হয়, সেই চাকভাঙ্গা সমস্ত মৌমাছি তাহাকে ঘেরিয়া ধরিয়া দংশনে দংশনে অর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। তাহার কাতর চীৎকারে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া কোনক্রমে তাহাকে উদ্ধার করে। মানিক রাতে কাঁপিয়া জ্বর আসে ও অজ্ঞান অবস্থায় দুইদিন বাদে তাহার মৃত্যু হয়।

অবশেষে পাঁচটি ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী। কি তাহাদের বিলাপ! এখনও মনে হইলে মনটা বিষণ্ণ হইয়া যায়।

ঘোড় ঘুরিতেই চোখে পড়িল চৌধুরীদের ভগ্ন গৃহগুলি। অসিতের বুকের রক্তটা যেন ছলকিয়া উঠিল, সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া শীতের সন্ধ্যায় যে জন-চলাচল হইতেছিল তাহারই মধ্যে দুই একজন কৌতূহলী পথিক অসিতের অপরিচিত মুখের প্রতি বিস্ময়দৃষ্টিতে তাকাইল। অসিত চলিতে আরম্ভ করিল। না: গৃহে কেহ নাই। অসংস্কৃত অন্ধকার ভগ্ন গৃহের পানে তাকাইলে তাহাই মনে হয়।

নিশ্চিরোধী পণ্ডিতের কোথায় অগ্নি লুকাইয়া ছিল কে জানে? তাহা না হইলে বিপিনের মত অসমসাহসী বিপ্লবী নেতা সন্তান তাহার হইবে কেমন করিয়া?

চৌধুরী মহাশয়ের তিনটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ নবীন পিতার মতই ছিল। কোনওক্রমে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া এক সওদাগরী অফিসে তাহার চাকুরী হয়।

অতঃপর বিবাহ, ম্যালেরিয়া, চাকুরী ইত্যাদি সবভাবে ভাগ করিয়া সম্ভবতঃ তাহার জীবনান্ত হইয়াছে। তাহার পর বিপিন ও নবীন। বাল্যকালে দুরন্ত বলিয়া তাহাদের দুর্নাম ছিল। কোনও গাছে কোনও ভাল ফলটি থাকিবার উপায় ছিল না। পরিপুষ্ট ছাগ-শাবক প্রায়ই উধাও হইয়া যাইত। গ্রামপ্রান্তে যিয়াদিগের কুকুট অপহরণ হইত প্রায়ই। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না মিলিলেও ইহা যে বিপিন নবীনের কর্ম ইহাতে গ্রামস্থ হিন্দু-মুসলমানে মতবিরোধ ছিল না। মধ্যে মধ্যে একযোগে চড়াও হইয়া তাহারা পণ্ডিতকে বাক্যবাণ হানিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইত এবং খুব অসহ্য হইবার পর একদিন শোনা যাইত পণ্ডিতের ক্রুদ্ধ গর্জন ও তার পরদিন দেখা যাইত বিপিন নবীনের শুভ্র বলিষ্ঠ দেহে কালশিরা ফুটিয়া রহিয়াছে।

তাহার পর ধীরে ধীরে সেই দুরন্ত দুর্জয় শক্তি কেমন করিয়া এক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত হইল কে জানে। নবীনের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল টাইফয়েডে। আর বিপিন হইয়া উঠিল রহস্যময়। দুপুরের খরতাপে ঘুঘুডাকা ছাতিমতলায় বসিয়া ছিপ নাড়িয়া পানকৌড়ী শিকার করিতেও দেখা যাইত না। অথবা চৈত্রের বাগানের শৈবালদাম-সমাচ্ছন্ন পুষ্করিণীর পানা টানিয়া আনিয়া একাগ্র অভিনিবেশে পানিফল তুলিতেও দেখা যাইত না। সে যেন গ্রামেই থাকে না, স্কুলেও নয়, বাড়ীতেও নয়। মা সকাল সকাল ভাত খাইয়া লয়, নয়ত' মাকে বলিয়া যায় আমার ভাতটা ঢেকে রেখে তুমি খেয়ে নিও মা, বসে থেকো না, দেরী হয় যদি। দুরন্ত সন্তানের শান্ত-ভাব দেখিয়া মাতা মনে মনে উদ্বিগ্ন হন, আবার ভাবেন, বড় হইয়া শান্ত হইতেছে বোধ হয়। কিন্তু তেমন আর কথায় কথায় হাসে না কেন? যেন গম্ভীর হইয়া যাইতেছে? তাহার শরীর খারাপ কি?

সব প্রশ্নেরই একদিন সমাধান হইল—বাড়ীতে পুলিশ যেদিন হানা দিল। তখনও ভোর হয় নাই। নবীনের ব্যাকুল আহ্বানে ভীত হতবুদ্ধি পিতা-মাতা উঠিয়া দেখিলেন পুলিশ আসিয়াছে। দারোগা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে এবং চারিদিক ঘেরিয়া আছে পুলিশ। যাহাতে অপরাধী না পলাইতে পারে।

বিপিনের শয়ন-ঘর অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে পাওয়া গেল না। হতাশ দারোগা পিতাকে ও ভ্রাতাকে শাসাইয়া গেলেন—যদি আসবে সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দেবেন ম'শাই, নইলে আপনাদেরও বিপদ হতে পারে, যেমন কালসাপের জন্ম দিয়েছেন।

পিতা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র এনার্কিষ্ট পার্টির একজন চাই। সন্ধান কিন্তু পাওয়া গেল না। তাহার পর তাহার সম্বন্ধে নানা গল্প শুনা যাইত যে, কেমন করিয়া সে তেল মাখিয়া পুলিশের হাত পিছলাইয়া পলাইয়াছে। কেমন করিয়া সে সাহেব সাজিয়া ট্রেনে আই জির চোখে ধুলা দিয়াছে; একবার পেশোয়ারি সাজিয়া সে পলাইয়াছে ইত্যাদি। তখন অসিতের বয়স ছিল ১০।১১ বৎসর।

এই বিপিনদাই অবচেতনার অন্তরালে তাহার অন্তরে দেশপূজার হোমাগ্নি জ্বালাইয়াছিলেন কি না কে জানে?

৮।৫

সঙ্কীর্ণ বনপথ শেষ হইয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের তৈয়ারী অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরিচ্ছন্ন নীলাকাশে জরির বুটির মত অসংখ্য তারা ফুটিয়া রহিয়াছে। তিথি বোধ করি একাদশী হইবে, যদি চন্দ্রালোকের আভাস পাওয়া যায়, তবে তাহা কুহেলিকার অবগুণ্ঠনে আবৃত। পথ-চলতি একটি চাষীগোছের লোক মোটা মলিন একটি খেঁসে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া চলিতেছিল, হাতে তাহার একটি পাকা বাঁশের লাঠি।

অসিতকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে প্রণাম করিয়া কহিল, কোথা হতে আসা হচ্ছে বাবু ম'শায়ের?

অসিত উত্তর দিল—কলকাতা থেকে আসছি।

অসিতের কোমল কণ্ঠস্বরে ভরসা পাইয়া বৃদ্ধ প্রশ্ন করিল তা কোথাকে যাবেন বাবু ম'শয়?

অসিত—যাব শ্রীযুক্ত মনমোহন ঘোষালের বাড়ি।

ঘোষাল ম'শাইয়ের বাড়ি যাবেন বাবা, তা তেনাদের

কুটুম বুঝি আপনি ? তাহলেতো সবাইকে আমি জানি বাবা।

অসিত মৃদু হাসিল, আপনার গাঁয়ে আজ সে কুটুম বলিয়া মনে করিবার মত হইয়াছে। প্রকাশ্যে কহিল—না, আমি তাঁদের বাড়ির ছেলে, অনেকদিন বিদেশে ছিলুম।

তাই বল বাবা, তাই বল, আমিও বেশীদিনের বাসিন্দে নয়, এই বছর দশেক এখানে এসেছি। আমার নাম নীলাম্বর। আচ্ছা তা হলে পেন্নাম হই বাবা ম'শায়। নত হইয়া প্রণাম করিয়া কৃষক অগ্রসর হইয়া গেল।

তাহার হাতে পাকা বাঁশের লাঠিটি দেখিয়া বহুদিনের একটা ঘটনা অসিতের মনে পড়িল।

সবেমাত্র তখন আখড়া তৈয়ারী হইয়াছে ; ১৪।১৫ বৎসর বয়স অসিতের।

পুলিনবিহারী দাসের অপূর্ব লাঠিখেলার কথা শুনিয়া বাঙ্গলা দেশের গ্রামে গ্রামে যুবকগণের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ স্বাস্থ্যোন্নতি ও লাঠিখেলার চর্চা আরম্ভ হইয়াছে ; যুবা বালক নির্বিশেষে সঙ্ঘের সভ্য হইতেছে, অসিতও সভ্য হইয়াছিল। লাঠিখেলা হইত বারোয়ারীতলার অঙ্গনে, তাহার পার্শ্ব দিয়া ইস্কুলে যাইবার পথ। একদিন সন্ধ্যাকালে লাঠিখেলা হইতেছে, দুলাল দা, জ্ঞান দা, ফণী দা—ইহাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য মুগ্ধচিত্তে তাহারা বালকের দল দেখিতেছে। উক্ত দেহে তাহারা কৌশল দেখাইতেছে, রাস্তার লোকও দাঁড়াইয়া গেছে কিছু। হঠাৎ একটি বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া আসিল। ধপধপে সাদা তাহার চুল, বয়সও বোধ করি ৭০এর কাছে হইবে, বার্দ্ধক্যের বলিরেখা সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট, বেশভূষা দেখিলে মনে হয় কৃষকশ্রেণীর ব্যক্তি, তাহার হাতেও এমনি একটি পাকা বাঁশের লাঠি ছিল। সে আসিয়া দুলাল দাকে প্রণাম করিয়া কহিল, বাবু আপনাদের লাঠিখেলা দেখে আমারও একবার ইচ্ছে হচ্ছে, যদি ভরসা দেন, তবে আপনাদের সঙ্গে একবার খেলি।

দুলাল দা ও সবাই সোৎসাহে সম্মতি দিয়া কহিল—বেশ তো, কার সঙ্গে লড়বে বেছে নাও।

ফণী দা সকলের চাইতে বলিষ্ঠ, তাহার দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিল, আপনি রাজি বাবু ?

ফণী দা হাসিয়া সম্মতি দিল।

দুই একজন অস্ফুট বিদ্রূপ করিল—বেছে নিয়েছে ভাল, সবচেয়ে বুড়ো, সবচেয়ে জোয়ান।

তাহার পর এক আশ্চর্য কাণ্ড, ফণী দার হাতে আর লাঠি থাকে না, যতবারই দৃঢ়মুষ্টিতে লাঠি বাগাইয়া ধরে, বৃদ্ধের এক আঘাতে তাহা খসিয়া যায়, একটি প্যাঁচও পড়া হইল না।

ফণী দার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, একটা জিগির দিয়া বৃদ্ধ একবার সিংহের মত দুলিয়া উঠিয়া দুই হাতে আখড়ার মাটি কপালে ছোঁয়াইয়া কহিল—গুরুজীর জয়।

তার পর লাঠি ফেলিয়া ফণী দার মুখের পানে সস্নেহে চাহিয়া কহিল—আমারই ভুল হয়েছিল, তুমি পারবে কেন বাবু ? এ যে হাজিক মিয়ার কাছে শিখে কব্জি রেখেছে, এ কি ছেলেমানুষ তোমরা সামলাতে পার বাবা ? শক্তির প্রকাশে যেন সে আপনিই লজ্জিত।

বৃদ্ধ বাগ্দী চাষীর চেহারা আজও অসিতের স্পষ্ট মনে আছে। বাংলার লাঠিয়াল তারা বাংলার গৌরব, ৪০শের মন্বন্তরের পর আর তাহারা বাঁচিয়া আছে কি ?

চলিতে চলিতে বারোয়ারীতলা আসিয়া গেল। সবিস্ময়ে অসিত দেখিল—বারোয়ারীতলার প্রকাণ্ড অঙ্গন জুড়িয়া মিলিটারী সৈন্যদিগের থাকিবার জন্য অস্থায়ী গৃহ হইয়াছিল, এখনও তাহা রহিয়াছে। পূজা কোথায় হয় ? কোথায় হয় যে জানে ? আর ইহারই মত মানসিক অবস্থা গ্রামের লোকের আছে কি না তাহাও জানা নাই। তবে বাংলার অধিবাসী মরিয়াও মরে না, এই যা রক্ষা। আর তাহার বারো-মাসের তেরো পার্বণ ও সেই সঙ্গে মরিয়া মরিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই রাশি রাশি বিদেশীয় বিজাতীয় সৈন্যগণের বাসের ফলে গ্রামবাসী কষ্ট পাইয়াছে বহু, তাহাদের আহার্য, জাতি, কুল, মান সব লইয়াই টানাটানি পড়িয়াছে। অথচ কাহার জন্য, কিসের জন্য এই ক্লেশ স্বীকার ? অসিত ম্লান হাসিল।

সেই কথাটিই বিশদভাবে ভারতবাসীকে বুঝাইতে হইবে। শুধু মাত্র শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা শব্দটি লুকাইয়া থাকিলে চলিবে না। সমস্ত ভারতবাসীর চিত্ত ভরিয়া হোমাগ্নির মত সেই স্বাধীনতার আকুল আকাঙ্ক্ষা জ্বালিয়া দিতে হইবে। মানুষের মত বাঁচিবার যে অধিকার তাহার আছে, তাহাই শিখাইতে হইবে। কেমন করিয়া তাহা আসিবে? অসিত মনে মনে আবৃত্তি করিল—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উচ্ছল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।

তাহার পর সেই জাগরণ সেই দাবী ভারতবাসীর অন্তরে জাগাইয়া তুলিতে হইবে —

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে
আশা। ডাকিয়া বলিতে হবে,
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।"

স্বাধীনতা অনিবার্যরূপে আসিবে। সে অকপট চাওয়ার মধ্যে নেতৃত্বের দাবী থাকিবে না, প্রভুত্বের গর্ব থাকিবে না, ক্ষমতার অপব্যবহার থাকিবে না, সমস্ত দেশবাসী একআত্মা হইয়া সেই দাবী জানাইবে। কবে সেদিন আসিবে? কম্যুনিজম্ সোশ্যালিজমের মধ্যে দিকে দিকে যেন জাগরণের পদধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু সে পদক্ষেপ যেন এখনও স্থিতিস্থাপকতা পায় নাই। তাহা অসম, ছন্দবিহীন। ছোট খালটি পার হইয়া অসিত দত্তদের বাটির সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল।

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, স্বল্প চন্দ্রালোকে বৃহৎ বাটিটি দেখা যায়। অন্ধকার হইয়া আছে। নীচতলার দু-একটি ঘরে মৃদু ক্ষীণ আলোর আভাস পাওয়া যাইতেছে। সবিস্ময়ে অসিত চাহিল—সেই বাটি? জন-কোলাহল-মুখরিত, আলোকোজ্জ্বল বৃহৎ অট্টালিকা। কর্তা, গৃহিণী, তিন ছেলে, তিন বধূ, পৌত্র, পৌত্রী, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রীতে গৃহ পরিপূর্ণ।

কি বিরাট অট্টালিকা। কত তাহার ব্যবস্থা। বাতির ঘর। দানার ঘর, বাসনের ঘর, আসন-সতরঞ্চির ঘর—ইত্যাদি বিরাট অঙ্গনের এক পার ভরিয়া সারি সারি রহিয়াছে। অপর দিকে বিরাট ঠাকুর-দালান। একটি মাত্র বৃহৎ কক্ষ ও তাহার সম্মুখ জুড়িয়া বৃহৎ দালান মার্বেল-বাঁধানো। সম্মুখে দুইটি বৈঠকখানা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রথায় সজ্জিত। তাহার এক পার্শ্বে পিয়ানোর ঘর। আর এক পাশে জল-ঘর। যজ্ঞ হইলে ইহার বড় বড় চৌবাচ্চা ভরিয়া পান করিবার জন্য জল রাখা হয়। তাহার পাশে কিচেন-ঘর। ঠাকুরদালানের পশ্চাৎ দিকে একটি মহল, তাহার নাম ভিয়ান ঘর। বড় ঘরটির ভিতর তিন চারিটি বৃহৎ চুল্লী তৈয়ারি থাকে ভিয়ানের জন্য, সেই ঘরের সম্মুখে একটি অঙ্গন, তাহার মধ্যস্থলে দুইটি লম্বাগড়নের বাঁধানো খাল রহিয়াছে ও চারিটি কোণে চারিটি চৌবাচ্চা, বৃহৎ কর্ম হইলে ওই খাল দুইটিতে ভাত রাখা হয় ও চৌবাচ্চা-গুলি ভরিয়া ডাল-তরকারি থাকে। তাহার অপর পার্শ্বে ভোগের ঘর, নৈবেদ্যের ঘর। অন্দরে আঁশ-নিরামিষ রন্ধন-গৃহ, ভাণ্ডার, আঁতুড়ঘর ইত্যাদি। ঘরগুলি তেমনি আত্মীয়-স্বজনে গৃহ পরিপূর্ণ, দূরসম্পর্ক টানিয়া দুঃস্থ আত্মীয়ের দল আসিয়া রহিয়াছে, তাহাদের পুত্র-কন্যার শিক্ষা, বিবাহ, সবই দত্ত মশায়ের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব তিনি হাসিমুখে বহন করিয়াছেন। অসিত তখন ছোট ছিল, সবটা বুঝিত না; তবে নানা কথা কাণে আসিত। তাহার মধ্য হইতে কিছু কিছু বোধগম্য হইত—এইটুকু সেবু ঝিতে পারিত যে, দত্ত মহাশয় সুখী নহেন, বৃহৎ সংসারের বৃহৎ কলহ ও নানা বৃহৎ জটিল সমস্যায় তিনি দিবারাত্র চিন্তিত থাকিতেন।

একটি পুত্রও তাঁহার কর্মস্পৃহা পায় নাই। তাহারা জানে—পিতা উপার্জন করিবেন, সেই অর্থ তাহারা উড়াইবে। জ্যেষ্ঠপুত্রটির স্বভাব অতি মন্দ ছিল। অত্যধিক মদ্যপান ও অত্যাচারের ফলে তাঁহার অল্প বয়সেই জীবনান্ত ঘটে। অসিত তাঁহাকে জ্ঞানে দেখে নাই। মধ্যম পুত্রেরও অকালেই মৃত্যু হয়। কেবল কনিষ্ঠ পুত্রকে অসিত জ্ঞানে দেখিয়াছিল, তাঁহাকে সে ছোট জ্যাঠামহাশয় বলিত।

অসিতের মনে পড়িল ছোট জ্যাঠাইমার কথা। কি

অপরূপ সুন্দরী তিনি ছিলেন। মনে হইত—সাদা মার্বেলে সুগঠিত দেহ। টানা বড় বড় চোখ, পাতলা পদ্মের পাপড়ির মত তাঁহার অধরোষ্ঠ। কালো মেঘের মত স্নিগ্ধতরা তাঁর চুল, সব চাইতে বড় ছিল তাঁহার অপরূপ সুন্দর মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। অত ধনী গৃহের বধূ হইয়াও কোনও দিন তাঁহাকে প্রসাধন করিতে দেখা যায় নাই। অতি সাধারণ বেশভূষায়ও তাঁকে যেন অসাধারণ বোধ হইত। মা'য়ের মুখে কত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অসিতে শুনিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি এখনও অসিতের মনে আছে—

"চন্দনের ফোঁটা সবাই পরে
কপালগুণে চন্দন ঝলমল করে।"

এখন অসিত বুঝিতে পারে যে,সর্বগুণের অধিকারিণী করিয়াও ভগবান্ তাঁহাকে স্বামি-সুখে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেই ছিল তাঁহার প্রধান ক্ষোভ। তাঁহার চরনভোলানো রূপ সবাইকে মুগ্ধ করিলেও স্বামীকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই; তাহার কারণ তাঁহার স্বামীর মন পূর্বেই অন্যত্র মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা আর ফেরে নাই। সে এক নূতন কাহিনী—truth is stranger than fiction,

তরুণ হরিনাথ ধনীর পুত্র, তাঁহার এক দূর-সম্পর্কীয়া পিসিমার বাটিতে গিয়াছিলেন। ঠিক মনে নাই—শিকার উপলক্ষ্যে গিয়া, পরিচয় হইয়া যায়। জল-তৃষ্ণা পাইয়াছিল, বসতি-বিরল ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম, দূরে দূরে এক আধটি চালা রহিয়াছে। অর্দ্ধভগ্ন চালা দেখিয়া তাঁহার জল চাহিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না, হয় ত কি মরলা জল আনিয়া দিবে। হাতে বন্দুকসহ হরিণাল, ভিত্তিরগুলি ঝুলাইয়া পথ চলিতে চলিতে চোখে পড়িল একটি সুসংস্কৃত বেশ বড় গোছালো বাটি। সম্মুখে রাংচিতা-ঘেরা অঙ্গনে দুইচারিটি ফুলের গাছ ও তুলসীমঞ্চ রহিয়াছে। ঝকঝকে করিয়া লেপা পোঁছা উঠান। জল চাহিতে মনস্থ করিয়া হরিনাথ অগ্রসর হইতেই একটি মধ্যবয়স্কা বিধবার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তৃষ্ণা জানাইতেই তিনি সাদরে আহ্বান করিয়া বসাইয়া মিষ্টি জল দেন। এবং সেই স্বল্প সময়ে পরিচয় প্রকাশ হইয়া যায় যে, তিনি দত্ত মহাশয়ের কি যেন এক সম্পর্কে ভগ্নী হন। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। তখন তিনি আহারে আমন্ত্রণ করেন।

হাসিয়া হরিনাথ বলেন—না পিসিমা, আজ থাক,বাড়ী যাই, এতলোকে মেয়ে যদি সদ্ব্যবহার না করি তবে আমার মন বলবে যে পাপ করলুম।

পিসিমা বলিলেন—ওমা, তা কেলবে কেন? ও আমি এখুনি রান্না করিয়ে দিচ্ছি। চাকরটা ছাড়িয়ে দিব, আর বালতী রেঁধে দেবেখন একটা ইঁটের উনুনে কাঠ জ্বালিয়ে।

হরিনাথ বিব্রত হইয়া কহিলেন—না না, অত হাঙ্গামা করবেন না। আমি এমনিই বলছিলাম।

পিসিমা ততক্ষণে হাঁকিতেছেন, বালতী,ও বালতী, কোথায় গেলি?

'এই যে আঠাইমা' বলিয়া দূর হইতে সাড়া দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া একটি কিশোরী। শোনা যায় নাকি সে সুন্দরী ছিল না। তবে চতুর্দ্দশ বসন্তের স্নেহ তাহাকে সাজাইয়াছিল। তাহার চল চল আঁখিতে আসিয়াছিল লজ্জা, সমস্ত দেহ ভরিয়া আসিয়াছিল শ্যাম সৌন্দর্য্যের জোয়ার। তরুণ হরিনাথ নাকি প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, love at first sight.

তাহার পর হইতে তাঁহার বারোমাসের দীঘির ধারে শিকার-প্রাচুর্য্যের উপলক্ষ্যে গিয়া পিসিমার বাড়ী বসিয়া গল্প চলিতে লাগিল। মধ্যে রহিলেন পিসিমা, দুইটি তরুণ-হৃদয়ের বিনিময় হইয়া গেল। পিপাসিত আঁখি উভয়ে উভয়কে খুঁজিয়া ফেরে। বারেক চাহনি সহস্র অকথিত বাণী উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। দেখিয়া আর আশা মেটে না।

ক্রমে পিসিমাও বুঝিতে পারিলেন তাহাদের অকৃত্রিম ভালবাসার কাহিনী। তিনি খুশী হইলেন। তাঁহার পালিতা কন্যার মত দেবর-ঝিটি ভাল পাত্রেই পড়িবে, ছেলেটি ভাল।

ভাবিতে লাগিলেন, এইবার একদিন চানকে গিয়া দাদা-বৌদির নিকট কথাটা উত্থাপন করিতে হইবে। আলস্যবশতঃ যাইতে তাঁহার কিছু বিলম্ব হইয়া গেল।

তিনি গিয়া শুনিলেন—তাহা হয় না। আরো মাস-খানেক আগে আসিলে বিবেচনা করা চলিত। দত্তমহাশয় স্বয়ং এক দরিদ্র বিধবাকে বাগ্‌দান করিয়াছেন যে, তাঁহার কন্যাটিকে তিনি লইবেন, সেও আশা লইয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে।

পিসিমা নিরাশ চিত্তে চলিয়া আসিলেন।

হরিনাথ কিন্তু সহজে বুঝিল না। বলিল, "আমায় তো তোমরা আগে বলনি ?"

ভাড়াটাকু'রা অবাক্ হইয়া গালে হাত দিলেন,বলিলেন, —"শোন কথা। তোর বিয়ে কি তোকে বলে হবে নাকি ? তাহার পর একগাল হাসিয়া বলিলেন,সে যা মেমসাহেবের মত বউ আসছে, দেখলে আর ঘর ছেড়ে নড়তে চাইবি না।" তখনকার দিনের হরিনাথ বেহায়া হইয়া মায়ের নিকট আবেদন করিল। মা পুত্রের মুখ দেখিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, কর্ত্তাকে বলে দেখি।"

কিন্তু সূর্য্যচন্দ্র টলিতে পারে,তবু দত্তমহাশয়ের বাক্যের নড়-চড় হইবে না। মনান্তর, খোসামোদ কাকুতি-মিনতি ও মায়ের অশ্রুতে অবশেষে বিশ বৎসরের তরুণ হরিনাথ বিবাহে সম্মত হইল।

পিসিমাও মালতীর সন্ধান সুরু করিয়া দিয়াছেন। মালতীকে শুনাইয়া শুভকে বলেন, "রাজপুত্তুরের মত ছেলে খুঁজে যে দেবো আমার মালুর। দেখে কি আর পাত্তর নেই নাকি ?"

কিন্তু পিসিমা বুঝিতে পারেন নাই যে, সেই দুটি আঁখির ভাষা কত গভীর ছিল।

মালতীর ঘুমিয়া বিবাদ হইয়া গিয়াছে। পিপাসিত দুইটি নয়ন বারবার সঙ্কীর্ণ বনপথের দিকে চাহিয়া ব্যর্থ হইয়া ফেরে। কতদিন—কত দিন তাঁকে দেখা যায় নাই ? তিনি নিশ্চয় আসিবেন, মালতীকে তিনি গ্রহণ করিবেন।

তাহার পর একদিন পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। লাল রংয়ের খামে মোড়া শুভবিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র। মালতী পড়িয়া পিসিমাকে শুনাইল।

তার পরদিন প্রভাতে শুনা গেল পিসিমার বুকফাটা চীৎকার। "আমার মালুকে ছেড়ে কেমন করে থাকব আমি ? ওরে কি কুক্ষণে কালসাপ ঘরে ঢুকেছিল রে।"

চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা তাহার আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদকে হারাইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে। গলায় কাপড় বাঁধিয়া ঝুলিয়া আছে।

সে খবর হরিনাথের কাছে পৌঁছিবামাত্র সুন্দরী বধূর অপরূপ রূপ চিরদিনের জন্য তাহার নিকট অর্থহীন বিস্বাদ হইয়া গেল। মালতী চিরদিনের ব্যবধান হইয়া রহিল দুইজনের মধ্যে।

দুঃখের স্মৃতি মনকে ক্ষণকালের জন্য বিষণ্ণ করিয়া দিল। শুভ অসিত মন্থরপদে চলিতে লাগিল।

সম্মুখে সাইকেল চালাইয়া যেন কয়েকটি যুবক আসিতেছে। গানে গল্পে রাত্রির শুন-বিরল পল্লীর পথ মুখরিত হইয়া উঠিল। অসিতের মনে যেন আপন যৌবন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

বাল্যকাল। পিতামাতার তখন সে একমাত্র পুত্র। নিশীথের জন্ম হয় নাই। সারাদিন ডালি খেলা, ছুটাছুটি, বাগানে বসিয়া থাকা, ধূলাবালি মাখা। পরিষ্কার করিতে করিতে মায়ের সস্নেহ তিরস্কার অতিমাত্র মনে পড়ে। তাহার পর স্কুলের গণ্ডী ছাড়াইয়া কলেজ। গান-গল্প, হাসি-আড্ডা। শুধু দ্বিপ্রহরে নির্জ্জন বাগানে লিচুতলায় বসিয়া পুকুরের দিকে চাহিয়া থাকা, আর ভাল লাগে না। কর্ম্মব্যস্ত দুরন্ত জীবনের হাতছানি তখন ডাক দিয়াছে। মা চলিয়া গিয়াছিলেন আট্‌ইয়ারের আরম্ভেই। হয়ত ভালই হইয়াছিল। তাহার জীবনের পন্থা যে গতি লইয়াছিল, তাহাতে হয়ত মাতা সুখী হইতেন না।

পন্থা কি ভুল হইয়াছিল ? অসিত বারংবার মাথা নাড়িল—ভুল নয়, তাহা ভুল নয়। অগ্নিগর্ভ অজিতদা, রবীনদা সুধেন্দু, শুভ, এদের অকপট বিশ্বাস কি ভুল ? ভুল নয়, তাহা সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়, দেশপ্রেমের প্রথম ভিত্তি। অভ্রভ্র জীবন ডালি দিয়া তবে তো আসিবে স্বাধীনতার নব প্রভাত ?

হৃদয়-পিণ্ড ছিন্ন করিয়া রক্ত ভরিয়া দিতে তাহারা তো দ্বিধা করে নাই ? জীবন, যৌবন, প্রাণ, প্রেম, বিদ্যা, স্নেহ, মমতা, সবই তো তাহারা পরাধীনা মায়ের শৃঙ্খল ঘুচাইতে ডালি দিয়াছে। তখনকার যে রণভেরী

শুধুমাত্র কয়টি যুবকের প্রাণে বাজিয়াছিল, আজ যে তাহার প্রতিধ্বনি দিকে দিকে শোনা যায়।

যুবকগুলি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে।

অসিতকে দেখিয়া তাহারা থামিল। অপরিচিত আগন্তুক—তাহারা এক নিমিষে বুঝিয়াছে। কি যে গল্প তাহারা করিতেছিল, তাহা থামিয়া গেল। একটি যুবক অগ্রসর হইয়া অসিতকে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাবেন ম'শাই? আপনাকে যেন নতুন দেখছি?" অসিত হাসিল, বলিল—হাঁা, তা নূতন বলতে পারেন, অনেকদিন পরে আসছি এখানে। যাব মনোমোহন বাবুর বাড়ী।"

তাহারা থামিল না। একজন জিজ্ঞাসা করিল মনোমোহন বাবুর বাড়ী যাবেন কেন? তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, মুখ গম্ভীর।

তাহাদের মধ্যে চাপা গলায় কি যেন কথা হইল, চক্ষে চক্ষে যেন ইঙ্গিত খেলিয়া গেল।

আপনার নামটি কি? আর একজন প্রশ্ন করিল। অসিত বলিল আমার নাম অসিত। তাহার পর আর কথা বাড়িতে—না দিয়া বলিল—আমার কিন্তু এবার যেতে হয়; না খবর দিয়ে উঁর বাড়ীতে যাচ্ছি, বেশী দেরী হলে তিনি অসুবিধায় পড়বেন বলিয়াই সে অগ্রসর হইল।

খানিকটা অগ্রসর হইয়া কুলীটা মন্তব্য করিল "বাবু-গুলো বাউরা আছে বাবু।"

ছেলের দল কিন্তু যে পথে যাইতেছিল সেদিকে না গিয়া যে দিক হইতে আসিয়াছিল সেইপথে অগ্রসর হইল।

অসিতকে অতিক্রম করিবার সময় একজনের অস্ফুটোক্তি শোনা গেল—বেটা স্পাই।"

ওঃ! তাই। অসিত এতক্ষণে হাসিল। স্পাই ভাবিয়া তাহারা এতক্ষণ অস্ত্রের মত জেরা করিয়াছে। এবার কাকার বাড়ীতে তাহার জন্য অভ্যর্থনার কি আয়োজন করিবে কে জানে? যদি দুই চারি ঘা দিয়া দেয় তো মন্দ প্রহসন হইবে না। অসিত হাসিল। কুলীটি জিজ্ঞাসা করিল—আউর কেত্তো দূর বাবু?

অসিত বলিল "আর মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে যাব বাবা। ভোলানাথ বসুর হাসপাতাল পার হইয়া, গভর্ণমেণ্টস্কুলের সীমানা ছাড়াইয়া নৈতলা তলার মোড়ে আসিয়া পৌঁছিল। অসিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—রাস্তার দুই পার্শ্বে অজস্র দোকান বসিয়াছে। সন্ধ্যগম, বেচাকেনা চলিতেছে। বাস-ষ্ট্যাণ্ডে বাস দাঁড়াইয়া আছে, এখনি ছাড়িবে। চায়ের দোকানে বহু যাত্রীরা খাইতে বসিয়াছে।

বড় রাস্তা হইতে নামিয়া পরিচিত সরু পায়ে-চলা পথটি দিয়া ভোলা কম্পাউণ্ডারের বাড়িখানিতে শেষ হইয়াছে। অর্দ্ধভগ্ন ছোট বাটিখানি তেমনি রহিয়াছে। বাহিরের ঘরে ছোটছোট ছেলেরা লণ্ঠন জ্বালাইয়া পড়িতে বসিয়াছে। ভোলা তো বিবাহ করে নাই? সম্ভবতঃ তাহার ভাইদের পুত্রকন্যা হইবে।

ভোলা কম্পাউণ্ডারকে অসিত বাল্যকাল হইতে দেখিয়াছে। অতি সাদাসিধা স্বল্পভাষী দরিদ্র যুবক। বড় বড় সংসারটি বাল্যকাল হইতে বহন করিয়া আসিতেছে। পনেরো বৎসরে পিতার মৃত্যুর পর পড়া ছাড়িয়া হাসপাতালে কম্পাউণ্ডারের চাকুরী লয়। গৃহে পোষ্য ছিল বিধবা মাতা, তিনটি নাবালক ভ্রাতা, অবিবাহিত ছোট একটি ভগ্নী।

অসিত বাল্যকালে দেখিয়াছে নিয়মিত তাহাকে হাঁসপাতালের ডিউটি সারিয়া তিনটায় ফিরিতে। কিন্তু কোন্ প্রত্যূষে সে হাঁসপাতালে যাইত তাহা তাহারা জানিত না। অতি শুভ্র তাহার বস্ত্র ও সুন্দর সুপুরুষ আকৃতিতে, কখনও তাহাকে বেশভূষা করিতে দেখা যাইত না। হাফহাতা টুইলের শার্ট, বহুলস্ত্রী মিলের ধুতি, তালতলার চটি, এই তাহার সজ্জা ছিল। তাহার বেতন ও ড্রেস করিয়া দিয়া যাহা উপার্জ্জন হইত সবই সে মায়ের হাতে দিত, তিন চার খানি গ্রাম হইতে রোজগার তাহার মন্দ হইত না। কোনও নেশা তাহার ছিল না। অত্যন্ত মিতব্যয়ী ভাল মানুষ ছিল। সবাই ভোলাকে ভাল ছেলে বলিয়াই জানিত।

হঠাৎ একদিন সব উল্টাইয়া গেল। শোনা গেল, বহু-দিন হইতে গঙ্গার অপর পারে ভোলার এক প্রণয়িনী ছিল

তাহার নিকট তোলা যাইত। সে খবর পাওয়া গেল ব্যক্তিটির মৃত্যুর পরদিন তোলার অনুপস্থিতিতে। তোলা কোন দিন গৃহে অনুপস্থিত থাকে না। সেই-দিন রাত্রে ও তাহার পরদিন সকালে তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া হাসপাতালে ডাক্তারবাবুর নিকটও সঠিক খবর না পাইয়া তাহার মাতা কান্নাকাটি সুরু করায় পাড়ার ছেলেরা খবর লইতে লইতে এই খবর আবিষ্কার করে ও তোলাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ওপাড় হইতে লইয়া আসে। সে তখন শবদাহ অন্তে ঘাটে বসিয়া ছিল। তাহার শোকাচ্ছন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে, কিছু বলিতে সাহস করে নাই। সেই একটি দিন তাহাকে লোকে বিচলিত দেখিয়াছিল। পুনরায় তাহার স্বাভাবিক গতানুগতিক জীবন সুরু হইয়া গেল। জীবনে আর কোনও দুশ্চরিত্রতার কাহিনী শুনা যায় নাই। বিবাহ সে কোন মতেই করিল না। নিঃশব্দে সে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া হয়ত এতদিনে সরিয়া গিয়াছে। ভ্রাতাদের বিবাহ দিয়াছে, ভগ্নীটির বিবাহ দিয়াছে। আর আজীবন ওই কম্পাউণ্ডারী ও ড্রেসারী করিয়া গিয়াছে। উহার পর হইতে গ্রামের লোক তাহাকে গোপনে যত নিন্দাই করিয়াছে। "বাবা তিজে বিড়াল, ডুবে ডুবে জল খাওয়া। এত যে স্বভাব খারাপ, তা একটি দিন কেউ জানতে পারে নি।" ইত্যাদি।

বালক বয়সে শুনিয়া শুনিয়া অসিতও তোলাদাকে ঘৃণা করিয়াছে। পরে অসিত সবিস্ময়ে চিন্তা করিয়াছে এতখানি একনিষ্ঠ প্রেম এই নিরক্ষর যুবকের অন্তরে ছিল যে প্রেমাস্পদার মৃত্যুর পর সে ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিয়া গেল একান্ত নিঃশব্দে। সে কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যে না ছিল আড়ম্বর, না ছিল হা-হুতাশ। তাহার ত্যাগ, সংযম, প্রেম বাহিরের কাছেও মর্য্যাদা পাইল না, কেন না, সে বারবনিতাকে ভাল বাসিয়াছিল। সে মূর্খ নির্ব্বোধ, এই আখ্যাই পাইয়া গেল। অথচ? অথচ বিনয়।

এই গ্রামেরই একটি ভাল ছেলে। বরাবর ভাল করিয়া পাশ করিয়াছে, ডাক্তারী পড়িতেছিল সেই, সময় এক নার্সের সহিত তাহার পরিচয় হয় এবং সে পরিচয় ক্রমে প্রণয়ে পরিণত হয়। বিনয় তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া ওঠে। এমন কি, ওই নার্সটির সহিত বিবাহ না দিলে সে দেশত্যাগের সঙ্কল্পও জানায়। পিতামাতা তাহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন ও ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সেই এ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়েটীকে গোপনে পত্র দেন যে, সে যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার পুত্রকে মুক্তি দেয়।

নার্সটির নাম ছিল ডেইজী। ডেইজী মেয়েটি সম্ভবতঃ ভালমেয়ে ছিল। এবং সে প্রকৃতই ভালবাসিয়া-ছিল বিনয়কে। সে বিনয়কে জানাইল যে, এ-বিবাহ হইবে না। পিতামাতার মনে বেদনা দিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না, অতএব বিনয়কে সে বিবাহ করিতে পারে না।

বিনয় বলিয়াছিল যে, সে আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা সব পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত আছে।

ডেইজী দৃঢ়ভাবে অসম্মতি জানাইয়াছিল। না, তাহা হয় না। আমার মূল্য এত অধিক আমি মনে করি না যে, যার জন্য তোমার সব পরিত্যাগ করতে হবে। আর আজ জিদের খাতিরে যে ত্যাগ করবে তার জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে তোমার মনে অনুতাপ হবে কি না সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিত নও। আর আমিও সারাজীবন তোমার পিতামাতার নিকটে নিজেকে অপরাধী মনে করব যে, আমি তাঁদের প্রাণাধিক পুত্রকে তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছি। যাঁদের স্নেহ প্রার্থনীয়, তাঁদের অভিশাপ নিয়ে জীবন আরম্ভ করা আমি সমর্থন করি না, তাতে আমার যত কষ্ট হয় হোক্।" বিনয়কে ভুলিতে সে ট্রান্সফার হইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছিল। বিনয় বেশীদিন অপেক্ষা করে নাই, সুবোধ বালকের মত পিতামাতার নির্ব্বাচিত পাত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল। সমস্ত পাড়ার লোকে বলিয়াছিল যে, বিনয়ের মত ভালছেলে হয় না, কি বাধ্য বাপ-মার ইত্যাদি।

পরে শুনা গিয়াছিল যে, সেই নার্সটি বিবাহ করে নাই। এবং কলিকাতা ছাড়িয়া থাকিতেও পারে নাই, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। বিনয়ের এক বন্ধুর নিকট

বাঁধিয়া বলিয়াছিল, "এখানে তবু সিনেমার স্মৃতি আছে তো? তাই আমি ফিরে এলাম।"

কিন্তু বিনয় ভুলিয়া গিয়াছিল সম্পূর্ণরূপেই। পরবর্তী জীবনে তাহার ব্যবহারেই তাহা প্রকাশ পাইত। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া সে ঘোরতর সংসারী। বিনয় ও ভোলা দুইটি পাশাপাশি এক্সট্রিম্স। অসিতের মুখে মৃদু হাসি খেলিয়া গেল। গৃহ নিকট হইয়া আসিতেছে।

এইবার অশ্বত্থতলার মোড় ঘুরিলেই চোখে পড়িবে অসিতের পিতৃগৃহ; আর একটু অগ্রসর হইয়া যাইলে কাকার বাড়ী। সারাগ্রামের প্রতিটি ভবন, প্রতিটি পথ, প্রতিটি জায়গা জুড়িয়া বাল্যের ও যৌবনের নানা স্মৃতি বর্ত্তমান। অতীত স্মৃতি মন্থন করিয়া মন কখনও প্রফুল্ল, কখনও বিষণ্ণ হয়। তবু তাহা স্মরণ করিতে আনন্দ। এই বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষই কত দিনের কত স্মৃতি বুকে ধরিয়া আছে। তাহার পার্শ্ব দিয়া এই পথ কত পরিচিত বুকে লইয়াছে, দেশপূজ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইহার বক্ষ বিভূষিত করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী এখানে বক্তৃতা দিতে আসিয়াছিলেন। দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী কতবার এখানে আসিয়াছিলেন। এই গ্রামের নিকট তাঁহার গৃহ। নাম-জানা অজানা কত মহাত্মা ইহার উপর দিয়া গিয়াছেন। আর তাহার ব্যক্তিগত জীবনেও ইহার ধূলি কত পবিত্র, পিতা পিতামহ সপ্তপুরুষের চরণরজঃ ইহাতে মিশ্রিত আছে। পবিত্র জন্মভূমি মাতৃভূমি।

অসিতের চোখে জল আসে। তাহারই চোখের সম্মুখ দিয়া এই পথ দিয়া মা তাহার চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছেন। সারা পৃথিবী সেদিন অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল অসিতের নিকটে। কিশোর বয়স তাহার তখন। দূরে অস্পষ্ট কোলাহল শ্রুত হইতেছে, কাহারা যেন আসিতেছে। একবার কান পাতিয়া শুনিয়া আবার অসিত অন্যমনস্ক হইয়া গেল। গ্রামের বহু পরিবর্ত্তন চোখে পড়িয়াছে। অসিত আপন মনেই ভাবিতেছিল, সেই শান্তিপূর্ণ আব-হাওয়া-ভরা ক্ষুদ্র গ্রামখানি যেন অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে। মৈত্রের বড় বাগান ভরিয়া দুইটা সিনেমা-হাউস উঠিয়াছে! মুখুজ্যেদের বাজারে আগে মিট মিট করিয়া যেরোসিন জ্বলিত। শুদ্র বাজার! তথায় ইলেক-ট্রিকের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। জনকোলাহলে মুখরিত সরগরম বাজার।

অসিতের মনে কেমন এক অব্যক্ত বেদনা গুমরিয়া কেঁদে। কি যেন চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। জীবনটা যেন একটা চলন্ত ট্রেণ। কত যাত্রী উঠিতেছে, নামিতেছে। তবে যাহারা একবার নামিয়া যায় আর তাহাদের দেখা যায় না। এই গ্রামে যাহারা ছিল তাহারা আর নাই, সেই সব দিনগুলিও সেইসঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। সব অতীতে হারাইয়া গিয়াছে। অসিত যেন সহসা আসিয়া পড়িয়া সেই পথে একাকী চলিতেছে সঙ্গী-সাথী-হীন। বুকের ভিতরে একটা শূন্যতা বোধ হয়। দূরে দেখা গেল অনেকগুলি লোক মিলিয়া একটি জনতা অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, হাতে তাহাদের লণ্ঠনের আলো। কোলাহল হইতেছে প্রচুর। অসিত চাহিয়া রহিল।

তাহাদের মধ্য হইতে সু-উচ্চ হর্ষধ্বনি শোনা গেল, ওই যে! ওই যে আসছেন।

অসিত সবিস্ময়ে চাহিল।- সেই যুবকগুলিও যেন উহাদের মধ্যে রহিয়াছে? এক ব্যক্তি দ্রুতপদে তাহাদের মধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অসিতকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। কাকা! কাকা অসিতের সমবয়স্ক। খদ্দর-পরিহিত সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্রলোক। দীর্ঘ ষোল বৎসরের অদর্শন। দুই জনের আঁখিই অশ্রুপূর্ণ। ছেলের দল একবার চীৎকার করিল মহাত্মা গান্ধী কী জয়। তাহার পর দল বাঁধিয়া আসিয়া প্রণাম করিতে ও মালা পরাইতে শুরু করিল। কলরবে স্থানটি ভরিয়া গেল। সেই যে যুবকটি নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—সে অনুযোগের স্বরে বলিল, "দাদা, আপনি আসে কেন খবর দেন নি, আমরা ষ্টেশন থেকে আপনাকে নিয়ে আসতাম? এত যে হয়েছে, সে শুধু কাকাকে আপনার নাম বলাতে তিনি বললেন যে, আপনিই সে অসি।

অসিত হাসিয়া বলিল—আমি তো বুঝতে পারিনি যে, এত সমাদর আমার অদৃষ্টে আছে, ভেবেছিলাম স্লাইকে ধরে তোমরা মারবে। ছেলেটা হাসিল, বলিল—আপনি

শুনতে পেয়েছিলেন? কিন্তু কেন? কেন এমন করে আমার তোমরা লজ্জা দিচ্ছ বলতে? আর একটি যুবক অগ্রসর হইয়া মালা দিয়া বলিল—"আপনার লজ্জা? আমাদের লজ্জা যে, আপনাকে আমরা তেমন করে অভ্যর্থনা করতে পারলাম না। আপনি আর বিপিনদা' আপনারা আমাদের গ্রামের—আমাদের দেশের গৌরব, আপনাদের নাম করতে আমাদের বুক ফুলে ওঠে। বলুন তো কাকা?" কাকার দিকে চাহিল। কাকা মৌন মধুর হাসিতে সম্মতি জানাইলেন ও বলিলেন—তুমিও তো যারা এদেরই পথের অনুসরণ করেছ। অসিতকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—জান, অসিত, রবীন আমাদের বিপ্লবের একজন নেতা।

তাহার পর অসিতকে লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া কাকার বাটির দিকে সকলে অগ্রসর হইল। উত্তেজিত কণ্ঠে যুবার দল আলোচনা করিতেছে যে, কাল কি প্রোগ্রাম হইবে, কোথায় মিটিং হইবে, কে সভাপতি হইবে ইত্যাদি।

কাকা অসিতের হাতটি মুঠিতে চাপিয়া ধরিয়া নীরবে পথ চলিতেছেন। তাঁহার বলিষ্ঠ মুষ্টির চাপে তাঁহার অন্তরের নিরুদ্ধ আবেগ বুঝা যাইতেছে।

শুক্লা একাদশীর চন্দ্র মধ্যগগনে অগ্রসর হইতেছে, তাহারই রূপালী কিরণে গ্রাম্যপথ উদ্ভাসিত হইয়া একটি বিছানো সৈনিক আস্তরণের মত সম্মুখে চলিয়া গিয়াছে। পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অসিতের মনে হইল—পথে তো সে একাকী নহে? যাত্রা একাকী সুরু হইয়াছিল বটে, কিন্তু আজিকার যাত্রাশেষে তাহাদের গ্রাম হইতে তাহারই যৌবনের প্রতীক আজ পথ ভরিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার কার্যাবসেষের পুরস্কার বিজয়মাল্য তাহাকে পরাইয়া দিয়াছে। এই পথ দিয়া সে পরিতৃপ্ত আনন্দের শেষ ডালি বহন করিয়া লইয়া চলিয়া যাইবে। পশ্চাতে রহিল পথ, সেই পথ ভরিয়া রহিল স্বাধীনতা-যুদ্ধের এইসব নূতন সৈনিক। ইহারা আনিবে বিজয়। পুরুষানুক্রমে এ-পথ ভরিয়াই থাকিবে।

মহাপৃথিবীর পথে

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

তাঁবু তুলে নাও। যাত্রারম্ভ হোক
শেষ বন্ধুর দুর্গম পথে: যার খোলে এর লোক।
শেষ বাহিনী তীক্ষ্ণ হয়ত ফেলে, কেটে কুয়াশার স্তূপ—
অবগুণ্ঠন তুলে মুখ চিনে যায়াবী যুগের রূপ—
ভেঙে আইনের শিকল-নিগড়, ছিঁড়ে শোষণের জাল—
বাড়িয়ে সবল-মুক্ত-করু উত্তাল,
পরি-পাশ্বাচীরে উদ্যত প্রতিরোধ,
চোরাবালি-ফাঁদ পিছল কাদার সলিল প্রতিশোধ,
দুর্যোগের নীচে স্বার্থের কূট ভ্রূকুটি ও তর্জিমা—
পেতে হবে জেন বহু প্রার্থিত মহাপৃথিবীর সীমা।

চেতনার দূরবীণে—
যে মহাপৃথিবী দূর থেকে আজ নিতে পা'র সবে চিনে,
সে ও সবকার নামে পাবে পরিচিতি,
শেষ করে দেবে শোষণ-শাসন কংসোষের নীতি:
ঘটাবে জীবনে সেতু-বন্ধন, মাটি ও আকাশে মিল,
ঘুচে যেবে সব আল-বাকর-খাচিল-কচিল-খিল,
অনেকী লালসা-তৃষ্ণার কারবেস,—
ছিন্ন জীবন-বীণাখানি বেঁধে অখণ্ড মহাবেশ:
চাবুক-লাগাম হাতে নেবে জনতার,
কায়েমী পাষাণ-ভিত চ'যে চ'যে ফসলের সম্ভার।

চেয়ে দেখ পশ্চাতে—
সকল দেশের সর্বহারারা আসে হাতিয়ার হাতে।
কেন আর ভয়? বাজাও বিপ্লব-হুইসেলে সঙ্গীত,
বর্ষাঘটের হাকে মন-ইঙ্গিত:
উত্তাহারের মশালের মুখে রক্ত-ইসারা জ্বালো,
একই রাখি দিক পরিচয় ভয়কালো:
বিজয়-নিশান তোলো,
সুদৃঢ় শপথে শীর্ণ চেতনা-দুয়ার দু'হাতে খোল:
স্থির জেন ইতিহাসে
প্রতি মুহূর্তে মহাপৃথিবীর দূরত্ব কমে আসে।

দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

যে-শাস্ত্র দ্বারা সত্যের দর্শন লাভ করা যায়, তাহার নাম দর্শনশাস্ত্র। ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ ফিলসফি (Philosophy)। ফিলসফি শব্দের ধাতুগত অর্থ জ্ঞানে আসক্তি। এই অর্থে যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানই দর্শন শাস্ত্রের বিষয়। সত্যের অনুসন্ধানই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, ইহা সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই শাস্ত্রের ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে।

প্লেটোর মতে যাঁহারা শাশ্বত পরিবর্ত্তনহীন সত্তা ধারণা করিতে পারেন তাঁহারাই দার্শনিক। আমাদের সম্মুখে প্রসারিত বিচিত্র ও সদা পরিবর্ত্তমান জগতের বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তনরাজির অন্তরালে যে সনাতন স্থাণু সৎ পদার্থ বিদ্যমান আছে, প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক দার্শনিকগণ তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন।

উইনডেল্‌বাণ্ড (Windelbund) এর মতে বিশ্ব ও মানবজীবন সম্বন্ধে সাধারণ প্রশ্নসমূহের বৈজ্ঞানিক আলোচনা অর্থেই বর্ত্তমানে ফিলসফি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

হেগেলের মতে পদার্থের বিচার-পূর্ব্বক আলোচনার (Thinking consideration of things) নাম ফিলসফি।

প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত হইলেও, জ্ঞানের ক্ষেত্র বর্ত্তমানে নানা ভাগে বিভক্ত হওয়ায় দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্র পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানের এক এক বিভাগের জন্য সৃষ্ট বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের সীমাংসা দর্শনশাস্ত্রের অধিগত হওয়ায়, দর্শনশাস্ত্রে তাহাদের আলোচিত বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু যে-সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃতির (Postulate) উপর ভিত্তি করিয়া বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের আলোচনা অগ্রসর হয়, তাহাদের আলোচনা দর্শনের অধিকারভুক্ত আছে।

বাল্‌ট্রাণ্ড রাসেলের মতে দর্শনশাস্ত্র ভৌতিক বিজ্ঞানের ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের (Theology) মধ্যবর্ত্তী। যে সমস্ত বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান লাভ এখন পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই, তাহাদেরই অন্তর্গত ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিষয়। দর্শন-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধেও বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নিশ্চিত জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় নাই। এই দিকে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বিজ্ঞানে যেমন পরম্পরাগত বিশ্বাস (Tradition) এবং প্রত্যাদেশ ও আপ্ত-বাক্যের (Revelation) স্থান নাই, দর্শনেও তেমনি তাহাদের কোন মূল্য নাই। ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ও ভৌতিক-বিজ্ঞানের মধ্যে যে অনির্দ্দিষ্ট লা-ওয়ারিশ স্থান (No man's Land) আছে তাহাই দর্শনের ক্ষেত্র। চিন্তাশীল লোকের মনে জগৎ সম্বন্ধে যে-সমস্ত গভীর প্রশ্নের উদয় হয়, ভৌতিক বিজ্ঞান তাহার অধিকাংশেরই সন্তোষজনক উত্তর দিতে অক্ষম। ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে ঐ সমস্ত প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায়, ভৌতিক বিজ্ঞান তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। জগৎ কি চিৎ ও জড় দুই ভাগে বিভক্ত? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে উভয়ের স্বরূপ কি? মন কি জড়ের অধীন? অথবা সমস্ত জগতে কি কোনও উদ্দেশ্য (Purpose) কার্য্য করিতেছে, অথবা ইহা অন্ধ শক্তির ক্রীড়াভূমি মাত্র? জগতে কি একত্ব আছে? দূরবর্ত্তী কোনও লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কি জগৎ অভিব্যক্ত হইতেছে, অথবা যদৃচ্ছাক্রমেই অভিব্যক্ত হইতেছে, কোনও লক্ষ্যই নাই? জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া কি বাস্তবিক কিছু আছে? অথবা আমাদের স্বকীয় প্রকৃতি শৃঙ্খলার জন্য লালায়িত বলিয়া আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি? জ্যোতির্ব্বিদের দৃষ্টিতে মানুষের যে রূপ ধরা পড়ে,—এক ক্ষুদ্র গ্রহে অতি কার্ব্বন ও জলের সমবায়জাত মন্থরগামী শক্তিহীন ক্ষুদ্র জড়পিণ্ড মাত্র,—মানুষ কি শুধু তাহাই, অথবা ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার পূর্ণ অধিকারী চিৎপদার্থ? মহৎ ও হীন জীবনের মধ্যে বাস্তবিক কোনও ভেদ আছে? অথবা "মহৎ", "হীন" কেবল কথা মাত্র, উভয়বিধ জীবনই অর্থহীন? যদি মহৎ জীবন বলিয়া কিছু থাকে তাহা হইলে তাহার বিশেষত্ব কি এবং কি প্রকারে তাহা আমরা অর্জ্জন করিতে পারি—মঙ্গল

(The good) কি শাশ্বত বলিয়াই কাম্য? অথবা শাশ্বত হউক বা বিনশ্বর হউক, দুঃখের ধ্বংস অনিবার্য্য হইলেও তাহা সাধনার উপযুক্ত ও বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞতা বলিয়া প্রকৃত কিছু আছে? অথবা তাহা মূর্খতার বিশুদ্ধ সংস্করণ মাত্র? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে মিলিবে না। ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ইহাদের উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু এই সমস্ত উত্তরের বিষয় ও দৃঢ় নৈশ্চিত্যই আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সন্দেহের কারণ হইয়াছে। ইহাদিগের আলোচনা ও উত্তর দিবার প্রচেষ্টা দর্শন-শাস্ত্রের কাজ।

সভ্যতার প্রারম্ভ হইতে মানুষের মনে এই সমস্ত প্রশ্ন জাগিয়াছে এবং মানুষ তাহার উত্তর দিতেও চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আলোচনার নিবৃত্তি হয় নাই। মানুষের কৌতূহল আজিও অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে। এক যুগে যে মীমাংসা গৃহীত হইয়াছে, পরবর্ত্তী যুগে তাহাতে সংশয় জাগিয়াছে। নিত্য নূতন মীমাংসার সন্ধানে মানুষের মন ব্যাপৃত আছে। কিরূপে অসৎ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়া পৃথিবী ক্রমে গ্রহে পরিণত ও শৈবলের প্রাণ ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে আবির্ভূত হইয়া সুগঠিত মানবশরীরে অভিব্যক্ত হইল, কিরূপে মানুষ পশু-জীবন হইতে সুসভ্য জীবনে উন্নীত হইল, ইহা পৃথিবীর ইতিহাসের বিষয়। পৃথিবীতে কেবল জীব-শরীরেরই নিম্ন হইতে উন্নততর রূপে অভিব্যক্তি হয় নাই। অভিব্যক্তিধারার কোনও এক মুহূর্ত্তে এই শরীরের সহযোগী রূপে বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই বুদ্ধি আজ জগতের যাবতীয় বিভাগে জ্ঞান লাভের জন্য উৎসুক। এই বুদ্ধির বিকাশ ক্রমে ক্রমে হইয়াছে, উহার সাহায্যে আগুন ও অস্ত্রের আবিষ্কার করিয়া মানুষ জীব-জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বিশ্বের সমস্ত বিভাগের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য গবেষণায় ব্যস্ত আছে। জ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। পৃথিবী গৃহে কিরূপে অবস্থান করিতেছে, ইহার ব্যাখ্যায় এক সময়ে বলা হইত, বাসুকি স্বীয় মস্তকে তাহাকে ধারণ করিয়া আছেন। বেশী দিন এ ব্যাখ্যা চলিতে পারে নাই। অন্য কৌতূহল আবার জিজ্ঞাসা করিল, বাসুকিকে কাহা কল্পিয়া আছে সে? সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্য্যন্ত মানুষের মন স্থির হইতে পারে নাই। মানুষের বুদ্ধি ও তাহার চিন্তার অভিব্যক্তির যে ইতিহাস, তাহাই দর্শনের ইতিহাস।

হেগেল স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইতিহাসকে তিনি কেবল দার্শনিক মতের সংগ্রহ বলিয়া মনে করেন নাই, তাঁহার মতে জগতের অভিব্যক্তির ইতিহাসের ইহা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেশ-কালের অতীত প্রজ্ঞার (Reason) দেশ ও কালে প্রকাশই জগৎ। তাহার সম্বন্ধে সম্বদ্ধ (Logically connected) পদার্থনিচয়ের * সমবায়কে হেগেল "বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা" বলিয়াছেন। এই সমস্ত পদার্থ ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়াই তাহাদের সমবায় "বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা" নামে অভিহিত। দেশ কালাতীত এই সমস্ত পদার্থের (Categories) দেশ ও কালে ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও চিৎরূপে আবির্ভাবই এই দৃশ্যমান জগৎ। তাহাদের ন্যায়ের ক্রমে Logically process অনুসারে অভিব্যক্ত হওয়ার ইতিহাসই দর্শনের ইতিহাস।

যে সমস্ত বিষয় দর্শনশাস্ত্রে আলোচিত হয় বিভিন্ন পণ্ডিত তাহার বিভিন্ন মীমাংসা করিয়াছেন। "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না,নাসৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নম্"। সর্ব্ববাদিসম্মত নিশ্চিত মীমাংসা পাওয়া অসম্ভব। তবে

---

* পদের অর্থ যাহা তাহাই পদার্থ। ভাষার পদদ্বারা যাহা প্রকাশিত হয়, তাহার নাম পদার্থ। এই অর্থেই জায়শাস্ত্রে পদার্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁর মতে পদার্থ সাত প্রকার—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ১২টী categories of thought স্বীকৃত, এই categories-গুলি উপরোক্ত সাতটি পদার্থবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ বিজ্ঞান বলিয়া ইহাদিগকে pure বলে। যে সমস্ত universals (যথা ঘোড়, কুকুর, উদ্ভিদ, মিষ্টি প্রভৃতি) ইন্দ্রিয় সম্বন্ধযুক্ত তাহারাও পদার্থ। হেগেলের absolute, categories সমূহের সমষ্টি। দেশ-কালাতীত অবস্থা হইতে দেশ-কালে তাহাদের বাস্তবরূপ গ্রহণই সৃষ্টি। বস্তুতান্ত্রিক পদার্থ শব্দের অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে। দর্শনশাস্ত্রে প্রয়োজনে শব্দটিকে ভাষার পূর্ণ রূ

এই বৃথা আলোচনায় লাভ কি, এই প্রশ্ন অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু লাভ-লোকসানের কথা স্থান জ্ঞানের আলোচনায় নাই কৌতূহল মানব-মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখিয়া বিস্ময়-বিমূঢ় মন তাহার উৎপত্তি কিরূপে হইল জানিতে চায়। সুগঠিত জীবদেহ দেখিয়া, কে তাহা গঠন করিল জানিবার ইচ্ছা স্বতঃই তাহার মনে উদিত হয়। এই কৌতূহলের সীমা নাই, নিবৃত্তিও নাই। সুতরাং লাভ থাকুক, না থাকুক, মানুষের মন এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করিবে এবং উত্তর জানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিবে। কিন্তু লাভ যে নাই তাহাও নহে। সাংখ্য-কার বলিয়াছেন, দুঃখনিবৃত্তির উপায় আবিষ্কারই সাংখ্য-দর্শনের উদ্দেশ্য। দর্শনের আলোচনায় যাহা দার্শনিক মনোভাব (Philosophical Temparament) লাভ করিতে পারিলে, জীবন যে অনেকটা মানসিক চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা সত্য। দার্শনিক মন শোক-দুঃখে অভিভূত হয় না। ইহা ভিন্ন দর্শনালোচনার অন্য প্রয়োজনও আছে। সে প্রয়োজন ঐতিহাসিকের। কোন জাতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জগৎ ও মানবজীবন সম্বন্ধে সে জাতির কি ধারণা ছিল, তাহারা কোন কার্য্যকে ন্যায় ও কোন কার্য্যকে অন্যায় মনে করিত—তাহা জানা প্রয়োজন, কেন না, এই ধারণার দ্বারাই মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আবার সেই জাতির, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে, সেই যুগে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও জানা প্রয়োজন। দর্শনে জ্ঞান না থাকিলে সুষ্ঠু ভাবে উভয়ের মধ্যে এই পারস্পরিক কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় না।

বারট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "আমাদের পক্ষে কি জানা সম্ভবপর এবং কি জানা অসম্ভব তাহা যদি আমরা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে অনেক গুরুতর বিষয়ে আমরা উদাসীন হইয়া পড়ি। যে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই সে বিষয়ে ব্রহ্মবিজ্ঞান দৃঢ় বিশ্বাসে এমন সমস্ত কথা বলে, যাহাতে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মে এবং তাহাদের প্রতি উদ্ধত অবজ্ঞার উদয় হয়। প্রবল বিশ্বাস ও আশঙ্কা যেখানে বর্ত্তমান নৈশ্চিন্ত্যের অভাব সেখানে যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু আয়াসদায়ক কল্পিত কাহিনীর সহায়তা ব্যতিরেকে যদি আমরা বাঁচিতে চাই, তাহা হইলে অনৈশ্চিন্ত্যের বেদনা সহ্য করিতেই হইবে। দর্শন যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে তাহা ভুলিয়া যাওয়াও যেমন হিতকর নহে, তেমনই সে সমস্ত প্রশ্নের নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর পাওয়া গিয়াছে—এই বিশ্বাসেও আমাদের মঙ্গল হয় না। নৈশ্চিন্ত্যের অভাবেও বিবাদমতঃ পক্ষাহত না হইয়া কিরূপে জীবন যাপন করা যায়, তাহা শিক্ষা দেওয়া বর্ত্তমান যুগে দর্শন-শাস্ত্রের মুখ্য কাজ।

দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে কোন জাতির কি দান তাহা উল্লেখযোগ্য। ইউরোপে গ্রীস দেশেই প্রথম দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ হয়। তাহার বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রাচীনতম গ্রীক দার্শনিক থালিসের সময়ে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অনেকটা পরিণতি লাভ করিয়াছিল। চীনদেশেও অতিপ্রাচীন কালে দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। গ্রীক দর্শন মিসরের নিকট যে কিছু পরিমাণে ঋণী তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রীক দার্শনিকগণ দর্শনের সমস্যাগুলিকে যে আকারে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহারা ইউরোপে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেই আকারেই মনীষীদিগের চিন্তা প্রভাবিত করিতেছে। দর্শনের ইতিহাসে প্রাচীন রোমের কোনও দান নাই বলিলেই চলে, রোমের দান ব্যবহার-শাস্ত্রে। রোমক দার্শনিকগণ গ্রীক দর্শন-কর্ত্তৃক প্রভাবিত ছিলেন। গ্রীসে এথেন্স নগরী দর্শনালোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্পার্টার সহিত বহুদিনব্যাপী যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইবার পরেও সহস্র বৎসর যাবৎ দর্শনালোচনা এথেন্সে অব্যাহত ছিল। অবশেষে ৫২৯ খৃঃ রোমক সম্রাট জাষ্টিনিয়ান খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারে বাধা দূর করিবার জন্য এথেন্সে দর্শনালোচনার চতুষ্পাঠীগুলি বন্ধ করিয়া দেন। সেই দিন হইতে অজ্ঞানান্ধকার ইউরোপের উপর নামিয়া আসে। গ্রীক দর্শন যে কেবল পশ্চিমে রোমে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা নহে। পূর্ব্বে মিসর ও আলেক-জান্দ্রিয়াতেও তাহার বিস্তার হইয়াছিল। খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মের

ফিলো (Philo) গ্রীক দর্শনের সহিত খৃষ্টধর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় শতাব্দীতে হিন্দুবংশীয় প্লোটিনাস (Plotinus) প্লেটোর দর্শনকে ভিত্তি করিয়া নব প্লেটোনিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন, একাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের প্রভাবে ইউরোপে স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে যে-সমস্ত দার্শনিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন খৃষ্টধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তিস্থাপনেই তাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন। আধুনিক দর্শনের আরম্ভ জার্ম্মানীতে, তার পর ইংলণ্ড, স্কটল্যণ্ড, ফ্রান্সে। বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকারও কয়েকজন দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচারের ফলে পাশ্চাত্য দার্শনিক মত বহু পরিমাণে বেদান্ত-কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়াছে।

ক্ষণেক তরে মাটীর বুকে স্বর্গ এল নেমে

শ্রীঅঞ্জলি দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিন্‌দেশী এক রাখাল ছেলে এল মোদের গ্রামে
ঘরের পানে যায় সে যখন সূর্য্য পাটে নামে।

কৌতুড়া চুলে পালক গোঁজা বাঁশের বাঁশী হাতে
রোজ দুপুরে চরায় ধেনু মাঠে সবার সাথে।

কাজল-কালো দুইটী চোখে কিসের ছবি আঁকা
তাকে যখন বাঁশীর সুরে যায় না ঘরে রাখা।

তরুণ তাহার অঙ্গে মাখা শ্যামল মেঘের ছায়া
চারু মুখে জড়িয়ে আছে ঘর ছাড়ানো মায়া।

তাহার পানে নয়ন তুলে চাইলে ক্ষণেক তরে
মধুর প্রেমে হৃদয় আমার হঠাৎ উঠে ভরে।

আমার ঘরের সুমুখ দিয়ে যায় সে যখন চলে
চেয়ে তাহার আঁখির পানে পরাণ আমার দোলে।

যখন আমার পানে চেয়ে সে জন মধুর হাসে
আনন্দেরই অশ্রুধারায় নয়ন আমার ভাসে।

কালো রূপের মোহন মায়ার বন্দী আমি আজ,
বুঝলে সখি সে জন আমার প্রেমের রাখালরাজ।

আমারে সে চায় কি না চায় বুঝ্‌তে নারি তায়
প্রেমের খেলায় বারে বারে হায় মেনেছি হায়।

এমনি করে চলে তাহার নিত্য যাওয়া-আসা,
চুরি করে নিয়েছে সে আমার ভালবাসা।

গাগরী লয়ে সাঁঝের বেলা যখন নদীর তীরে
যাই গো আমি কাঙাল নয়ন তারেই খুঁজে ফিরে।

ঘরের কাজে মন লাগে না মন মধুর বায়,
হাড়া পেলেই প্রাণ চলে যায় রাখাল ছেলের গাঁয়।

কাছে যখন রয় না সে জন তারেই খোঁজে মন
সামনে এলে সরমভরে চায় না দু-নয়ন।

ধেনু চরায় রাখাল ছেলে নিত্য হেথায় এসে—
লাজ-ভুল-মান সব হারালাম তারেই ভাল বেসে।

মুখ ফুটে সই বল্‌তে নারি কারেও আমার কথা
ঘরে সবাই গঞ্জনা দেয় কেউ বোঝে না ব্যথা।

সে দিন ছিল পূর্ণিমা সই কলসী লয়ে শিরে
সন্ধ্যা-রাতে নদীর তীরে গেলাম ধীরে ধীরে।

চাঁদের সাথে কিরণ ছিল নদীর কালো জলে
মনে হ'ল ঢেউএর পরে লক্ষ মাণিক জ্বলে।

এমন সময় শ্যামল কিশোর তরুণী তার বেশে
সামনে এসে বস্‌ল আমার মুখের পানে চেয়ে—

একলা কেন দাঁড়িয়ে সখি, শূন্য নদীর ধারে
মুখটী তুলে বল তো সই খুঁজ্‌ছ তুমি কারে।

বল্‌ল পরে হাতটী আমার ধ'রে মধুর স্বরে
চাও তো সখি, নয়ন তুলে আমার আঁখির পরে।

ঘুরে তখন ডাকছিল সই বউ-কথা-কও পাখী
চপল তাহার আঁখির সাথে মিললো আমার আঁখি।

দুই অধরের মিলন-সুধায় পূর্ণ হ'ল প্রাণ,
দুইটী তরুণ প্রাণের বীণে বাজ্‌লো একই তান।

ফুলের বুকে ভ্রমর এল, তরুর বুকে লতা—
চোখে চোখেই বলা হ'ল মোদের সকল কথা।

কণ্ঠ হ'তে মালা নিয়ে পরাণ তার গলে
দোহার মিলে প্রণমিনু দেবের চরণ তলে।

পরম পিতার স্নেহের আশীষ মোদের দোঁহার পরে
ঝোড়ো-বাধার সাথে সাথে পড়ল ঝরে ঝরে।

সারা ধরা উঠ্‌ল ভরে মধুর দোঁহার প্রেমে
ক্ষণেক তরে মাটীর বুকে স্বর্গ এল নেমে।

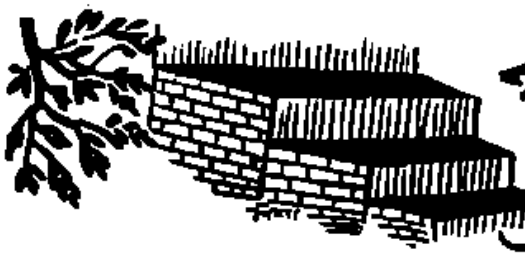

দিদিরাণীর ঘাট

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

মুখে স্পষ্ট কোনও দিনই বলিনি, কিন্তু ডাঃ রায় পিতাকে দেখতে ও বাড়ী গেলেই আমার মনে লাগে, এ কথা অস্বীকার করব না। প্রথম প্রথম দু এক দিন ডাঃ রায় রোজই যেতেন এবং পরে দু চারদিন অন্তর অন্তর বিকেলে ও বাড়ী ঘুরে বাবাকে দেখে আসতেন। তিনি ফিরে এলে তাঁর বাবা কেমন আছেন এ প্রশ্ন করতেও যেন আমার বাধে। ডাঃ রায় কি বুঝেছেন জানি না, তিনিও ও বাড়ীর বিষয় বিস্তারিত কথাবার্তা আমার সঙ্গে আর বলেন না—বাবা ভালই আছেন, এর বেশী আর কোনও কথা হয় না। ও বাড়ীর বিষয় অনেক কথা অবশ্য জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ইচ্ছা আমার মনের মধ্যেই চাপা পড়ে যায়।

এ দিক দিয়ে ওঁর ও আমার মধ্যে এই যে মেঘ জমে ঘনিয়ে উঠল—আমি যেন সইতে পারছিলাম না। অথচ উপায়ই বা কি? বৃদ্ধ পিতাকে তাঁর একমাত্র সন্তান এক একবার দেখে আসেন—কোন দিক দিয়ে ত ডাঃ রায়ের এতটুকু ত্রুটি ধরবার উপায় নেই। কোনও দিক দিয়ে যদি ওঁর ত্রুটি পাই, আমি যেন বাঁচতে ধরে বাঁচি, কিন্তু সে সম্ভটুকুও আমার নেই। ভাবি—যেখানে আমার যাওয়ার অধিকার নেই, যেখানে আমি অস্পৃশ্য, সেখানে ডাঃ রায়ই বা কেন যাবেন—কিন্তু এ যুক্তির মধ্যে জোর পাই না। মনে হয় এর মধ্যে আমারই মনের দৈন্য ছাড়া আর কিছুই নাই। তাই নিজের মনেই হাবুডুবু খেয়ে মরি, বলতেও পারি না, সইতেও পারি না।

দিনের পর দিন চলে যেতে লাগল—আমার মনের এই যে কাঁটা কিছুতেই তা খসল না। এমন সময় দাদা একদিন সন্ধ্যাবেলা এলেন আমাদের বাড়ী।

মেজ বৌদির কিছুদিন থেকেই প্রায় বিকেল বেলা ঘুষ-ঘুষে জ্বর হয়, দাদা মেজ বৌদির জন্য বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠেছেন—এ খবর আমি আগেই পেয়েছিলাম। দাদা এলে দাদার মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারলাম দাদা কোনও ব্যাপারে বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েছেন। দাদা এসে আমাদের মায়ের ঘরে বসলেন, ডাঃ রায়ও ছিলেন সেখানে।

শুধালাম "কি খবর দাদা? মেজ বৌদি কেমন আছেন?"

দাদা বললেন "ভাল নয়, আজ তিন দিন ধরে জ্বর বেড়েছে। আজ সকালে বড় ডাক্তার আনিয়েছিলাম। তিনি যক্ষ্মা সন্দেহ করছেন—X-ray করতে বললেন।"

চমকে উঠলাম। বললাম "সে কি?"

ধীরে ধীরে দাদা বললেন "শুধু তাই নয়, মহাবিপদে পড়েছি। কুসুম এই কথা শুনেই মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেল। একলা বাড়ীতে বরুকেই বা কে দেখে—কি যে করি জানি না।"

ডাক্তার রায় বললেন, "তা, যক্ষ্মা ত শুধু সন্দেহ মাত্র।"

আমি বললাম "তা বড় বৌদিকে এ কথা না বললেই হত।"

দাদা বললেন, "আমি কি বলেছি। একটা নার্স যোগাড় করেছে—সেই গিয়ে বলে দিল। অবশ্য লুকোনটাও বোধ হয় ঠিক হত না।"

তার পর বললেন "আমি মেজ বৌমার মাকে আন-বার জন্য আজই তার করেছি কিন্তু তাঁরও ত এসে পড়তে তিন চারদিন দেরী হবে।"

শুধালাম "বরুকে কি মার কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে?"

চিন্তিত ভাবে দাদা বললেন "না দিয়েই বা উপায় কি? মেজ বৌমাকে এ অবস্থায় কথা বলা, হয়নি, আর বরুকেই বা আটকান যায় কি করে?"

শুধালাম "তোমার দাদা মেজ বৌদিকে বলে গেছে।"

বললেন "না। ডাক্তারই তাকে বিশেষ ভাবে বারণ করে গেছেন।

খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। একটা নিদারুণ অবসাদে মন যেন এলিয়ে পড়ল। মেজ বৌদির ব্যথা—এ যে ভাবতেও পারি না। রক্তকুসুমের ছোঁয়াচ যদি লাগে—সর্ব্বনাশ! বুকের মধ্যে আমার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

বললাম "তা রক্তকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এলেই ত পারতে। দিনকতক না হয় আমার কাছেই রেখে দিতাম।"

বললেন, "সে কথা আমি ভেবেছিলাম কিন্তু তা সম্ভব হল না। এই অসুখ বাড়ার পর থেকে মেজ বৌমা যেন রক্তকে চোখে হারাচ্ছেন - খালি ছেলেকে কাছে রাখতে চান।"

বললাম "মেজদাকে টেলিগ্রাম করেছ?"

বললেন "টেলিগ্রাম করে আর কি হবে!"

বললাম "তবুও ত তাঁকে জানান দরকার।"

বললেন, "সঠিক বোঝার পর না হয় টেলিগ্রাম করা যাবে।"

আবার কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। এবার ডাক্তার রায় কথা বললেন "বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দ্বারা কিছু হতে পারে কি?"

ধীরে ধীরে দাদা বললেন "বুলার দ্বারা এখন অনেক কাজ হতে পারে!"

তার পর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন—"যদি আপনার কোনও দিক দিয়ে কোনও আপত্তি না হয় ত বুলা যদি এ সময় দু চারদিন আমাদের ওখানে গিয়ে থাকে ত বিশেষ উপকার হয়। মেজ বৌমার মা এলে পৌঁছলেই বুলা চলে আসতে পারে।"

সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায় বললেন, "যদি আপনাদের দিক দিয়ে কোনও বাধা না থাকে ত আমার আপত্তি কেন হবে?"

বললাম "বড় বৌদি তা সইবেন না।"

দাদা বললেন "তাঁর [illegible] এখানে ওঠেই না এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর কথা বলার কোনও অধিকারও নেই।"

বাপের বাড়ীতে আমার যাওয়া-আসা নেই, ডাঃ রায়কে এক দিনও তাঁরা বাড়ীতে ডাকেন নি,—এদিক দিয়ে আমার মনে যে বিশেষ কিছু অভিমান ছিল, এমন কথা বলতে পারি না। দাদাই ত বাড়ীর কর্ত্তা এবং তাঁর উপর অভিমান করাও চলে না।

দাদা বললেন, "বুলা! তুই তাহলে আজই চল আমার সঙ্গে। তুই গেলে বেঁচে যাই।"

চুপ করে রইলাম—একটী কথাও বললাম না। আজ যেন আমার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ ঘটেছে—এ আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না। প্রতিশোধ বাপের বাড়ীর উপর নয়—ডাঃ রায়ের উপর। তাঁকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, যেখানে তাঁর অপমান, সেখানে আমারও ঠাঁই নেই।

দাদা বললেন, "নে—আর দেরী করিস নি।"

বললাম, "না দাদা, আমি যাব না। তুমি বরং মেজ বৌদিকে যা হয় একটা বুঝিয়ে রক্তকে আমার কাছে রেখে যেও।"

দাদা একটু অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। ডাঃ রায় কি বুঝলেন আমার মনের কথাটা? হয়ত ঠিক বোঝেন নি, আরও একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। অথচ কথাটা বলতে বাধে—কি করেই বা বলি!

দাদা বললেন, "তুই কুসুমের উপর রাগ ক'রে এমন অসময়েও আমাদের বাড়ী যাবি না?"

আর তো চুপ করে থাকা চলে না।

বললাম, "না দাদা—কারও উপরই আমার রাগ নেই। কিন্তু যেখানে ওঁর ঠাঁই নেই, সেখানে আমার যাওয়া চলে না।"

এই বলে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

তিন চার [illegible] গেল—মেজবৌদির কোনও খবর পাইনি।

সেদিন আমি ঘর থেকে উঠে গেলে ডাঃ রায়ের সঙ্গে দাদার কোনও কথা হয়েছিল কিনা জানি না, তবে দাদা বেশীক্ষণ ছিলেন না। যাওয়ার সময় বারান্দায় এসে দাদাই আমাকে ডাকলেন। আমি শোবার ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে দাদা সহজ ভাবেই বললেন, "আমি এখন যাই। ডাক্তারের কথা যদি সত্য হয়, বরুকে তোর কাছেই পাঠিয়ে দেব। তবে, রোজই একবার বরুকে নিয়ে গিয়ে তার মাকে দেখিয়ে আনা উচিত। দেখা যাক কি করা যায়।"

দাদার ব্যবহারে তিনি যে আমার উপর রাগ করেছেন বা আমার কথায় দুঃখিত হয়েছেন তার কোনও আভাষই পাওয়া গেল না। কিন্তু দিন চারেক কেটে গেল, তবুও দাদা যখন মেজ বৌদির কোনও খবর নিয়ে এলেন না তখন মনে খটকা লাগল—দাদা হয়ত মনে মনে আমার উপর রাগই করেছেন। একে মেজবৌদির খবরের জন্য মনটা আকুল হয়েছিল, তার উপর দাদা রাগ করেছেন ভাবতে মন আমার যেন অবসন্ন হয়ে একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়ল।

ডাঃ রায়ের উপর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়েছি। এই ভেবে একটা অন্যের গৌরবে মন আমার যে একেবারেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে নি, এমন নয়। কিন্তু সেটাও হল নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। সেই দিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর ডাঃ রায়ই কথাটা তুললেন, আমি অবশ্য দাদা চলে যাওয়ার পর ও বিষয় একটী কথাও বলিনি।

ডাঃ রায় বললেন "অবশ্য দাদার মনে কষ্ট দিয়ে ভাল করনি বলে আমার মনে হয়।"

শুধালাম "ও কথার মানে?"

বললেন, "নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এসেছিলেন তোমার কাছে। কোনও দিকে কোনও উপায় থাকলে হয় ত তোমার সাহায্য চাইতেন না।"

বললাম, "তা আমি কি করব?"

বললেন, "স্পষ্ট মুখের উপর 'না' বলে দেওয়ার মধ্যে হয় ত মনের জোরের পরিচয় কিছু থাকতে পারে, কিন্তু সেটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অশোভন হয়ে দাঁড়ায়।"

বললাম, "নিজের দাদার সঙ্গে শোভন-অশোভন বাঁচিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলার চেয়ে স্পষ্ট কথা বলাই ভাল।"

বললেন, "নিজের দাদার বিপদে সাহায্য করতে অস্বীকার করাটা কিন্তু ভাল নয়।"

রাগ হল। সত্যই ওঁর জন্য চুরি করেছি কি না সে বিবেচনা না করেই বললাম, "যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।"

সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আমার জন্য চুরি করলে আমাকেও যে অপরাধী করা হয়।"

রাগ ক্রমেই বাড়তে লাগল, এবং রাগের স্বপক্ষে যুক্তিরও অভাব হলো না, মনে হল নিজের বাপের বাড়ী গিয়ে আমাকে পদে পদে যে অপমান করছেন সেই অপরাধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চান আমাকেও অপরাধী ক'রে।

তীক্ষ্ণস্বরে বললাম "তুমি ত বলবেই ও কথা।"

শুধালেন "কেন?"

বললাম "তুমি যে অপরাধী তাই অপরের উপর দোষ চাপিয়ে খালাস হতে চাও।"

বললেন "আমি কোনও অপরাধ করেছি বলে ত আমি জানি না।"

সঙ্গে সঙ্গে বললাম "বিলক্ষণ জান, অত বোকা তুমি নও। তুমি জ্ঞানপাপী।"

ডাঃ রায় কোন উত্তর দিলেন না। দু'জনেই খানিক ক্ষণ চুপচাপ। ডাঃ রায়ের সঙ্গে এর পূর্ব্বে এ রকম কলহ কখনও হয়নি। চোখ ফেটে জল বেরুতে চায় কিন্তু মেয়েদের অল্প চোখের জল—এ কথা চিরদিনই শুনে এসেছি এবং তাই বোধ হয় চোখের জলের উপর স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে আমার। একবার মনে হল, উঠে ঘর ছেড়ে যাই চলে, কিন্তু কলহের একটা আকর্ষণ আছে—উঠে চলে গেলে যেন পরাজয় আমারই হবে। কোনও রকমে চোখের জল সংবরণ করে গুম হয়ে রইলাম বসে। কিছুক্ষণ পরে ডাঃ রায় বললেন, "আজ থাক, এ বিষয়ে বরং কাল আলোচনা করা যাবে।"

বললাম "কেন? কথাটা যখন উঠেছে, আজই সব পরিষ্কার হয়ে যাক না।"

বললেন "কি যে অপরাধ তাই যখন জানি না, তখন পরিষ্কার করে কেলা ত আমার আয়ত্তে নয়।"

বললাম "সত্যই তুমি জান না বলতে চাও?"

বললেন "ছেনে বুঝে অপরাধ করেছি তুমি আমাকে এত হীন মনে কর?"

আমি যতই রাগি না কেন, উনি এতক্ষণ বেশ শান্তভাবে কথা কইছিলেন, কিন্তু শেষ কথাটার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক আবেগের কম্পনে বুক আমার যেন উঠল কেঁপে।

চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলাম। হায় রে! আমি যে রমণী, তাই বুঝি শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই চোখের জল সংবরণ করতে পারলাম না। বড় বড় ফোঁটায় চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ডাঃ রায় উঠে এলেন আমার পাশেই। আদর করে মুখখানা টেনে নিলেন বুকে। চোখের জলের বাঁধন যেটুকু ছিল, তাও এবার ভাঙল। বুকে মুখ রেখে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন "আমার প্রতি বিশ্বাস হারিও না। মনে রেখ, নীলকণ্ঠের বিষপানের মতন অবস্থাবিশেষে অপমান মাথায় তুলে নেওয়ার মধ্যেও একটা শক্তি আছে—তাতে গৌরবই বাড়ে। আমাদের দুজনার মধ্যে যে-ই সে গৌরবের অধিকারী হই, অপরকে ত্যাগ না দিয়ে উপায় নেই।"

ডাক্তার রায়ের কথাগুলো শুনতে শুনতে তাঁর বুকে মাথা রেখে চোখের জলে আমার বুকের আগুন যেন এতদিন পরে নিভল।

এ নিয়ে আর কোনও কথা হ'ল না। পরের দিন সকাল বেলা ঘুম ভেঙে রাত্রের কলহের কথা মনে হয়ে একটা লজ্জায় মন সঙ্কুচিত হয়ে গেল—সারা সকালটা ডাঃ রায়ের মুখের দিকে যেন চাইতে পারিনি।

যাই হোক, তিন চারদিন যখন মেজ বৌদির কোনও খবর এল না, তখন মনে মনে ঠিক করলাম যে, দাদাকে একখানা চিঠি লিখব এবং চিঠিতে এ কথাও জানিয়ে দেব যে, যদি প্রয়োজন হয় আমি গিয়ে দু'চার দিন থাকতে প্রস্তুত আছি।

ডাঃ রায়কে কথাটা বলা দরকার। তিনি যখন কলেজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বললাম "দাদা বোধহয় রাগই করলেন। কই মেজবৌদির খবর ত কিছু দিলেন না।"

ডাঃ রায় বললেন "তোমার দাদাকে যতদূর জানি আমার মনে হয় না তোমার দাদা তোমার উপর রাগ করেছেন।"

বললাম "মেজ বৌদির খবরটার জন্য মন সত্যই বড় আকুল হয়েছে। আমি মনে করছি দাদাকে আজ একখানা চিঠি লিখব। তাতে একথাও জানিয়ে দেব যে, প্রয়োজন হয় ত' আমি গিয়ে দু'চার দিন থাকতে রাজী আছি।"

ডাঃ রায় বললেন "বেশ ত"।

ইচ্ছে হল শুধাই—যে, কিছুদিন ওঁকে ছেড়ে দূরে গিয়ে থাকলে ওঁর মনে কি তা একটুও লাগবে না। জানি, উনি ত যাবেন না ওবাড়ী, তাই দিনান্তে একবারও ত দেখা হবে না সে ক'দিন। কিন্তু সোজা এ প্রশ্ন করতে বাধল। একটু হেসে বললাম "মাঝে মাঝে কিছুদিন আলাদা থাকা ভাল—সত্যিকারের মূল্য আছে কিনা যাচাই করে নেওয়া যায়।"

হেসে বললেন "সে কথা ঠিক। বিরহ না হলে প্রেম পুষ্টি হয় না।"

শুধালাম "তাই কি তুমি বিরহের জন্য এত আকুল হয়েছ?"

বললেন "বিরহের জন্য ত কেউ আকুল হয় না—সেইটেই যে বিরহের বিশেষত্ব।"

চাপা হাসি ঠোঁটে মাখিয়ে বললাম "কি জানি, যদি নীলকণ্ঠের মতন বিষপান করতে চাও।"

হেসে বললেন "চাইও যদি, সে বিষের ভাগ তোমাকেও নিতে হয়—নইলে সে ত অমৃত হয়ে উঠবে না।

বললাম "আমার বড়ো গোড়ে। বিষপান করে নীলকণ্ঠ হওয়ার সাধ নেই আমার।"

বললেন "তা হলে আমারও সে সাধ হতে পারে না। অথথা মৃত্যু বরণ করতে রাজী নই আমি।"

শুধালাম "বল কি—একেবারে মৃত্যু?"

বললেন "তাই ত মনে হচ্ছে। প্রাণশক্তির জোরে কোনও রকমে বেঁচেও যদি যাই, চোখে অন্ধকার দেখব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

হেসে ডাঃ রায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যেটুকু চেয়েছিলাম, সেটুকু পেয়ে মন আমার কানায় কানায় উঠল ভরে।

দুপুরে বসে দাদাকে একখানা চিঠি লিখে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছি—সত্যই মেজ বৌদির কি হ'ল, দাদা কেন কোনও খবর দিচ্ছেন না। সমস্ত দিন মনটা দারুণ ভারী হয়ে রইল।

কিন্তু মেজ বৌদির কথা মনের মধ্যে কোথায় অতলে গেল তলিয়ে—যখন সন্ধ্যা ৭টা বেজে গেল—তবুও ডাঃ রায় ফিরে এলেন না।

ডাঃ রায় খুব বেশী দেরী হলেও পাঁচটার মধ্যেই ফিরে আসেন, এক আধদিন একটু দেরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আগেই আমাকে জানিয়ে যান—এ রকম দেরী ত' কখনও হয় না। হ'ল কি? নানা এলো-মেলো চিন্তায় মন পাগল হয়ে উঠল।—সামনের সরু বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ দুটো যেন অবশ হয়ে গেল।

ডাঃ রায় ফিরে এলেন—তখন রাত প্রায় সাড়ে সাতটা।

আগ্রহে শুধালাম "ব্যাপার কি? মানুষকে এ রকম ক'রে অস্থিরে তোলার কোনও মানে হয় না।"

বললেন "তোমাকে ভাবনার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্যই ত দেরী হ'ল।"

শুধালাম "তার মানে কি?"

বললেন "তোমার মেজ বৌদির খবর নিয়ে এলাম।"

শুধালাম "কি করে? দাদা এসেছিলেন বুঝি কলেজে?"

বললেন "বলেও কি মনে পড়ে না নাকি? তোমাদের বাড়ীতেই গিয়েছিলাম।"

অবাক হয়ে ডাঃ রায়ের মুখের দিকে তাকালাম।

বললাম "তুমি—গিয়েছিলে সে বাড়ী?"

বললেন "হ্যাঁ—তাতে এত আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে?"

আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে তাবলে হয়ত যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না, তবুও ডাঃ রায় যে শুধাড়ী যাবেন—এ যে আমি কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি। আমি যতদূর বুঝেছি—অভিমানী মন ডাঃ রায়ের। ওঁরা কোনওদিন ডাঃ রায়কে শুধাড়ী যেতে বলে নি। উনি সেধে গিয়ে মেজ বৌদির খবর নিয়ে আসবেন—কি জানি, এ ত' কিছুতে যেন বিশ্বাস করতে পারি না।

শুধালাম "কি বলে গেলে?"

বললেন "কেন, ভদ্রলোক যেমন করে ভদ্রলোকের বাড়ী যায়।"

অনেক কথা জানবার ইচ্ছে হল—কোন্ ঘরে বসেছিলেন, দাদা ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা হল কিনা, মেজ বৌদিকে দেখতে উপরে উঠেছিলেন কি - ইত্যাদি। কিন্তু কি ভাবে কি শুধাব কিছুই যেন ঠিক করে উঠতে পারছি না।

ডাঃ রায় বললেন "এতদিন X Ray করা হয়নি, সবে কাল হয়েছে। তোমার মেজ বৌদির যা না এলে ত X-Ray করতে নিয়ে যাওয়ার সুবিধে ছিল না,—যাক্, খবর মন্দের ভাল। যক্ষ্মা নয়।"

শুধালাম "তবে?"

বললেন "ঠিক এখনও ধরা যায়নি, তবে বড় ডাক্তার আজ সকালেও এসেছিলেন। এখন টাইফয়েড সন্দেহ করছেন। - রক্তপরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে।"

শুধালাম "জ্বর—এখনও আছে?"

বললেন "হুঁ,—এখনও ত শুনে এলাম জ্বর ১০২।"

শুধালাম "টাইফয়েডও ছোঁয়াচে নাকি?"

বল্লেন—"ছোঁয়াচে বই কি। ব্যবস্থা হয়েছে, যদি টাইফয়েড হয়, রুবুকে তোমার দাদা দু'তিন দিনের মধ্যে তোমার কাছে দিয়ে যাবেন।"

হঠাৎ যেন নতুন করে মনে হল—আর ত আমার ওবাড়ী যাওয়ার কোনই বাধা নেই। মনটা আকুল হয়ে উঠ্‌ল মেজ বৌদিকে দেখার জন্য।

শুধালাম "আমি যাব না মেজবৌদিকে একবার দেখতে?"

বললেন "তোমার ইচ্ছে হলে নিশ্চয়ই যাবে, যদি ওদিক দিয়ে কোনও বাধা না হয়।"

শুধালাম "তুমি কোন্ ঘরে বসেছিলে?"

বললেন "কেন, নীচে তোমার দাদার বসবার ঘরে।"

শুধালাম "তুমি উপরে গিয়েছিলে—মেজবৌদিকে দেখতে?"

আমার এই এলো-মেলো প্রশ্নে ডাঃ রায় বোধ হয় একটা কৌতুক অনুভব করছিলেন।

একটু হেসে বললেন "না, এ অবস্থায় কি নতুন লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ান উচিত?"

হঠাৎ মনে হল—ডাঃ রায় 'চা' খেয়েছেন ত? হয়ত ও বাড়ী কিছুই খান নি।

শুধালাম "তুমি 'চা' খেয়েছ?"

বললেন "হ্যাঁ, তা তোমার দাদা আদর যত্ন করেছেন খুব।"

সমস্ত সন্ধ্যেটা একই চিন্তায় আমাকে পেয়ে বসল—ডাঃ রায় গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ী।

মেজ বৌদির খবর না পেয়ে আমি আকুল হয়েছিলাম—তাই কি গেলেন আমার মন শান্ত করার জন্য?

সে দিন দাদার মুখের উপর 'না' বলে দিয়ে যে অন্যায় করেছি—তারই কি প্রায়শ্চিত্ত করে এলেন? ঝগড়া করে ওঁকে অপরাধী করেছিলাম—তাই কি আমাকে একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন? এও কি নীলকণ্ঠের বিষপান?

[ক্রমশঃ

মুহূর্ত্ত

শ্রীসুনীল ঘোষ

গোধূলির ম্লানিমায় ঝিমায় ধোঁয়াটে আকাশ;
অবসাদ-ক্লান্ত পথে রজনীর যাত্রা হলো সুরু;
চখা চখী উড়ে যায় বিরহের মদির প্রাঙ্গণে;
মেটালে গাছের শাখে মাঝে মাঝে ঘুঘু ডাকে শুধু।

তুমি আমি দুই জনে নিরালায় পথ বেয়ে চলি;
ঘনায়ু চোখেতে নামে আঁধারের ঘন বিভীষিকা;
অদম্য উচ্ছ্বাস বুকে ঝটাপট্ করে ঘুনো বাঁধ;
তাহার দুয়ার রুদ্ধ; ফেরে ফিরে মুহূর্ত্ত-সঙ্কেত।

আরো ঘনে? চল তবে আঁধারের মাঝে ডুব দিয়ে—
আলোর জগতটাকে দিছে ফেলে আরো আরো আগে;
তোমার নিঃশ্বাসটুকু মোর গায়ে লাগে এসে ধীরে—
সুরভি শুরুতা তব মিলনের আসবে মাতাল।

অভিযোগ থাক যত মামুলী সে অতীত পাতুর;
জীবনপথের মাঝে ধূলি-কণা ঝরে দিক ঝরে;
আজ রাত্রে নিরালায় এই বিশ্ব মরে যায় যাক;
শুধু থাক স্মৃতিটুকু সুনিবিড় মুহূর্ত্তের মাঝে।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতি

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য

ভারতীয় রাজনীতির পক্ষে যাহা বেদস্বরূপ, ভারতীয় রাজনীতিকগণের পক্ষে যাহার শিক্ষা ও উপদেশ নিত্য-প্রত্যেয় মতই অনুযোয়, ভারতীয় রাজনীতি যাহাতে জটিল আবর্ত্তে ঘনায়িত হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই আবর্ত্তের সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভের পথও যাহাতে বিবৃত হইয়াছে—এই গ্রন্থ মহাভারত। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত। ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির—ইহাই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয় কিন্তু এই পরিচয় নিতান্ত সত্য হইলেও মহাভারতের পরবর্ত্তী যুগে এই আখ্যাই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে। "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির" কথাটি আমাদের সমাজে শ্লেষ বা উপহাসের অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া আসিয়াছে—খানিকটা ভীরুতা, খানিকটা ধর্ম্মকুণ্ঠতা, খানিকটা ধর্ম্মবুদ্ধি লইয়া অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি—ইহারই সমাবেশকে লোকে 'ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির' আখ্যায় অভিহিত করিতে শিখিয়াছে।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির-চরিত্র সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রচলিত মনোভাবকেই অনুসরণ করিয়াছি কিন্তু মহাত্মাজীর অভ্যুদয়ের পর তাঁহার চরিত্র, আচরণ, নীতিজ্ঞান, ধর্ম্মবুদ্ধি ও লোকব্যবহার দেখিয়া ও অনুধাবন করিয়া যুধিষ্ঠিরের চরিত্রকে উহার সত্যরূপে ও প্রকৃতরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। বুঝিতে পারিয়াছি যে, বহু সহস্র বৎসরের ব্যবধানে বিশ্ববিধাতা ভারতীয় রাজনীতির দুই বিরাট পুরুষকে একই ছাঁচে ঢালাই করিয়া রচনা করিয়াছেন। গান্ধী-চরিত্র আমাদের নিতান্ত প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝিয়াছি, নহিলে মহাত্মাজীর মনোবৃত্তি এবং কর্ম্মনীতি বুঝিতে পারা সম্ভব হইত না। এখন হইতে বহু সহস্র বৎসর পরে লোকে ঠিক সঙ্গতভাবে এই চরিত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে কি না জানি না। সাধারণ মানুষ যে-স্তরে থাকে ও কাজ করে, মহাত্মাজী তাহার এত উর্দ্ধ স্তরে রহিয়াছেন ও চলিয়াছেন যে, আশঙ্কা হয়, হয় ত ক্রমে যুধিষ্ঠির-চরিত্রের মতই উহা দুর্গ্রাহ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

মহাভারত পাঠ করিয়া যুধিষ্ঠির-চরিত্রের সহিত গান্ধী-চরিত্রের অন্তরে ও বাহিরে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। প্রায় অনুরূপ ক্ষেত্রে উভয় চরিত্রের উক্তি ও আচরণের মধ্যে মিল এত বেশী যে, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। মহাভারত হইতে যুধিষ্ঠিরের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করিয়া মহাত্মা গান্ধীর রচনা ও উক্তি-সমূহ তাহার পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে স্থলে স্থলে অবিকল অনুবাদ বলিয়া মনে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বনপর্ব্বে যখন কৃষ্ণা, ক্ষুব্ধা দ্রৌপদীকে উপদেশ দিয়া যুধিষ্ঠির শান্ত করিতেছেন সেই অংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজনীতিতে প্রেম ও ক্ষমার যে তত্ত্ব, নীতি ও ধর্ম্ম মহাত্মাজী প্রচার করিয়াছেন তাহার সহিত যুধিষ্ঠিরের প্রচারিত মত হুবহু মিলিয়া যাইবে। বাস্তবিক পুরাতন ও নূতন ভারতবর্ষের এই দুই বিরাট চরিত্রের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ ও তুলনা করিয়া কেহ যদি রীতিমত আলোচনা করেন, তাহা হইতে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচিত হইতে পারে।

মহাত্মাজীর রাজনীতির স্বরূপ বুঝাইবার জন্যই এই ভূমিকা করিতেছি। রাজনীতি বলিতে এখন আমরা বিলাতী ছাঁচের রাজনীতি বুঝিয়া থাকি কিন্তু গান্ধী-রাজনীতি তাহা হইতে মূলগত ভাবে এমন পৃথক্ যে, বিলাতী রাজনীতির আদর্শে বা মাপকাঠিতে বিচার করিতে গেলে আমরা উহা বুঝিতে পারি না। উহা ভারতীয় আদর্শে এবং ভারতীয় ধর্ম্মপ্রাণতায় প্রভাবিত রাজনীতি। সেই জন্য উহাকে বুঝিতে হইলে ভারতবর্ষের ধারা-পরম্পরা ও সংস্কৃতির সহিত উহাকে যুক্ত করিতে হইবে এবং সেই পটভূমিকাতেই বিচার করিয়া উহার গুরুত্ব ও উপযোগিতা নির্ণয় করিতে হইবে। পাশ্চাত্যে সমালোচকেরা আপনাদের মাপ-কাঠিতে বিচার করিয়াছে বলিয়া গান্ধী-রাজনীতির মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই—বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবে উহার দিকে চাহিয়া থাকিয়াছে, উহার ক্রিয়ার ও প্রভাবে যখন তাহারা অভিভূত হইয়াছে এবং সেই ক্রিয়া ও প্রভাব যখন প্রতিহত

করিতে চাহিয়াছে তখনও বুঝিতে পারে নাই উহার অন্তর্নিহিত শক্তি কোথায়, উহার অদ্ভুত সাফল্যের ও প্রভাবের রহস্য কি এবং কোন্ মূল হইতে উহা অ-লোক-সাধারণ শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে। ১৯২০ সাল হইতে অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে মহাত্মা গান্ধীর বিরাট ব্যক্তিত্ব যখন জগতের সম্মুখে দেখা দিল, তখন তার ভ্যালেন্টিন চিরোল্ড তাঁহার ইণ্ডিয়ান আনরেষ্ট (Indian Unrest) নামক গ্রন্থে লিখিলেন—"Unfortunately for India there is a Saint at the head of this political movement"—ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে, তাহার রাজনীতি একজন সাধুপুরুষ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বিলাতী রাজনীতির দিক হইতে বিচার করিয়া ইহা অত্যন্ত সঠিক নির্দ্ধারণ। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির দিক হইতে বিচারে ইহা কত বড় ভুল তাহা আমরা প্রত্যক্ষই দেখিতেছি। রাজনৈতিক আন্দোলনের শীর্ষে সাধুপুরুষের আবির্ভাব ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণের কারণ, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি। বিলাতী দৃষ্টিতে গান্ধী-রাজনীতির এই দুর্বোধ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া Gandhi and Lenin গ্রন্থের রচয়িতা বলিতেছেন—"We can understand a saint, we can understand a politician ; but we don't understand this squire amalgum of fasting prayer and statesmanship." ১৯৩১ সালে বিলাতী গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী যখন ব্রিটিশ ও ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক মীমাংসার আলোচনায় নিযুক্ত তৎকালে তাঁহার মন্তব্যসমূহও বিলাতী রাজনৈতিক ও সাংবাদিক মহলে এইরূপ বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিল। বৃটেন যে ভারতবর্ষকে সামরিক শক্তিতে অক্ষম করিয়া রাখিয়াছে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া গান্ধীজী বলেন—"আপনারা আমাদের শক্তি হরণ করিয়াছেন, সুতরাং সেই শক্তি যাহাতে আমরা ফিরিয়া পাই তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আপনারাই ধর্ম্মের নিকট দায়ী।" মহাত্মাজীর এই উক্তির সমালোচনা করিয়া কোন বিশিষ্ট বিলাতী সংবাদ-পত্র তৎকালে লিখিয়াছিল —"কতগুলি একেবারে শিশুর ন্যায় সরল। রাজনৈতিক আলোচনায় এরূপ ভাষা শুনিতে আমরা অভ্যস্ত নহি, ইহা এই নূতন শুনিলাম।"

বিলাতী সমালোচক ও রাজনৈতিকগণ যে-স্থলে মহাত্মাজীর রাজনীতি বুঝিতে পারেন নাই আমাদের নিকট ঠিক সেই স্থলেই উহার বিশেষত্ব। ইহাই মহাত্মাজীর রাজনীতি। যে রাজনীতির ফলে তার ভ্যালেন্টিন চিরোল্ডের ভাষায় "সাধুপুরুষের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হয়।" মহাত্মাজীর রাজনীতির এই বিশেষত্ব বুঝাইতে তিনি নিজে কখনও বলিয়াছেন 'spiritualising politics' কখনও বলিয়াছেন 'movement of self purification' অর্থাৎ রাজনীতিকে তিনি উহার প্রচলিত ইতর স্তর হইতে আধ্যাত্মিক সাধনার স্তরে উঠাইয়াছেন। বিলাতী অভিমতের বিচারে—politics is the last resort of the scoundrel—'রাজনীতি দুর্জ্জনের শেষ অবলম্বন।' কিন্তু মহাত্মাজী পুনঃ পুনঃ উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছেন—"My Movement is a movement of self-purification" অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্ম্ম-পদ্ধতিকে তিনি এমন আকার দিতে চাহিয়াছেন, যাহাতে এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে মানুষের আত্মশুদ্ধির কর্ম্ম-সাধনাও অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ হয়। ইহাই মহাত্মাজীর রাজনীতি এবং বিশ্বসভ্যতার নিকট, বিশ্বরাজনীতির নিকট ইহাই তাঁহার বাণী। বিশ্ব-মানব ও বিশ্ব-সংস্কৃতি হিংসাকলুষিত বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া পুনঃ পুনঃ যে সঙ্কটের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহা হইতে মুক্তিলাভের ইহাই একমাত্র পথ।

মহাত্মাজীর প্রবর্ত্তিত রাজনৈতিক আন্দোলনে 'Non-violence' কথাটি অত্যন্ত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রত্যেক আন্দোলনকে তিনি এই বিশেষণের দ্বারা চিহ্নিত ও সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। 'Non-violence' তাঁহার প্রত্যেক আন্দোলনের প্রাণ এবং এই বিশেষণটির উপরে তিনি এতখানি নির্ভর করিয়াছেন যে, কোথাও ইহার উল্লঙ্ঘন ঘটিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত আন্দোলনই স্থগিত করিয়া দিয়াছেন। অন্তর্দৃষ্টির বিচারে 'spiritualisation' বা 'self-purification' যেমন তাঁহার রাজনীতির স্বরূপ তেমনই বাহ্যদৃষ্টির বিচারে উহার স্বরূপ হইল 'non-violence'। অসহযোগ আন্দোলন তিনি যখন

প্রথম প্রচার আরম্ভ করেন, তখন বারবার বলিয়াছেন "Non-violence is the hilt and Non-co-operation is the sword" অর্থাৎ Non-co-operation তরবারির স্বরূপ বটে কিন্তু 'Non-violence' হইল ইহার মুষ্টি। মুষ্টির অংশ বাদ দিলে তরবারি যেমন অব্যবহার্য্য হইয়া যায় তেমনই 'Non-violence' না থাকিলে সমস্ত আন্দোলনই অকার্য্যকর। 'Non-violence' কথাটির উপর মহাত্মাজী যখন এতখানি নির্ভর করিয়াছেন, তখন সহজেই বোঝা যায়, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম নির্দ্ধারণের উপরে তাঁহার রাজনীতির সঠিক পরিচয় নির্ভর করিতেছে। আমাদের রাজনৈতিক পরিভাষায় ও সংবাদপত্রের ব্যবহারে 'Non-violence' কথাটির অর্থ আমরা করিয়াছি 'অহিংসা'। অক্ষরার্থ ধরিলে উহার সেইরূপই অর্থ হওয়া বটে কিন্তু উহার প্রকৃত মর্ম্ম তাহা হইতে আরও অগ্রসর। কথাটি যখন মহাত্মাজী প্রথম প্রচার করেন, তখন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী উহার অর্থ করিয়াছিলেন 'ক্ষমা'। আমার বিবেচনায় উহার এই অর্থই ঠিক। 'Non-violence' কথাটি ইংরাজী রচনায় দেখিতে 'Negative' বা অভাবাত্মক হইলেও কার্য্যতঃ উহার অর্থ অভাবাত্মক নহে, উহা একটি বিশেষ ভাবাত্মক শব্দ এবং 'ক্ষমা' কথাটির দ্বারাই সেই ভাব সঠিক প্রকাশ পায়। মহাত্মাজীর রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিচালনায় কর্ম্মীরা যে কোথাও কোথাও 'Non-violence' ভঙ্গ করিয়াছে বা উহার ব্যভিচার করিয়াছে তাহার হেতু কথাটির সঠিক মর্ম্ম তাহারা বুঝিতে পারে নাই। কোনমতে সক্রিয় হিংসার অভাবমাত্রক মনের অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারিলেই 'Non-violence' হইল, ইহা মহাত্মাজী কখনও স্বীকার করেন নাই। তিনি উহার দ্বারা একটা নির্দ্দিষ্ট ভাবাত্মক অবস্থাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। সে ভাব হইল 'ক্ষমা' এবং তাহারই অবশ্য সঙ্গী প্রেম। প্রতিপক্ষকে, শত্রুকে ক্ষমা করিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া তাহাদিগকে মিত্রে পরিণত করিতে হইবে, ইহাই মহাত্মাজীর রাজনৈতিক কর্ম্মপৈলী। আমরা সাধারণ মানুষের স্তর হইতে ইহা সকল সময়ে অনুসরণ করিতে পারি নাই। তাহারই ফলে, আন্দোলনের বিঘ্ন ঘটিয়াছে। 'Non-violence' অর্থে 'ক্ষমা' এই কথাটা যদি বিশেষ করিয়া প্রচারিত হইত—তাহা হইলে আন্দোলনে বিঘ্ন ঘটিত না। লোকে উহার স্বরূপ সঠিক-ভাবে বুঝিতে পারিত এবং মহাত্মাজীর নির্দ্দেশও ঠিক ঠিক অনুধাবন করিতে পারিত।

মহাত্মাজীর রাজনীতির এই পরিচয়ের পর পুনরায় যুধিষ্ঠির-চরিত্রের সহিত তাঁহার সাদৃশ্যের অবতারণা করা যাক। দ্যূতপর্ব্বের কথা সকলকে মনশ্চক্ষে স্মরণ করিতে বলিতেছি। কপটদ্যূতে পরাজিত হইয়া অর্দ্ধ ভারতের অধীশ্বর ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য বনবাসে চলিয়াছেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা ও অবমানিতা হইয়াছেন। যেরূপ অবমাননা অতি সাধারণ নারীও কদাচিৎ ভোগ করিয়া থাকে। দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসনের দুঃসহ কটূক্তিবাণে ভীম ও অর্জ্জুনের বাহুবল বিকৃত হইয়াছে। এই অসহনীয় অবস্থায় রাজেশ্বর হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভিক্ষুকের পদবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া পত্নী ও ভ্রাতৃগণসহ যুধিষ্ঠির যখন বনে যাইতেছেন, তখন তাঁহার মনের অবস্থা কি? ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"সঞ্জয়, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবেরা কে কি ভাবে নগর ত্যাগ করিয়া গেল, তাহা তুমি বর্ণনা কর।" সঞ্জয় একে একে বর্ণনা দিলেন—ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী এমন কি পুরোহিত ধৌম্য পর্য্যন্ত সকলেরই মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, সকলেরই আচরণে আক্রোশ ও প্রতিবিধিৎসার প্রকাশ। কিন্তু যুধিষ্ঠির? সঞ্জয় বলিলেন,—"যুধিষ্ঠির আপন উত্তরীয়ের দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া যাইতেছেন।" ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার অর্থ কি সঞ্জয়?" সঞ্জয় কহিলেন—"মহারাজ, যুধিষ্ঠির সত্যপ্রতিজ্ঞ, আপনার পুত্রেরা তাঁহার যে অনিষ্ট করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার মনে কোন ক্ষোভ নাই। কিন্তু তাঁহার এই মানসিক সংযম সত্ত্বেও যদি কোন প্রকারে মনে অণুমাত্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় তাহা হইলে তৎকালীন দৃষ্টিপাতে আপনার এই রাজ্য পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। এই জন্যই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আপনার দৃষ্টি ও মুখমণ্ডল সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করিয়া

চলিয়াছেন। তিনি আপনার মঙ্গল কামনা করেন।" রাজনীতির সংঘর্ষের মধ্যে ক্ষমা ও প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিবার এই দৃষ্টান্ত পৃথিবী কয়েক সহস্র বৎসর পরে মহাত্মাজীর চরিত্রে দেখিয়াছে। যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের কথা মহাত্মাজীকে দেখিয়া বুঝিতে পারি এবং যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্ত স্মরণ না করিলে মহাত্মাজীর প্রেম ও ক্ষমা বুঝিতে পারিব না। একমাত্র সম্পূর্ণ সত্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে ইহা সম্ভব এবং রাজনীতিতে সত্যসাধনার জন্য মহাত্মাজীর কি অবিরাম প্রয়াস—তাহা আমরা বহুবার দেখিয়াছি।

ইহা মহাত্মাজীর রাজনীতির অপর বিশেষত্ব—রাজনীতিতে সত্যের সাধনা। রাজনীতিতে যতপ্রকার দুষ্কৃতি করিতে হয় এবং সর্ব্বপ্রকার দুষ্কৃতিই রাজনীতিতে ক্ষমার্হ ইহাই প্রচলিত মত, বিশেষ করিয়া বিলাতী মত। সে-ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর মত হইল রাজনীতিতে সত্যকেই অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে, ফলাফল যাহাই হউক। বহুবার তিনি বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা পাইতে হইলে যদি সত্যকে ত্যাগ করিতে হয় তেমন স্বাধীনতা তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে। সত্যের প্রতি এই যে নিষ্ঠা এখানেও যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার অদ্ভুত সাদৃশ্য। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্ব্বে যখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে, তৎকালে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতা, আমার এই সৈন্যবল এবং আয়োজন দেখুন, ভাবিয়া বলুন, পাণ্ডবদের নিকট হইতে আমার ভয়ের কোন কারণ আছে কি না। আমার নিজের রাজ্যৈশ্বর্য ও বল যথেষ্টই ছিল, তাহার উপর পাণ্ডবেরা দশদিক জয় করিয়া যে ঐশ্বর্য ও শক্তি আহরণ করিয়াছিল—এক পাশার চালে আমি তাহা হস্তগত করিয়াছি; আমার এই সৈন্যবল সম্পূর্ণ সজ্জিত এবং ইহাদের কাহারও বেতন বাকী রাখা হয় না; পক্ষান্তরে পাণ্ডবেরা সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ। "বিদুর সমস্ত শুনিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"ধৃতরাষ্ট্র, তুমি যাহা বলিলে তাহা সবই সত্য। তথাপি যুধিষ্ঠিরের নিকট তোমার পরাজয় হইবে। কারণ, তোমার পুত্রেরা উদ্ধত অবিনয়ী ও অধর্মাচারী। পক্ষান্তরে, যুধিষ্ঠির সত্যনিষ্ঠ ও বৃদ্ধসেবী।"

এই বৃদ্ধসেবা বা বিনয় ও নিরভিমানিতা মহাত্মাজীর রাজনীতিরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যুধিষ্ঠির মৃদু, শান্ত, নিরভিমান ও ক্ষমাপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু আপনার শক্তির সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। স্বীয় শক্তির সম্বন্ধে সচেতন হইয়া যে বিনীত ও নিরভিমান আচরণ মনুষ্যচরিত্রের তাহা অপূর্ব্ব দুর্লভ ভূষণ। কুরুক্ষেত্রে দুই পক্ষ সমরসজ্জায় প্রস্তুত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন। সহসা দেখা গেল—পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির রথ হইতে নামিয়া পদব্রজে কৌরবপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পাণ্ডবপক্ষে সংশয় ও বিস্ময়ের এবং কৌরবপক্ষে পরিহাসের কলরোল উঠিল। ধর্মপুত্র তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধীরে ধীরে পিতামহ ভীষ্মের সম্মুখে যাইয়া নতজানু হইলেন; বলিলেন—পিতামহ, আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের জয় হউক; দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের সম্মুখে নতজানু হইলেন, বলিলেন, আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের জয় হউক। রাজনীতির সংঘর্ষের মধ্যেও যে এইরূপ ব্যবহারের স্থান থাকিতে পারে তাহা মহাত্মাজীর আচরণ দেখিয়াই সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যেক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাক্কালে মহাত্মাজী ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কর্ণধারের নিকটে তাহা জানাইয়াছেন এবং সংঘর্ষ যাহাতে পরিহার করা যায় তজ্জন্য তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন। ১৯৩০ সালে লবণ-আইন ভঙ্গের আন্দোলন আরম্ভ করিবার আসন্ন মুহূর্ত্তে মহাত্মাজী বড়লাট লর্ড আরউইনকে লিখিলেন—"নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে ক্লেশকর এই আইন অপসারিত করুন।" শুধু ইহাই নহে, আন্দোলনের প্রাক্কালে ভারতীয় ব্রিটিশ সমাজের নিকটেও মহাত্মাজী আবেদন করিয়াছেন এবং আন্দোলন যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তজ্জন্য তাঁহাদের সহানুভূতি চাহিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের চরিত্র যাহারা অনুধাবন করে নাই তাহারা এ আচরণের মর্ম্ম বুঝিবে না, বলিবে ইহা একেবারে সরল শিশুর কাণ্ড। রাজনীতিতে এরূপ আচরণ দেখিতে আমরা অভ্যস্ত নহি।

মহাত্মাজীর রাজনীতি বর্ত্তমান জগতে এক সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি। উহার আলোচনার পরিসর ব্যাপক ও

বিরাট। সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে মহাত্মাজীর রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি, উহার প্রয়োগ-কৌশল এবং তাহার ফলাফল সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। সেইজন্য মহাত্মাজীর রাজনীতির মৌলিক স্বরূপের কিছু আভাস দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য হইলাম। তবে রাজনীতির আলোচনা সাধারণতঃ যে প্রণালীতে হইয়া থাকে সে প্রণালী অবলম্বন করি নাই। তাহাতীর জীবনধারার সহিত সংযোগে উহার যে বিশেষত্ব তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আধুনিক রাজনীতির বিচারে মহাত্মাজীর রাজনীতির আলোচনা অনেকে করিয়া থাকেন এবং করিবেন। কিন্তু উহার আলোচনায় অগ্রসর হইবার যে নূতন দিক ও প্রণালীর কথা আমার মনে আসিয়াছে ইহা যদি কেহ অনুসরণ করেন তাহা হইলে মহাভারতের পটভূমিকায় মহাত্মাজীর নূতন রূপ দেখিতে পাইবেন এবং মানব-সমাজের নিকটেও মহাত্মাজীর জীবন-রহস্যের নূতন সন্ধান দেওয়া হইবে।

এক ফালি চাঁদ

শ্রীসুজিতকুমার নাগ

এক ফালি চাঁদ, আকাশে এখন উঠতে দাও—
ছোট ছোট তারা আজ বিদেহারা হোক যে ভাই,
হঠীন আকাশ চোখের কোণেতে মাখিয়ে দাও—
আকাশের চাঁদ তোর কতটুকু কাছে কী পাই?

এক ফালি চাঁদ জ্যোৎস্নার সাথে খেলছে কী?
আকাশের মাঝে তারাদের সাথে বাঁধবে ঘর।
কাকে দেখ তুমি—চাঁদে কি এখনো দেয় উঁকি,
নয়নে ঘোরের আবেশ বন্যা লাগুক বড়।

এক ফালি চাঁদ বড়োর সাথে খেলছে খেলা,
চাঁদের কী দোষ বল তুমি প্রিয় আজকে বল—
নাই বা উঠলো আকাশী আলো এই বেলা,
তার চেয়ে চল চাঁদের দেশেতে যাই চল।

এক ফালি চাঁদ প্রাণ ভ'রে আজ দেখতে চাই,
খানিক মনের সবুজ প্রাণের হারুক ঘা—
নয়নে ঘোরের আবেশ বন্যা লাগুক বড়,
আকাশের চাঁদ তোর কতটুকু কাছে কী পাই?

এক ফালি চাঁদ আকাশের ঝিরে থাকে কাছে,
ছোট তারা আজ পথ খুঁজে ফিরে যাবে উঁকি?
হঠীন আলোর নেশা কী তোমার চোখে আছে?
সুন্দর আলো ঝিরে আজ শুধু খেলছে কী?

এক ফালি চাঁদ আকাশে এখন উঠতে দাও—
ছোট ছোট তারা আজ বিদেহারা হোক যে ভাই।
হঠীন আকাশ চোখের কোণেতে মাখিয়ে দাও—
আকাশের চাঁদ তোর কতটুকু কাছে কী পাই?

ভারতমাতার পাদ-পীঠ সিংহল

শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষ

মস্তকে যাঁর তুষার-ছত্র ধরেছেন হিমাচল,
পূত পাদ-পীঠরূপে পদতলে শোভিতেছে সিংহল,
পশ্চিমে যাঁর রাজে গান্ধার, পূর্ব্বে ব্রহ্ম গলে মণিহার,
কটি-তট বেড়ি শ্রীচরণ ধেরি অযুধি উচ্ছল!
অখণ্ড এই ভারতবর্ষ মোদের জন্মস্থল!

মাদ্রাজের পর প্রায় ১৪।১৫টি ষ্টেশন অতিক্রম করিলে চিল্লমপুট পৌঁছান যায়। চিল্লমপুটের পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশন-গুলির গুরুত্ব অত্যন্ত অল্প বলিয়া দ্রুতগামী গাড়ীগুলি দাঁড়ায় না। নয়টা রাত্রিতে এগমোর হইতে ছাড়িয়া আমাদের ষ্টেণখানি রাত দশটায় ১৪টা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া চিল্লমপুটে পৌঁছিয়াছিল। আমরা সেই রাত্রিতে ষ্টেশনেই ছিলাম এবং পরদিন মহাবলীপুর দর্শনে গিয়া তৃতীয় দিন ঠিক সেই সময়ে আসিয়া ইণ্ডেসীলোন এক্স-প্রেস ধরিয়াছিলাম। ভোর ৪টায় তাঞ্জোর ষ্টেশনে এবং বেলা সাড়ে দশটায় মাদুরায় পৌঁছাই। তাঞ্জোর ও মাদুরার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যমণ্ডিত দ্রাবিড়ী মন্দিরাবলী দর্শনের মতো। আমরা অপরাহ্ণ ৪টায় বুকে/ডিতে সিংহলগামী ষ্টিমারে আরোহণ করিয়া ৭টা ২০ মিনিটে তালাইমান্নারে ষ্টিমার হইতে নামিয়া ভারতের পাদপীঠ সিংহল দ্বীপে প্রথম পদার্পণ করি।

তালাইমান্নার সিংহলের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। তালাইমান্নার ষ্টেশন হইতে যখন গাড়ী ছাড়িল তখন রাত্রির অন্ধকারে দশ দিক আচ্ছন্ন। সিংহলের এই অঞ্চলটা তেমন উর্ব্বর নহে। অন্ধকারের জন্য প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু এই বালুময় অনুর্ব্বর প্রান্তরগুলির বক্ষে তেমন দর্শনীয় কিছু নাই বলিয়া জানা গেল। সিংহল-সুলভ শ্যামল বৃক্ষ-লতা এই অঞ্চলে নাই বলিলেই হয়। মধ্যে মধ্যে এক একটা খর্জ্জুরবৃক্ষ রুক্ষ-স্বভাব ব্যক্তির মত নিঃসঙ্গ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। কয়েকটা ষ্টেশন পার হইবার পরে প্রাকৃতিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন উপলব্ধ হইল। এইবার দুর্ভেদ্য জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশের উপর দিয়া আমাদের গাড়ীখানি সবেগে

ক্যাণ্ডির গড়াগাম মন্দির

ছুটিতেছে। তালাইমান্নার হইতে ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী মানারই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ইহাকে সিংহলের অন্যতম প্রাদেশিক শাসন-কেন্দ্র বলা চলে। ইহার পর আরও ২২ মাইল অতিক্রম করিবার পর আমরা মাধুরোড ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। ষ্টেশনটির চারিদিকে অরণ্য। বৎসরে তিনবার এই জঙ্গলগুলির ভিতর অপূর্ব্ব জাগৃতি দেখা যায়। ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল দূরে মাধু। মাধুর রোমান-ক্যাথলিক গীর্জ্জা সিংহলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত খৃষ্টীয় মন্দির। বৎসরে তিনবার মেরীমাতার উপাসনাকে উপলক্ষ করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের পূজার মত এই উপলক্ষে মেলাও বসে। ৪০ হাজার ৫০ হাজার পর্য্যন্ত যাত্রী দর্শনার্থী হইয়া আসে।

ইহার পর আমরা মাদাওমাবচি ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে একটি লাইন সিংহলের সর্ব্বোত্তর সীমান্তে অবস্থিত জাফনার দিকে আগাইয়া গিয়াছে। ঐ লাইনটি কাঙ্কেসান্থরাই নামক স্থানে গিয়া শেষ হইয়াছে। জাফনা নাম এই দ্বীপের একটি উপদ্বীপাকার ভূখণ্ডকে দেওয়া হইয়া থাকে। এই ভূখণ্ডের ভিতর জাফনা এবং কাঙ্কেসান্থরাই এই দুইটি ছাড়া উল্লেখযোগ্য সহর নাই। এই অঞ্চলটি ধান্য এবং তামাকের চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। ভূমি সেরূপ উর্ব্বর নহে বলিয়া প্রচুর পরিশ্রম করিয়া এই দুইটী পণ্য উৎপন্ন করা হয়। মাদুর এবং পর্দ্দা এই দুইটি শিল্পজ পণ্য জাফনা অঞ্চল হইতে আসিতে দেখা যায়। আমরা পরে জাফনা সহরে গিয়াছিলাম। ইহাও সিংহলের অন্যতম শাসনকেন্দ্র। একজন সরকারী এজেণ্ট এবং বিচার প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের এক একজন কর্ম্মকর্ত্তা রহিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রচারক-

উপনিবেশ এখানকার একটি বৈশিষ্ট্য। ওলন্দাজ ও পর্তুগীজদের সময় হইতে ইহা খৃষ্টীয় প্রচারকেন্দ্র বলিয়া বিবেচিত। ওলন্দাজ শাসনের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ একটি ওলন্দাজ দুর্গ এখনও বর্ত্তমান আছে। জাফনার

এলাটা—৩৮—গী বিহার (ভগ্নাবশেষ) পুলস্তপুর বা পোলোনারুয়া

চতুর্দ্দিকেই অধিক তামিলভাষী বাস করে। ভারতের নিকটে বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ইহাদের সকলেই দক্ষিণ ভারতীয় তামিল সম্প্রদায়ের লোক। অধিকাংশই শৈব মতাবলম্বী, বৌদ্ধ নহে। এক সময় সিংহলে তামিল-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তামিলরা সিংহলীদের অপেক্ষা অধিকতর কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। কাফেসাহেবরাই সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থায়ী নিবাস।

আমাদের গাড়ীখানি মাদাওয়াচি জংশন হইতে কিছুদূর দক্ষিণে আসিয়া অনুরাধাপুর পৌঁছিল।

অনুরাধাপুর আজিও বৌদ্ধজগতের অন্যতম পুণ্য-তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সিংহলী বৌদ্ধগণের পক্ষে ইহাই পুণ্যতম তীর্থ। প্রত্যেক পৌর্ণমাসীতে সিংহলের বিভিন্ন অংশ হইতে বৌদ্ধগণ আসিয়া এখানকার বিভিন্ন বুদ্ধমন্দিরে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া থাকে। অর্চ্চনা-বেদীতে অর্ঘ্যরূপে নানা প্রকার দ্রব্য এবং এমন কি অর্থও প্রদত্ত হইয়া থাকে। হিন্দুদের দেব-দেবীর যেরূপ পূজা হয়, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরে ঠিক সেরূপ পূজা অনুষ্ঠিত হয় না। উভয় ধর্ম্মাবলম্বী উপাসকরাই উপাস্য দেবতার বিগ্রহের সম্মুখে বিরাজিত বেদীর উপর খাদ্য দ্রব্য, সুগন্ধি মশলা এবং ধূপ-দীপাদি শ্রদ্ধার্ঘরূপে নিবেদন করিয়া থাকে। বুদ্ধের উদ্দেশে যাহার যাহা দান করিবার, উৎসর্গ বা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা, সে বুদ্ধ-বিগ্রহের পুরোবর্ত্তী বেদীর উপর তাহা রাখিয়া দেয়।

প্রত্যেক পূর্ণিমা ছাড়া জুনমাসে বার্ষিক পোসন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবার সময় হাজার হাজার দর্শনার্থী, পূজার্থী নরনারী অনুরাধাপুর আগমন করে। এই সময় স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা না করিলে চলে না এবং এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও ট্রেণে সকলের পক্ষে স্থান সংকুলান হয় না। অনুরাধাপুর সিংহলী রেলপথের বিভাগীয় কর্ম্মকর্ত্তার থাকিবার স্থান এবং রেলপথ-সম্পর্কিত কাজ-কর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্র। সিংহলের পুরাকীর্ত্তিদর্শনার্থী পর্য্যটকদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণস্থল বলিয়া এবং বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী সিংহলের শ্রেষ্ঠতম তীর্থ বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও দলে দলে দর্শনার্থীরা অনুরাধাপুর আগমন করিয়া থাকে। অনুরাধাপুরের পুরাকীর্ত্তিসমূহের সহিত সমগ্র সিংহলের ইতিহাস ওতপ্রোতঃ ভাবে বিজড়িত। এই নগর সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সিংহলের রাজধানী ছিল।

সিংহল এই নামের কারণ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের বাঙ্গালী বিজয়সিংহ-কর্ত্তৃক সিংহল জয়ের কথাই মনে পড়িবে। বিজয়সিংহ গুর্জ্জর দেশের রাজপুত্র—এরূপ ধারণা অনেকে পোষণ করেন। বিজয় নামটা বাঙ্গালীদের পক্ষকেই সমর্থন করিতেছে। গুর্জ্জরে এরূপ নাম বিরল। বিজয়সিংহ যে দেশেরই রাজপুত্র হউন, তিনি সদলে পোতারোহণে সিংহল জয়ের জন্য যাত্রা করেন নাই। তাঁহার গন্তব্য অন্য কোন দেশ বা দ্বীপ। তিনি প্রচণ্ড ঝটিকার জন্য সিংহলের উপকূলে সদলে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। তালীবনশ্যাম সিংহল তাঁহার অত্যন্ত ভাল লাগে। সিংহলের উপ-কূলাংশের মৃত্তিকার তাম্রাভ বর্ণ দেখিয়া তিনি এই দ্বীপকে 'তাম্রপর্ণী' আখ্যায় অভিহিত করেন। পালী ভাষায় তাম্রপর্ণী বলা হয়। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বারিধি বক্ষে বহুদিন বিচরণ করিয়া বিশেষ পরিশ্রান্ত ও বিরক্ত অনুচরবর্গ আর সমুদ্র ভ্রমণে সম্মত নহে বুঝিয়া বিজয়সিংহ তাঁহার বিজয়পতাকা সিংহলের তাম্রবর্ণাভ উপকূলে প্রোথিত করিলেন। পোত হইতে সিংহলের মৃত্তিকায়

নামিবার সময় পরস্খলন হওয়ার ফলে তাঁহার ভূপতিত হইবার আশঙ্কা ঘটে। দুই হস্ত বিস্তৃত করিয়া তাড়াতাড়ি উপকূলের তাম্রবর্ণ মৃত্তিকায় করতল স্থাপন করায় তিনি পতন হইতে রক্ষা পান। এই জন্যই তিনি অনুচরবর্গকে বলেন—এই দ্বীপ আমার করগত হইল। গ্রীক ও রোমানরা এই দ্বীপকে ট্যাপ্রোবেন আখ্যায় অভিহিত করিয়াছে। তাম্রপর্ণী নামটি বিকৃত হইয়া এইরূপ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বিজয়সিংহ কর্তৃক অধিকৃত হইবার পর দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরাই দ্বীপের অধিবাসীদিগকে সিংহলী বা 'সিংহের দল' বলিয়া অভিহিত করে। 'সিংহলীদের দ্বীপ' এই আখ্যা ক্রমশঃ সিংহল-দ্বীপে পরিণতি পায়। সংস্কৃত সিংহলদ্বীপ পালিভাষায় 'সিহলদিপ' হইয়াছে। পরে আরব দেশের নাবিকরা এই নামকে সেরেনদিবে পরিণত করে। মধ্যযুগেই ইউরোপীয়রা ইহাকে জিলন বা সিলন বলিতে আরম্ভ করে। বর্তমান আখ্যা 'সিলোন' এইরূপে জন্ম লাভ করিয়াছে।

বিজয়সিংহের এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের কাল ৪৮৩ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ।

তৎকালে সিংহল-দ্বীপে হিন্দুধর্মই প্রচলিত ছিল। রাজারা হিন্দু ছিলেন বলিয়া হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাই তাঁহারা করিতেন। তবে এই সময়ে এই দ্বীপের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধ জনপদ ভারত হইতে কোন কারণে পলায়িত বৌদ্ধগণের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন। এইরূপ জনপদ দুই তিনটির অধিক ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। রাজা তিসার সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম সিংহলে প্রবর্তিত হয়। খৃষ্ট-পূর্ব ২৫৭ অব্দে রাজা তিসা সিংহলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সিংহাসনে বসিয়াই ভারত-সম্রাট অশোককে বন্ধুত্ব ও বন্ধুতার নিদর্শন-স্বরূপ বহু বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইতে মনস্থ করেন। তৎকালে পৃথিবীতে অশোকের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট আর ছিল না। ঐরূপ সম্রাটের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলে সিংহলের প্রভাব ও গৌরব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া রাজা তিসার মনে হইয়াছিল। সম্রাট অশোকের উপহারগুলি গ্রহণ করা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, তিনি তিসাকে ধন্যবাদ দিয়া ঐগুলিকে ফেরত পাঠাইয়াছেন। তোমার বক্তব্য আমি অনুমোদন করিয়া লইলাম—ইহা সম্রাট রাজাকে জানান। প্রত্যর্পিত উপহারগুলির সহিত সম্রাট জাহ্নবীজল প্রভৃতি এমন কতকগুলি পবিত্র পদার্থ পাঠাইয়া দেন, যেগুলি রাজ্যাভিষেক-ব্যাপারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাটলি-পুত্র হইতে প্রেরিত এই সকল উপহার ব্যবহার করিয়া রাজা তিসা দ্বিতীয় বার আপনার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সম্রাটের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন। এইরূপ প্রণালীতেই বক্তব্য স্বীকৃত হইত।

সম্রাট অশোক তিসার নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে বৌদ্ধধর্ম নিজে গ্রহণ এবং সকলকে গ্রহণ

ক্যাণ্ডির ডোলঘরক

করিতে বাধ্য করার জন্য আদেশ ও অনুরোধ ছিল বলিয়া জানা যায়। বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা অশোকের জীবনের

সর্বপ্রধান ব্রত ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের জন্য অশোক যাহা করিয়াছেন পৃথিবীর কোন সম্রাট বা রাজা কোন ধর্মের জন্য কোন কালে তাহা করেন নাই। পত্রবাহক দূতকে রাজা জানান যে সম্রাটের আদেশ তিনি শিরোধার্য্য

ব্যাধের মৃত্যু

করিয়াছেন। তিনি নিজে বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত পরম পবিত্র ধর্ম্ম অবশ্যই গ্রহণ করিবেন, পরিবারবর্গকেও গ্রহণ করাইবেন। যাহাতে তাঁহার অধীনস্থ সামন্তগণ ও প্রজাপুঞ্জ ইহা গ্রহণ করে সে বিষয়েও তিনি প্রাণপণ প্রযত্ন প্রয়োগ করিবেন। সম্রাট্ পত্রাদি প্রেরণের অব্যবহিত পরেই স্বীয় পুত্র মহিন্দকে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দিয়া তাগ ও ধর্ম্মানুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এই মহিন্দ (পালি) বা মহেন্দ্র সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মহেন্দ্রকে অশোকের ভ্রাতা, কেহ কেহ পুত্র বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করেন। অনুরাধাপুরের নিকটবর্ত্তী মিহিন তেল পাহাড়ে মহিন্দের সহিত তিসার সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মোপকথন হয়। এই সাক্ষাতের অনন্তরাল পরেই রাজা নিজে এবং তাঁহার পরিবারবর্গ, সভাসদবর্গ, সামন্তবর্গ এবং প্রজাসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই দেশকে বৌদ্ধধর্ম্মে পরিণত করে।

যাহারা সিংহলের ইতিহাস, ইতিকথা বা ইতিগাথা রচনা করিয়াছে তাহাদের সকলেই বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণ। তাঁহারা রাজা তিসাকে মৌরবের উচ্চাসনে বসাইয়াছেন। তাঁহারা রাজাকে দেবানাম্ পিয় তিসা —দেবানাং প্রিয় তিসা—দেবতাদের প্রিয় তিসা আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। রাজপুত্র মহিন্দ ভিক্ষুত্বে দীক্ষিত হইয়া পিতৃ-আদেশে দেশে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তিনি সিংহলে আসিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ গঠন করিলেন। সম্রাট পুত্রকে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার জন্য কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকেও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সঙ্ঘমিত্রা কয়েকজন ভিক্ষুণীকে ভারত হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। আর একটি পরম পবিত্র পদার্থকে সম্রাট সিংহলে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্ব-বিখ্যাত বোধিবৃক্ষের শাখা। এই শাখা সিংহলে রোপণ করিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। অনুরাধাপুরে সেই বোধিবৃক্ষের শাখা হইতে সমুৎপন্ন বৃক্ষ এখনও বিদ্যমান আছে। শত শত শতাব্দীর প্রচণ্ড প্রতিকূল শক্তিপ্রবাহে—সর্বধ্বংসী কালের বিনষ্ট করিবার নিষ্ঠুর চেষ্টা—এই অতি প্রাচীন বৃক্ষের কোনও অনিষ্ট করিতে পারে নাই। ইহাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম পাদপ বলিয়া মনে করা হয়। এই বৃক্ষের রক্ষক যাহারা তাহারা বংশানুক্রমে এই কার্য্য করিতেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সম্ভ্রান্ত পরিবার বলিয়া তাঁহাদের কথা বন্ধু শিবসুন্দরম্ উল্লেখ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর পবিত্রতম ও পুরাতনতম পাদপের রক্ষক-পরিবারের পক্ষে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। বুদ্ধগয়ার যে বৃক্ষের তলে বসিয়া শুদ্ধোদনপুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহাই বোধিবৃক্ষ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে।

যেমন সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রস্তর-প্রস্তুত ইমারত ছিল না বলিয়া পণ্ডিতদের অভিমত, তেমনই দেবানাম্ পিয় তিসার পূর্ব্বে সিংহলে শিলানির্ম্মিত সৌধের প্রচলন হয় নাই বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সম্রাট্ অশোক শুধু বৌদ্ধপ্রচারক দল পাঠাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, বিহার ও মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য সুদক্ষ স্থপতি ও ভাস্করগণকে ভারত হইতে সিংহলে পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং শুধু ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি নহে, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রাঙ্কনকলা প্রভৃতি সর্বপ্রকার শিল্পের জন্যও সিংহল ভারতের শিষ্যত্বই স্বীকার করিয়াছে। আমরা অনুরাধাপুরে এবং পুলস্তপুর বা পোলানারুয়ায় যে সকল আশ্চর্য্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাই তাহাদের প্রত্যেকটিই ভারতবর্ষের স্মৃতিই উদ্রিক্ত করে। বৌদ্ধ-বিহার ও মন্দিরের যে সকল ভগ্নাবশেষ ভারতের বক্ষে আমরা দেখিতে পাই, সিংহলের বক্ষে বিদ্যমান ঐগুলাতীয়

পুরাকীর্তিগুলির সহিত তাহাদের পার্থক্য অধিক নহে। ভারতবর্ষে যে.গা, ওঙ্গ, কুশান, গুপ্ত প্রভৃতি বিভিন্ন যুগে স্থাপত্যে,ভাস্কর্যে যে বিভিন্ন প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছিল সিংহলেও আমরা সেইরূপ প্রবর্তন ও পরিবর্তনের নিদর্শন দর্শন করি। স্থাপত্যে দ্রাবিড়ী অপেক্ষা উত্তর-ভারতের প্রভাব সিংহলে অধিক এই সত্য অনেককে বিস্মিত করিতে পারে। ইহার অন্যতম হেতু উত্তর ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিই সিংহলে প্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

অবশেষে খৃষ্টপূর্ব ১৪৪ অব্দে চোল-দেবের তামিল বীর এলানা সিংহলে সবলে গিয়া অনুরাধাপুর আক্রমণ-পূর্বক তথাকার সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহলী রাজা পলাইয়া গিয়া অন্যত্র আশ্রয় লন। এলানা ৪৪বৎসর ব্যাপিয়া অনুরাধাপুরে রাজত্ব করেন। ইনি হিন্দু ছিলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি তামিল বা চৌল মাত্রেরই হিন্দু। হিন্দু হইলেও এলানা সিংহলী বৌদ্ধদের উপর বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন নাই। রাজা জাতিধর্মনির্বিচারে সমভাবে সকলের রক্ষক হইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার মত।

ওদিকে সিংহলী রাজবংশ দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া একটি কলম্বোর নিকটবর্তী কেলানিয়ায় এবং অপরটি দূর দক্ষিণে বিরাজিত মাগামার থাকিয়া এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। এলানা সিংহলের উত্তরাংশের উপরেই অপ্রতিহত আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সিংহলী রাজবংশদ্বয়কে বিনষ্ট করিবার জন্য তিনি কোন চেষ্টা করেন নাই। কেলানিয়া এবং মাগামার রাজারাও এলানার বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতে সাহসী হন নাই। পরে মাগামারাজের এক পুত্র আপনাদের পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য মনে মনে সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া এলানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার ইচ্ছা করেন। পুত্রের এই দুঃসাহসে মাগামারাজ ক্রুদ্ধ হন। পুত্রও পিতাকে বিদেশীর বশ্যতা ও দাসত্ব স্বীকার করা এবং স্বীয় গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য কোন প্রযত্ন না করার জন্য দোষী বলিয়া ঘোষণা করেন। এই রাজপুত্রের নাম গামিনী অভয়। কিন্তু ইনি ইতিহাসে দুট্ঠ গামিনী নামে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুট্ঠ অর্থাৎ দুষ্ট। আদেশ অমান্য ও বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার জন্য রাজাই বোধ হয় পুত্রকে দুষ্ট আখ্যা দান করেন। অভয় গামিনী কুদ্ধ পিতার নিকট হইতে পালাইয়া প্রদেশে পলাইয়া যান এবং তথায় গিয়া এলানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উত্তোলন করেন।

পিতার মৃত্যুর পর দুট্ঠ গামিনী রাজ্যে ফিরিয়া যান। ইতোমধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। যুদ্ধে তিষ্যকে পরাজিত করিয়া গামিনী পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। পরে উভয় ভ্রাতা মিলিত হইয়া এলানার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য যাত্রা করেন। এলানাকে বিতাড়িত করিয়া সমগ্র সিংহলের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া বৌদ্ধধর্মকে প্রবলতর করিতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন। ধর্মের নাম শুনিয়া সিংহলীরা দলে দলে দুট্ঠ গামিনীর পতাকা-তলে দাঁড়াইল। অবশ্য এলানার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কাহারও কিছু ছিল না। তিনি অসিংহলী ও হিন্দু, এই দুইটি অবশ্য বলা চলে। দুট্ঠ গামিনী তাঁহার

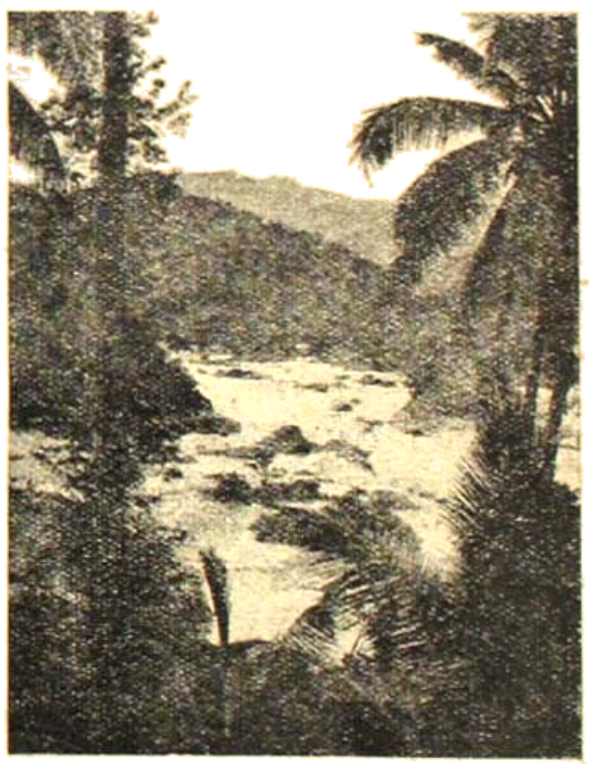

ম্যাণ্ডিব প্রীতিকর প্রাকৃতিক পরিবেশ

সৈন্যগণকে শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা দক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বেত্রিশত মাইল আগাইয়া গিয়া অনুরাধাপুরের কয়েক

যাইল দক্ষিণে সৈন্য সন্নিবেশ করেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। এলানা এবং দুৎত গামিনী উভয়ে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পরস্পর আক্রমণ করেন এবং কিছুক্ষণ সংগ্রাম চলার পর এলানা গামিনীর হস্তেই নিহত হন। গামিনীর হস্তীর নাম কাবুলা। সিংহলীরা আজিও কাবুলা নাম ভালবাসে।

পালিভাষায় লিখিত মহাবংশ-নামক ঐতিহাসিক মহাগ্রন্থে দুৎত বা দুৎথ গামিনীর কীর্তি-কাহিনীই সর্বাপেক্ষা অধিক স্থান গ্রহণ করিয়াছে। মহাবংশের লেখক বৌদ্ধ শ্রমণগণ বুদ্ধঘোষের এই সর্বশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষককে কি দৃষ্টিতে দেখাইয়াছেন তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি। এলানা বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার না করুন, তিনি যে অ-বৌদ্ধ, ভিক্ষুগণের পক্ষে ইহাই অত্যন্ত দুঃখদায়ক ছিল; সুতরাং এই বৌদ্ধ বীরের অনুরাধাপুর অধিকার তাঁহাদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সন্দেহ নাই। দুৎত গামিনী অনুরাধাপুরের সিংহাসনে বসিয়া আপনাকে সমগ্র সিংহলের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। খৃষ্টপূর্ব ১০১ তাঁহার অনুরাধাপুরের সিংহাসনে আরোহণের কাল। সুতরাং দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল হইল এই ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সিংহলী পৃষ্ঠপোষক নৃপতি পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়া ভারতবর্ষের পবিত্র পাদপীঠ-স্বরূপ এই দ্বীপে অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকীর্তির এবং মহাবংশে উচ্ছ্বসিত ভাষার বর্ণিত বিস্তৃত কীর্তিগাথার ভিতর দিয়া এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছেন বলা চলে। 'কীর্তির্যস্য স জীবতি' এই বাণী যদি সত্য হয় তাহা হইলে দুৎত গামিনী আজিও জীবিত রহিয়াছেন বলিতে হইবে। [ক্রমশঃ

সুকুমার

শ্রী পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়

ভোর হয়েছে। গত রাত্রের ঘুমন্ত সলিল পথটা হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে। চারিদিকে পড়েছে সাড়া—রাস্তায় লোক-চলাচল সুরু হয়েছে, ট্রাম-বাসগুলোও চলছে ঠিক আগের মত। করলার দোকানে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে সবাই। যেন গত দিনের পুনরাবৃত্তি। সব কিছুই আগের মত চলেছে, কেবল পরিবর্তন হয়েছে মনের। সুকুমারের মনটা অবসাদে মুষড়ে পড়েছে। ভোরবেলা উঠেই তাকে যাবতীয়ের দরোজার লাইনে দাঁড়াতে হয়; জীবনের চতুর্দিকেই লাইনের বেড়া।

ছোট্ট একটা বাড়ী। ক'লকাতা সহরের অখ্যাত কোন এক নোংরা গলির মধ্যে বাড়ীটা। দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, মান্ধাতার আমল থেকে আজ পর্যন্ত কোন সংস্কার হয় নি। বাড়ীটার আশেপাশে করেছে সবুজ রং আর প্লাষ্টারের ইতস্ততঃ চিহ্ন। তারই একটি খোপে থাকে সুকুমারের পরিবার। পাশের খোপের মত ছোট ও স্যাঁতসেঁতে। তার জন্যে সব ক'টা ছেলে মেয়েই রুগ্ন হাড় বের করা কঙ্কাল।

ঘুম থেকে উঠে চোখমুখ ধুয়ে যায় করলার লাইনে। ঠেলাঠেলি মারামারির অন্ত নাই; তাও সহ্য হয়—যদি বরাতে মেলে দু'এক সের। কিন্তু উঠোউঠি তিন দিন তাকে শূন্য থলি নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। হাতের শূন্য থলিটার দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকায় সুকুমার। মনে জাগে সীমান কথা, পাপ নেই, বর্ম নেই সোটা পৃথিবী যেন ঢাকা পড়েছে করলার মত কালোর আস্তরণে।

ঐ যে করলার দোকানদার গৌরীশঙ্কর,—ফিলফিলে চেহারা দু'দিনে ফুলে লাল হয়ে গেছে। কয়েক দিনের মধ্যে ক'লকাতার বুকে প্রাসাদোপম বাড়ী হাঁকিয়েছে; ঐ এক কালে ছিল তার বড় বন্ধু। আর আজকাল দেখা হলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। কথাও বলতে চায় না। মুহূর্তে শিরিয়ে ওঠে সুকুমারের মন,

বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সে ভগবানের বিরুদ্ধে, কে বলে ভগবান আছেন। যত সব ভণ্ড প্রতারকের দল, মানুষের মনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে ভগবানের নেশায়।

বেলা হয়, ঘড়িতে বাজে সাড়ে নয়টা। রাস্তায় কোলাহল আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। ঘর ঘরে কিম্বা আধ ময়লা জামা-কাপড় পরে, মুখে পান গুঁজে সবাই দাঁড়িয়ে আছে ট্রাম বা বাস-ষ্টপেজের সামনে। গায়ে গায়ে ঠাসা যাত্রী নিয়ে ঠাসা ট্রামটা এসে থামতেই সবাই হুড় মুড় করে এগুতে থাকে। যুদ্ধের অবদানটা স্বচক্ষে দেখেনি সুকুমার, তবুও মনে হয় লড়াইয়ের কামেলা এর চেয়ে অনেক কম। রাম-রাবণের যুদ্ধের মহড়া দেবার পর বিজয়ী পক্ষ কোন রকমে হাতলটা শক্ত করে ধরে বাদুড়-ঝোলার মত ঝুলে থাকে। সুকুমারও তাদের দলে পড়ে যায় নেহাৎ ভাগ্যক্রমে।

ডালহৌসীতে নেমে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে সুকুমার। দ্রুত গতিতে হেঁটে চলে অফিসের দিকে। কয়লা আর কয়লা। কি হয় এত কয়লা দিয়ে! ঘরে চাল নেই, কাপড় নেই, তেল নেই, চিনি নেই, নেই নেই এর পালা। কেরাণি, জীবনে একমাত্র মন্ত্র আছে যা' গৃহিণীর কাছ থেকে নিরন্তর শুনতে হয় সেটা "নেই"।

ইস্! বড্ড বাঁচা বেঁচে গেল সুকুমার। আর একটু হলে ট্রামের চাপা পড়েছিল আর কি! সাংসারিক চিন্তায় সে হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে, তাই খেয়াল করেনি ও।

অফিসে হাজির হয়ে দেখে ঘড়িতে সাড়ে দশটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি ঘাড় গুঁজে কাজ সুরু করে দেয়, কাজেও মন বসতে চায় না, বড় চঞ্চল তার মন,মনে পড়ে কলেজ-জীবনের কথা। স্বপ্নময় দিনগুলো মিলিয়ে গেছে কোন্ বহাদুরে যার ঠিকানা নেই। ভাবুক প্রকৃতির ছেলে সুকুমার, মনের মধ্যে রয়েছে কাব্যের স্পর্শ—অনেক রাত অবধি জেগে জেগে সে লিখে চলে কবিতা। ম্লান মুখে ভাবা দেবে সে। তার কাব্যের বজারে সমস্ত দেশে তুলবে ঝড়। গোটা জাতটা শিক্ষায় আলোয় প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে, ভারতবাসী আবার শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি বিজ্ঞানে পৃথিবীর নেতৃত্ব করবে। "জাগ্ আর জাগাও" তার কাব্যের মূলমন্ত্র। শুধু তাই নয়, সে আরও লিখত প্রেমের কবিতা। তার তরুণ মনে জেগেছিল ঝড়।

শ্যামবর্ণ ছিপছিপে মেয়েটাকে সে ভালবেসেছিল। তার নাম ছিল সুলোচনা, সুলোচনার নামের সাথে অনেকখানি সামঞ্জস্য ছিল তার হরিণের মত আয়ত চোখ দুটোর। সেই চোখই তাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল, যতখানি না ছিল তার রূপ। আজও সে সুলোচনাকে ভালবাসে। হ্যাঁ, ভালবাসে বৈ কি। কিন্তু কোথায় সুলোচনা! সুকুমার আর তার মধ্যে আজ রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। সে হয়ত কোন ধনী যুবকের সবল আলিঙ্গনের মাঝে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে সন্তানের, সুস্থ সবল একটি সন্তান—যার আশায় উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে সুলোচনার মাতৃহৃদয়, আর সুকুমার স্বপ্ন দেখে—কি ভাবে কয়লা মেলান যায়! কি ভাবে চা'ল মেলান যায়!

সুকুমার সুলোচনার সাথে মনে মনে তুলনা করে স্ত্রী নিরুপমার। সুলোচনা ছিল চঞ্চল প্রকৃতির, মুখের কোণে ইস্পাতের মত এক টুকরো হাসির রেখা। ওষ্ঠপ্রান্তে তা আর কখনও মিলিয়ে যায় নি। বিদ্যুৎ-চমকের মত সেই হাসি সুকুমারকে আরও অনেকখানি বেশী ভাবুক করে তুলেছিল।

সে একদিন বলেছিল, আমার কি ইচ্ছে করে জান সুকুমারদা?

—কি? প্রশ্ন করে সুকুমার।

—ইচ্ছে করে হাওয়ার মত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ব। মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়ে বেড়াব দেশ থেকে দেশান্তরে। সুলোচনার স্বপ্নালু চোখ দুটো আবেগে মুদ্রিত হয়ে আসে।

মুক্তি পিপাসু সুলোচনার মনের সাথে সুকুমার তার কল্পনাপ্রবণ মনের স্রোত মিলিয়ে দেয়।

সুলোচনার পাশে নিরুপমা, বড্ড বেমানান। তার মনে কাব্য নেই,আছে বাস্তবের প্রখরতা, বড্ড গভীর তার মন। নিক্ষ সিরিয়াস মনের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আজও হয় নি সুকুমারের, সে হাসতে জানে না, কাব্যেরা বুলি আউড়িয়ে স্বপ্নকাল বুনতে জানে না। হ্যাঁ, তবে

তার রূপ আছে। সে রূপ সুলোচনার রূপের মত তীব্র নয়, স্নিগ্ধ।

সাড়ে চারটে বাজে অফিসের ঘড়িতে। বড় সাহেবের যাবার সময় হল। আর একটু পরেই ছুটী পাবে সুকুমার। কাঁচের জানলা ভেদ করে আসছিল এক ঝলক মিঠে রৌদ্র। বড় মিঠে মনে হয় বৈকালের অনুত্তপ্ত রৌদ্রকে, রাস্তার কলরব পূর্ব্বাপেক্ষা বেড়েই চলেছিল। মনটাকে চঞ্চল করে তোলে।

বড় সাহেব চলে গেছেন। খাতা-পত্তরগুলো গুছিয়ে ঠিক ঠাক করে রাখে সুকুমার, তারপর এগিয়ে চলে ট্রাম-লাইনের দিকে। রোজকার ঘটনা চিরদিন চলে আসছে, সেই গতানুগতিক ঘটনার কোন পরিবর্ত্তন হয় নি' আজও। আগের মতই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে আফিস-ফেরতা কেরাণীদল। তাঁদের আসার সময়কার চেহারা আর যাবার সময়কার চেহারা মিলিয়ে দেখলে অনেকখানি পার্থক্য নজরে পড়বে। সকালে তারা এসেছিল ব্যস্ততা-পূর্ণ ও সজীব ভঙ্গিতে। আর বিকেলে ফিরে চলেছে প্রচণ্ড অবসাদ নিয়ে। সে সজীবতাপূর্ণ ভঙ্গি আর নেই। শরীরের অর্দ্ধেকখানি যেন তারা রেখে এল অফিসের খাতা আর কলমের মধ্যে। সুকুমার এসে দাঁড়ায় ট্রাম-ষ্টপেজের এক পাশে। এত ভিড় ঠেলে যাবার মত শক্তি ও সাহস তার নেই। একঘেয়ে জীবনের উপরে জমেছে প্রবল ঘৃণা।

ট্রামগুলো একে একে চলে যাচ্ছে। সে দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুকুমার। তারপর উঠে পড়ে পা-দানীর উপর পরে, কবে যদে কালো মুচ মুচে হাতলখানা।

বাসার দরোজায় পা বাড়াতে না বাড়াতেই কানে যায়—ছোট ছেলেটা মিহি গলায় কেঁদে চলেছে,তার উপর নিক্ষ বাক্যবাণ বর্ষণ করে চলেছে,—মর মর, তোরও হাড় জুড়োক, আমিও বাঁচি। এক কোঁটা পথ্য পাবিনে, ওষুধের কোঁটা মুখে পড়বে না, ওর চেয়ে তোর মরা ভাল।

কানে শেলের মত এসে বেঁধে সুকুমারের। এ খোঁচা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয় নি নিজে। স্ত্রীর অক্ষমতার উপরে তার কথাগুলোর ভিত্তি, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে সুকুমারের। বাসায় ঢোকার এক তিল ইচ্ছেও আর থাকে না, আশেপাশের বাতাস যেন নিঃশ্বাস রোধ করে ফেলতে চায় সুকুমারের। যে ভাবে এসেছিল ঠিক সেই ভাবে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে, পা'দুখানা আড়ষ্ট হয়ে আসছে। তবুও সে এগিয়ে চলে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে।...

রহস্যময়ী

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস

তোমারে বুঝেছি আমি, এই দর্প করিনা করি না,
দেখেছি তোমার মুখ, পেয়েছি তোমারে কত কাছে,
তবুও তোমার চোখে জানি নাই' কত কি যে আছে।
তুমি প্রিয়া লাস্যময়ী, ছলনার বাঁকাচোরা ছিলা,
উদাস কপট ছলে, ছলো করি মিনতি তোমারে,
আমার দেখেছি করো অভিমানে ক্রোধে ছল ছিলা,
মধুর-গুরুমা থেকে রক্ত-রুল ফুটে উঠে মুখে।
রহস্যময়ী তুমি, দেখেছি তো! জানি শুধু জানি
তোমার একটি রূপ, তোমার নূতন পরিচয়;
আজ নয় পরিমাপ, ভালোবাসো, বাসো কতখানি,
প্রীতি, সুখ, দুঃখ, ত্যাগ, আজ আর কোনো কিছু নয়।

তোমারে পেয়েছি আজ; মুক্ত মোর সকল মন প্রাণ
তোমার অমেয় প্রেমে। জানি না সে কতদূর যান।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

রবীন্দ্র-প্রতিভা সর্বতোমুখী ; একই প্রতিভার মধ্যে কল্পনা-মহের বিভিন্ন বিভূতির এমন অপূর্ব সমাবেশ ও পূর্ণ প্রকাশ ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয় নাই। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিরাট দান—সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতার নহে, গানের মধ্য দিয়াও অসীমের সন্ধানে দূর্ত আনন্দ করিয়াছেন, যাহার সুর সদাই (eternal) শাশ্বত, নিত্য, অবিনশ্বর। জগদ্বিখ্যাত Wagner বলিয়াছেন, "All things eternal can be expressed with unmistakable certainty in Music."

রবীন্দ্রনাথ কি ধর্ম-সঙ্গীত, কি জাতীয় সঙ্গীত, কি প্রেম-সঙ্গীত এই বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গীতে, বিভিন্ন ভাবের ও বিভিন্ন সুরের সমন্বয়ে এক বিরাট সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহা লক্ষ্য করা কঠিন নহে যে, তাঁহার সুরাবলীর বৈশিষ্ট্য বয়স বৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। কবি বিলাতে অবস্থানকালে ইংরাজী ও ইউরোপীয় সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন ও পাশ্চাত্য রীতের সম্পর্কে কিছু তাঁহার সঙ্গীতের মধ্যে দান করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করা কঠিন নহে। বঙ্গ-সাহিত্যে ও সঙ্গীতে আর এক বিরাট পুরুষ দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি ও রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর একই খাসে পাশ্চাত্য রীত গাহিতেন ও রবীন্দ্রনাথ ইংরাজীয়ান রীত অধিকতর গাহিতেন। উভয়েই বাঙ্গলা গানে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ঐশ্বর্য দান করিয়া বঙ্গীয় সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন ও পুরস্কার স্বরূপ জীবদ্দশায় দেশবাসীর নিকট হইতে যথেষ্ট অত্যাচার লাভ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কথার রচনা বা সুরের সৃষ্টি করেন নাই—তিনি নিজে সুগায়ক ছিলেন। অতি মধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন, তিনি তাঁহার কণ্ঠস্বরে যে কি অপূর্ব নীত গিটকিরী সমক অবলীলা ক্রমে আনিত তাহা যাহাদের ব্রাহ্ম-সমাজে রবীন্দ্রনাথের (যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায়) ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল তাহাদের হৃদয়ে আমরণ সেই মধুর স্মৃতি অটুট ছিল ; তবে যাহাদের রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে ও যাঁহারা সত্যকারের উচ্চাঙ্গের অভিনয় বুঝিতে পারেন, তাঁহারা হয় তো লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাঁহার অভিনয় বা আবৃত্তিতেও স্বরের উত্থান-পতনের কি অপূর্ব মনোহারিত্ব ছিল। এই অপূর্ব modulation অভিনয় বা আবৃত্তি তাঁহার দ্বারাই সম্ভব—তিনি একাধারে খুব বড় গায়ক ও খুব বড় অভিনেতা। অভিনেতা হিসাবেও রবীন্দ্রনাথ শীর্ষ স্থান অধিকার করেন।

এইবার আপনাদের কাছে একটা গল্প বলি—

এক সন্ধ্যায় আমি রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই—সে সময়ে কবি কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া প্রথের প্রশান্ত মহলা নিবাস মহাশয়ের Quarters-এ যোর হয় দ্বিতীয়পুরে চাতরা-আফিসে অবস্থান করিতেছেন। আমাকে তিনি মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিতেন ; আমিও তখন দ্বিতীয়পুরে থাকি। আমার কবি বিশেষ স্নেহ করিতেন—বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালসম্বন্ধে তাঁহার কাছে অনেক কথা শুনিতে চাহিতাম ও অনেক অদ্ভুত প্রশ্ন ও আবদার করিতাম এই কারণে।

সে সন্ধ্যায় কবি Sir Henry Irving এর অভিনয়ের কথা বলিতেছিলেন। আমি বলিলাম, "আপনি যে অসুস্থ, তা হইলে বলতাম যে Irving কি রকম অভিনয় করেন তাই দেখাতে।" কবি বলিলেন, 'দাঁড়াও, দেখি প্রশান্ত আছে কিনা বাড়ীতে"—যখন সংবাদ লইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন যে, মহালানবিশ মহাশয়ের বাড়ীতে নাই তিনি মনের আনন্দে চাতরা-আফিসের দোতালার খোলা বারান্দায় Hamlet এর "To be or not to be" বিখ্যাত দৃশ্যটি Irving কি ভাবে অভিনয় করিতেন তাহা দেখাইলেন। সে অভিনয়ের কথা স্মরণ করিলে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কণ্ঠস্বরের কী গাম্ভীর্য, কণ্ঠস্বরের কি অপূর্ব উত্থান-পতন, কি মোহময় তার ব্যঞ্জনা যাহা সান্ধ্য আকাশে, সমুদ্র বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ও উদ্যানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া শরীরে পুলক আনিয়া দিয়াছিল।

আবৃত্তির পর কবিকে আমি বলি যে, কণ্ঠস্বরের এই অপূর্ব উত্থান-পতন কখনই তাঁহার কণ্ঠে সম্ভব হইত না—যদি তিনি একাধারে বড় গায়ক ও বড় অভিনেতা না হইতেন—

কবি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি ঠিক কথাই বলেছো—বিলেতে বা ইউরোপে যারা অভিনয় বা আবৃত্তি করেন তাঁরা গায়ক আর নাই গায়ক, গান করবার চেষ্টা করেন যাতে গলার modulation আসে"। পরে যখন আবৃত্তি বা অভিনয় সম্বন্ধে ইংরাজী প্রবন্ধাদি পুস্তক পাঠ করি, তখন কবির এই উক্তির প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হই।

কবির সহিত ইহার পর কয়েকবার তাঁহার সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার আলোচনার সুযোগ ঘটে। কবি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমাদের বাড়ীতে বড় ওস্তাদ-বিখ্যাত লক্ষ্মিয়ে বিখ্যাত ওস্তাদের গানের আসর হোত। আমি ছেলেবেলা থেকেই তাদের গানে

ঐশ্বর্যে প্রভাবিত হয়েছি"—(কিরূপ প্রভাবিত তিনি হইয়াছিলেন তাহা কবি যে দ্বিজেন্দ্রলালের আগাগোড়া গানের পুস্তক সম্বন্ধে বিরাট সমালোচনা প্রকাশ করেন তাহা পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়।)

কবি নিজে সুগায়ক হওয়ার কারণে তিনি মনে প্রাণে জানিতেন যে, বাংলা সঙ্গীতে তান বিস্তার করা বা সুর লইয়া খেলা করা কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব, যিনি ক্লাসিকাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ও বিশেষ উচ্চ শিক্ষিত অর্থাৎ যাঁহার কাণে উচ্চ রসবোধ বর্তমান।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি তিনি সত্য-সত্যই ক্লাসিকাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে প্রভাবিত হইয়া থাকেন তবে তাঁহার রচিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত বা আশেকার বহু গীত—যথা 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই" বা "যাহার লাগিয়ে তোমায় ভুলেছি তারা তো চাহে না আমারে" ইত্যাদি গীত যাহা ক্লাসিকাল সুর-ঘেঁষা, তাহা প্রচার করিলেন না কেন? তাহার উত্তর এই যে, কবি নিজের দেশের ঘাটল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি ও বিদেশী কাব্য-সঙ্গীতের ঐশ্বর্য নিজের সঙ্গীতের মধ্যে আনিয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

অবশ্য যাঁহাদের হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল সঙ্গীতে রসবোধ প্রগাঢ় তাঁহাদের হৃদয়কে হয়তো রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সঙ্গীত স্পর্শ করিবে না। কিন্তু সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ যে বড় সুরকার বা composer ছিলেন না—এ কথা বলা সম্ভবপর হইবে না। তাঁহাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বা অতুল প্রসাদের প্রায় তাঁহার বহু গীত বর্তমান যাহা ক্লাসিকাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ঘেঁষা ও সেই সব গান খেয়ালী বা ওস্তাদের মুখে তানপুরা, পাখোয়াজ ও বাঁয়াতবলার সহিত গীত হইলে অপূর্ব রস বিস্তার করিয়া থাকে। আমার বেশ স্মরণ আছে যে, আমাদের ভাগলপুরের বাড়ীতে একবার দ্বিজেন্দ্রলালের সম্মুখে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিখ্যাত খেয়ালী ও সে-সময়ে পৃথিবীর বিখ্যাত উকীল দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, রবীন্দ্রনাথের গীত "কে তুমি ভুবনমোহিনী" ও "সখা মম হৃদয়ে রহো" তানপুরা ও বাঁয়াতবলার সাহায্যে গাহেন ও দ্বিজেন্দ্রলাল মুগ্ধ হইয়া সেই গীত শ্রবণ করেন।

উত্তরকালে বাংলার ক্লাসিক গানের গায়ক ও সঙ্গীতাচার্য্য রায় বাহাদুর যদুভট্টের মহাশয় যখন রবীন্দ্রনাথের গীত—"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই" প্রভৃতি গীত—তানপুরা ও বাঁয়াতবলার সাহায্যে গাহেন, তখন দ্বিজেন্দ্রলালের মুগ্ধ বিখ্যাত গায়ক ও সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কেও বহুবার মুগ্ধ হইয়া এই সব সঙ্গীত শ্রবণ করিতে দেখিয়াছি। যদুভট্ট-নাথ নিজে এত বড়ো খেয়ালী হইয়া কেন রবীন্দ্রনাথেরই গীত খেয়ালী চং-এ বা টপ্পার চং-এ গাহিবার জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। যদুভট্টনাথের মুখে যে একবার "আমার পরাণ যাহা চায়" শুনিয়াছে সে কখনও জীবনে এ গীত ভুলিবে না—সোজা ব্যাপার!

যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতে এক দিকে ইংরেজী সুরের প্রভাব অপর দিকে হিন্দুস্থানী খেয়াল-ধ্রুপদের প্রবল প্রভাব লক্ষিত হয়, অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতে একদিকে বাংলার পল্লীর গ্রাম্য গীতি—অপর দিকে লক্ষ্ণৌর ঠুংরী প্রভৃতির প্রভাব লক্ষিত হয়, সেই প্রকার রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাহার পুরাতন গীতাবলী বিশেষতঃ ঐশী প্রেম সম্বন্ধীয় গীতে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ খেয়ালের প্রবল প্রভাব দৃষ্ট হয়, আবার আধুনিক রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ঢংএর সঙ্গীতের বা বিশ্বী কাব্য-সঙ্গীতের প্রভাব জল জল করে। সুর ও গানের canvas রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত সুরকারত্বের অপেক্ষা ঢের বড়—এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত আর একদিন আলোচনায় আমি বলি, "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই" বা "যাহার লাগিয়া তোমারে ভুলেছি" বা "কেন কখন ঘরে বাঁধা যায়" প্রভৃতি গীত এ-সব আপনারই তো। কবি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ", গান আমারই, গান খুবই ভাল—কিন্তু সুর সম্বন্ধে এক ঠিক রবীন্দ্র-সঙ্গীত বলা চলে না, যেমন "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী" কে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বলা চলে।" (কবির কথার অর্থ এই যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ stylisation—যাহা 'আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী'র মধ্যে বর্তমান সে সুরের বৈশিষ্ট্য বা stylisation "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই" বা "যাহার লাগিয়ে তোমারে ভুলেছি" বা "কেন কখন ঘরে বাঁধা যায়" প্রভৃতি গীতের মধ্যে লক্ষ্য করিবার সুযোগ ঘটে না।) তখন কবিকে আমি বলি, "কিন্তু আপনার রবীন্দ্র অসুস্থ হ'লে 'যাহার লাগিয়ে তোমারে ভুলেছি" বা "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই' এই সব গান করেন কেন? কবি হাসিয়া বলিলেন, এ সংবাদটি নিশ্চয় তোমার ভাই ক্ষেমেন্দ্র দিয়াছেন। (আমার মধ্যম ভ্রাতা—ক্ষেমেন্দ্রলাল রায় বি-এ, সঙ্গীত-বিশারদ ক'বর বিশ্বভারতীতে বেশ কিছুকাল Music Department-এ

Principal ছিলেন)। আমি বলিলাম, "হাঁ"—তখন কবি গাঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "ও সব গান আমার হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে আছে—বড় প্রিয় গান।"—তখন মনে হইল এই সব গান কবি হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে ভগবানের আরাধনার জন্য গোপন করিয়া রাখিয়াছেন।

তবু যে কবিরই এইসব পুরাতন ঐশী প্রেমের গীত হৃদয়-মন্দিরে নিভৃতে রক্ষা করিবার দৌর্বল্য বর্তমান ছিল তাহা নহে। দ্বিজেন্দ্রলালেরও এই দৌর্বল্য লক্ষ্য করিবার সুযোগ আমার ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল "আমার জন্মভূমি" বা "আজি বিধাতার তিনি" বা "মেবার পাহাড়" বা "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি গীত গাহিতে বা শিখাইতে যেরূপ ব্যাকুল ছিলেন বা "বঙ্গ আমার জননী আমার" স্বাভাবিক অসুস্থতার জন্য গাহিতে পারেন না বলিয়া যেরূপ দুঃখ প্রকাশ করিতেন, সেরূপ ব্যাকুলতা তাঁহার একটি প্রেম জনিত সঙ্গীত, যাহা বঙ্গীয় সঙ্গীতের একটি অমূল্য রত্ন "প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমারই প্রতিমা" গীত গাহিবার জন্য বা শিখাইবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা আমরা কোন দিন লক্ষ্য করি নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল হয় তো রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বলিতেন "প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে" চমৎকার গান ও সুরও চমৎকার কিন্তু তাকে ঠিক দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীত বলা চলে না—যেমন "আমার জন্মভূমি" বা "মেবার পাহাড়" বা "বঙ্গ আমার" কে বলা চলে সুতরাং ইহা লক্ষ্য করা কঠিন নহে সুরকার (Composer)-এর মধ্যে এ মনোবৃত্তি স্বাভাবিক।

আমার মনে হয়, এই সব পুরাতন ঐশী প্রেমের গীত—যাহা রবীন্দ্রনাথের নিভৃত মন্দিরে গুপ্ত ছিল, তাহা পুনর্বার রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্তবৃন্দের দ্বারা সাধারণে প্রচার করা উচিত। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সঙ্গীতের কিছুমাত্র মর্যাদাহানির সম্ভাবনা নাই বরং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিরাটত্ব প্রবলভাবে পরিস্ফুট হইবে।

রবীন্দ্রনাথের গীত—"expression of an idea," সেই idea, কথা ও সুরের অপূর্ব মাধুর্য ও সমন্বয়ের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া আমাদের অভিভূত করিয়া ফেলে। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সঙ্গীতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভাবযোজনা বিভিন্ন সুরের দ্বারা বিভিন্ন ভাবের উদ্বোধন বিভিন্ন সঙ্গীতে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে বৈচিত্র্যের ঝলমল করিতেছে।

বর্তমান বাংলা সঙ্গীত বলিতে যেমনি তাহাই যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বুঝায় এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলা-সঙ্গীতে এখন রবীন্দ্রনাথের সুরই চলিতেছে বলিতে হইবে। ইহা যাহাতে রবীন্দ্রনাথের সুর ও কথা অনুকরণ করিয়া আধুনিক সঙ্গীতরচয়িতার গান অবলম্বন হইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, আধুনিক রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটা "Universality of appeal" আছে—যাহা অন্য সুরকারের মধ্যে দুই চারিজনের এমন ব্যাপকভাবে লক্ষিত হয় না। দার্শনিক Schopenhauer লিখিয়াছেন, "Music does not express particular and definite joys, sorrow, pain or, horror itself, the real, inner nature of emotion's. It is the essential character of these emotion's, that is represented without disturbing the accessories. Music expresses only the quintessence of life, and its events, never the events themselves. The inner meaning of life, the eternal truth of things, is felt and understood immediately when we listen to Great Music.

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সেই "Great Music." রবীন্দ্রনাথ নিজে আমায় বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমার কবি উপাধি যা' বলো বলতে পারো কিন্তু গানেই আমি বড়"—কবির সমালোচনার বিশেষ মূল্য না দিলেও এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কবি গানেও বড়।

রবীন্দ্র-সাহিত্য অপেক্ষা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্থান বেশ উচ্চে—রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের স্থান তো উচ্চে—সঙ্গীতবিশারদের মতে—

"পূর্বং চতুর্ণাং তোলায়াং সাধয়ন্তুষা পঞ্চমঃ।
ইহং তু পঞ্চমং তোলং সঙ্গীতাধ্বনকরম্॥"

"গানেই আমি বড়" রবীন্দ্রনাথ।

যেরূপ সঙ্গীত সেইরূপ চিত্রকাব্য, কবিতা বা সাহিত্য বা সঙ্গীত ইত্যাদি সুকুমার কলার সার একত্রিত করিয়া "অভিনয় কলা" উদ্ভূত হইয়াছে—সেই কারণে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয়েরও আলোচনা যুক্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, শ্রেষ্ঠ চিত্রকর, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সর্বোপরি তিনি যে শ্রেষ্ঠ সুরকার বা Composer এই কথা যিনি উপলব্ধি করেন না তিনি যদি রবীন্দ্র-নাথকে বুঝিতে পারিবেন না—"দীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" এর প্রকৃত পরিচয় পাইবেন না—সুরকার বা composer রবীন্দ্রনাথই বটে। Schopenhauer লিখিয়াছেন "The Composer reveals the inner nature

of the world, and expresses the deepest wisdom in a language which his reason does not understand. In the same way, a person under the influence of mesmerism tells things of which he has no conception, when he wakes. In the Composer, more than in any other Artist, the man is entirely separate and distinct from the Artist"

সুরকার রবীন্দ্রনাথকে বিচার করিতে অগ্রসর হইলে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দার্শনিকের উপরোক্ত উক্তি বিস্মৃত হই, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

কবির পুরাতন প্রেমের গীতাবলী তাঁহার আধুনিক গীতের ন্যায় যাহাতে বহুল প্রচারিত হয় সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া কর্তব্য।

"রবীন্দ্রনাথের প্রেম গীতাবলী সঙ্গীতের দিক হইতে বিশেষ ঐশ্বর্যবান্, ও তাহা যে বিশ্বাস বেহাগী বা এপদীয় অঙ্গে কি মধুর ভাবে গীত হইতে পারে তাহা সুরের সাহায্যে চিত্তাকর্ষক ভাবে আমি পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম যাত্র।

নবযুগের আদর্শ

শ্রীজনরঞ্জন রায়

এখানে নবযুগ বলিতে আমরা যুগ বুঝিতে হইবে। সাহিত্যের সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের কথাই আমাদের আলোচ্য।

যুগ বলিতে আমরা সেই সময়কেই বুঝিব, যখন কোন নূতন আদর্শ আমাদের কাছে আসিয়াছে। অবশ্য হিন্দু-ভারতের মধ্যেই আমাদের চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ থাকিবে।

এইভাবে বৌদ্ধযুগকে প্রথম বৈপ্লবিক যুগ বলিতে চাই। কারণ, হিন্দুর শ্রাদ্ধ সব বিধি-বিধান, পুরাণ-উপপুরাণ এই যুগের আদর্শকে প্রতিরোধ করিবার বিষয়ক।

বৌদ্ধ আদর্শ বলিতে বুঝি আকুমার ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সাধনা (celebacy)।

হিন্দু আদর্শ তাহা নয়। হিন্দু আদর্শ গৃহী হইয়া ধর্ম সাধনা।

বৌদ্ধ আদর্শে পরিচালিত হইয়া রাজপুত্রগণও সংসারধর্মে অনাস্থা দেখাইতে লাগিলেন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সাধনরত হইলেন। সমাজ ধ্বংস হইয়া যায়। হিন্দুসমাজপতি প্রমাদ গণিলেন।

—ইহাই বৌদ্ধযুগ।

বুদ্ধদেব কবে জন্মিয়াছিলেন তাহার ঠিক নাই। নানা পণ্ডিতে নানা কথা বলেন। একমতে তিনি ৬৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মিয়াছিলেন। আমরা সেই মতটিই আপাততঃ গ্রহণ করিতেছি।

তাঁহার বহুকাল পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। আমরা জানিতে পারিয়াছি, রাজা দশরথের কাল ২১৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং শ্রীরামচন্দ্রের কাল ২১২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (পুরাণ প্রবেশ-১১৩-১৪ পৃষ্ঠা)। কিন্তু বৌদ্ধযুগের পূর্বে রামচন্দ্রের কোন আখ্যান হিন্দুদের দ্বারা রচিত হয় নাই। রামচন্দ্রের জন্মের আট হাজার বৎসর পূর্বে রামায়ণ রচিত হয়—এই কাহিনী তারসহ নয়,বৌদ্ধদের পুস্তকে রামচন্দ্রের যে আখ্যান আছে তাহাই প্রাচীন। তাহাই বাল্মীকির প্রধান উপজীব্য ছিল। উহার নাম 'দশরথ-জাতক' (১)। ইহাই বিশেষজ্ঞগণের ধারণা।

জাতক অর্থে বুদ্ধদেবের জন্মজন্মান্তরের কাহিনী। দশরথ-জাতকে আছে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, তিনি পূর্ব

(১) দশরথ-জাতকের উপাখ্যান বাল্মীকি প্রয়োজনমত পরিবর্তন করেন, বিশেষতঃ রাম ও সীতার সম্পর্ক। উপাদান স্বরূপ বাল্মীকি রামায়ণ, দশরথজাতক, মহাভারত ও জৈন রামায়ণও গ্রহণ করেন (—The Bengali Ramayanas by Dr. Dinesh Chandra Sen.)

একজনে রামচন্দ্র ছিলেন। বৌদ্ধ 'দশাবতার স্তোত্র' স্তবকে বলা হইয়াছে—রাবণ বুদ্ধদেবের শিষ্য ছিলেন।

বিশেষজ্ঞগণের ইহাও ধারণা যে, বাল্মীকি তাঁহার মহাকাব্য রচনা করেন খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে। সুতরাং বুদ্ধদেবের জন্মের চারিশত বর্ষ পরে।

বাল্মীকি রামচরিত্র বর্ণনা-প্রসঙ্গে সমাজে বৌদ্ধভাব-ধারাকে প্রতিরোধ করিলেন, জৈন ও বৌদ্ধদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন-প্রচেষ্টাকে বাধা দিলেন, উপনিষদের ঋষিগণ-অনুসৃত গার্হস্থ্য আশ্রমের শিক্ষা ধার্মিক-জীবন যাপনের প্রধান উপাদান বলিয়া বর্ণনা করিলেন। বাল্মীকির ভাবধারা হইল—পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, অর্থাৎ লোকপতি পিতাকে মানিয়া চলা সন্তানের প্রধান ধর্ম। পিতার অভাবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা-সম পিতা, ভ্রাতৃগণের ইহাই ধর্ম। স্ত্রীর ধর্ম স্বামীর একান্ত অনুবর্তিতা এবং ভৃত্যের কর্তব্য প্রভু-আজ্ঞা অকুণ্ঠচিত্তে প্রতিপালন।—রামায়ণের প্রধান চরিত্রগুলি দ্বারা গার্হস্থ্যজীবনের এই সাতটি কর্তব্য বাল্মীকি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

বাল্মীকি লঙ্কাকাণ্ডের শেষে লিখিয়াছেন—রামচন্দ্রের রাজত্বকালে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হয় নাই, লোকের দশ হাজার। বৎসর করিয়া পরমায়ু ছিল, পৃথিবী নীরোগ ছিল, সর্পাদি কোন সরীসৃপ ছিল না, চোর ছিল না, অকালমৃত্যু ছিল না, কেহ কাহারও হিংসা করিত না, বৃষ্টির প্রাচুর্য থাকায় ফল-ফুলে পৃথিবী পরিপূর্ণ ছিল, প্রজাবর্গ সুখসাগরে মগ্ন ছিল। আরও বলা হইয়াছে—রামরাজত্বকাল দশ হাজার বৎসর।

বাপর যুগেও রাষ্ট্রে ও সমাজে আমরা রামায়ণের আদর্শেরই প্রতিফলন দেখিতে পাই। দ্বাপর যুগের গৃহ-যুদ্ধের মধ্যেও রামায়ণের গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তার পর ভারতের দীর্ঘকাল দাসত্বের ইতিহাসে ছোট-খাটো যে-সব যুগ আসিয়াছে, সে-সব আজ আর তেমন ভাবে চোখে পড়িতেছে না, যেমন গান্ধীযুগ চোখে পড়িতেছে।

গান্ধীজী সেই 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম'কেই ভগবান-রূপে গ্রহণ করিলেন, সেই পতিতপাবন সীতা-রামকে পূজা করিয়া তিনি গার্হস্থ্য ধর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করিলেন (২)।

গার্হস্থ্য-নীতির দিক দিয়া গান্ধীজীর ইহাই শেষ কথা।

আমরা দেখিতে পাই, রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়া গান্ধীজী রামায়ণের আদর্শকে স্বীকার করেন নাই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিকেও তিনি গ্রহণ করেন নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের প্রতিও আত্মবৎ ভালবাসাকে তিনি সত্যদৃষ্টি বলিয়াছেন, এই সত্যপ্রীতিই তাঁহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে আকৃষ্ট করিয়াছে—তাহাও জানাইয়াছেন :

"I see the universal and all-pervading spirit-of-truth face to face, one must be able to love the meanest of creation as oneself. And a man to aspire after that cannot afford to keep out of any field of life. That is why my devotion to truth has drawn me into the field of politics. Those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means"—M. K. Gandhi.

ইহা অহিংসাবাদ। রাজনীতিক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ অহিংসা-

(২) গান্ধীজীর 'রামধুন' স্তবে হিন্দুর দেবতা ও মুসলমানের দেবতা এক এবং অভিন্ন বলা হইয়াছে। তিনি নিজেই ইহার যুক্তি দিয়াছেন। বলিয়াছেন—যাহাদের সত্যই ধর্মজ্ঞান আছে, তাহাদের নিকট এক ধর্ম অন্য ধর্ম হইতে বিভিন্ন নয়···সহনশীলতার সঙ্গে অন্যের ধর্মকথা আলোচনার অভ্যাস করিলে নিজের ধর্মের মর্মকথা ভালভাবে বুঝিতে সমর্থ হইবে। ("True knowledge of religion breaks down the barriers between faith and faith. Cultivation of tolerance for other faiths will impart to us a true understanding of our own" —Mahatma Gandhi)।

যার গান্ধীনীতি ( )। ইহা কপিল ও বৌদ্ধনীতির পুনঃ প্রবর্তন (৪)।

শঠের সহিত শঠতা, বস্তুতপক্ষে প্রকৃতি রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীকৃষ্ণের যে নীতি ছিল, তাহা গান্ধীজীর বিশ্বপ্রেম নয়। ভালবাসার দ্বারা শত্রুর হৃদয় জয় করিবার নীতি তাহাদের দুই ভগবানের নির্দিষ্ট নয়। গান্ধীজীর জীবনে ও বাণীতে কিন্তু আমরা এই নীতির স্পষ্ট নির্দেশ পাইলাম। ভগবৎ আদিষ্ট হইয়া তিনি এই নীতির পুনঃ প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছেন। মিথ্যা ও কৌটিল্য আর রাজনীতির প্রতিপক্ষ থাকিবে না, গান্ধীজী সেখানে সত্য ও সততাকে স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। রাজনীতির ইতিহাসে পথ-পরিবর্তন এক সময়ে বৌদ্ধযুগে যেমন একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল, এখন তাহা আবার একান্ত আবশ্যক—হয়তো তিনি ইহাও মনে করিয়া থাকিবেন। অবশ্য এই বিশ্বপ্রেম ও অহিংসা মানুষের মনে ক্লৈব্য আনিতে পারে, ইহাও কি তিনি ভাবেন নাই? আমরা অনুমান করি, তিনি ভাবিয়াছিলেন। বিশ্ব আবেষ্টন ও যুদ্ধবিগ্রহ জগতে শান্তি আনিতে পারে না, দুইটি মহাযুদ্ধের এই অভিজ্ঞতা তাঁহার মনে এই বিশ্বপ্রেমের আদর্শকে প্রধান করিয়া গ্রহণ প্রবৃত্তি দিয়াছিল—ইহা ধারণা করা ভুল হইবে কি? যদিও আমরা জানি, রামরাজত্ব স্থাপী হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস স্বপ্নে পর্যবসিত হইয়াছিল। তথাপি আদর্শকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত—গান্ধীজীও তাহাই বলিয়াছেন। গান্ধীজী আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে গেলে তাঁহার আদর্শে শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে:

"The only way to cause rejoicing to the soul of the departed one is to fulfil his most cherished dream in which the spirit of the departed, that is ever present with us, definitely gives strength to the living, and only when they fulfil the dream of the departed then and then only the soul of the departed rejoice"—Gandhiji's letter to Dr. Pravy and Miss. Pravy.

গান্ধীজীকে এক সময় জিজ্ঞাসা করা হয় যে, (ভারতের) এই (হিন্দু-মুসলমান) সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ প্রতিরোধে আপনার অস্ত্র কি?

'What weapon do you use Bapuji to fight communalism?

গান্ধীজী উত্তরে বলিয়াছিলেন—'ভালবাসা আমার একমাত্র অস্ত্র ও ভগবান একমাত্র সহায়।'

"Love is my only weapon, God is my only guide"—(as told to Sri Subrata Roychoudhury).

জগতে সকল যুদ্ধের কারণে একটা ভুল জিনিসের প্রতি অন্ধতা। কোথাও তাহা স্বার্থান্ধতা, কোথাও ধর্মান্ধতা। এই অন্ধতাবশে মানুষ আত্মরক্ষা করে, যে মিথ্যা সত্য নয়, সত্য গোপন করে। ভারতের মানুষের মূলেও আছে এই বিদ্বেষ ও মিথ্যাশ্রয়। সকল যুদ্ধের মূলেই এই আত্ম-রক্ষা ও মিথ্যাশ্রয় আছে। ইহাতে মানুষ যেমন নিজের ঘর ভাঙে, তেমনি রাষ্ট্রের শান্তি নষ্ট করে। মহৎ যুদ্ধ বাধে এই কারণেই। জগতে কোন অশান্তি থাকিবে না যদি বিশ্বপ্রেম আমাদের আদর্শ হয়।

রাজনীতিক্ষেত্রে এই বিশ্বপ্রেমকেই গান্ধীজী প্রথম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তাঁহার এই আদর্শপ্রচার অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। জগতে (বিশেষতঃ ভারতে) হিংসার উলঙ্গ নৃত্যের মধ্যে তিনি তাঁর শান্তিবাণী···মঙ্গলকর বাণী প্রচার করেন। প্রকৃতির কথা মানুষও ভাবে, রাষ্ট্রও ভাবে। তবে উত্তেজনা প্রশমিত হইলে ভাবে। গান্ধীজী কিন্তু দারুণ উত্তেজনার মুখেই ইহা ভাবিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন দ্বিতীয়···সত্যদ্রষ্টা।

গান্ধীজীর আদর্শই নবযুগের আদর্শ।

---

(৩) শতাধিক বর্ষ পূর্বে ভারতের অন্যতম আদিবিদ্বান্ রাজা রামমোহন রায় ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়া গিয়াছেন যে, রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসার ভুল ধারণা ভারতের দাসত্বের মূল কারণ।

(৪) অনেকে মনে করেন, কপিল ধর্মশাস্ত্র ও বৌদ্ধশাস্ত্র একই বস্তু, কপিলের উপদেশই বৌদ্ধশাস্ত্রে অনুদিত হইয়াছে, কারণ 'জীবে দয়া'—ইহা কপিলের দ্বারা বৌদ্ধ-যুগের পূর্বে উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

কয়েক মাস পরের কথা। চৈত্র মাস, তামাদির সময় আসিয়াছে, সুতরাং দিনরাত কাছারীতে বড় ভিড়।

এখানকার জমিদার ডগলাস্ সাহেব। যিনি এখনকার মালিক তিনি পাক্কা সাহেব, এ-সব জমিদারী তাঁহার পোষায় না—তিনি থাকেন দেশ-বিদেশে; সুতরাং বর্ষি পড়ে কর্ম্মচারীদের উপরেই।

গোটা বছরে জমিদারকে খাজনা-পাতি দিবার কোন তাড় থাকে না চাষী প্রজাদের। সাতের খাজনার পুরো কাছারী হইতে তাগিদ পড়িতে থাকে পৌষ-মুষার মাঝখানে, সেই জন্যই এই ভিড়।

ক'দিন ধরিয়া রোজ সন্ধ্যার পর জয়নাল কাছারীতে আসিয়া এক কোণায় ছোট এক টুকরা তক্তা টানিয়া বসিয়া থাকে; আর বিভিন্ন কয়েলাপদেশে যাহারা কাছারীতে আনাগোনা করে—তাহাদিগকে এক-আধ ছিলিম তামাক সাজাইয়া দেয়। দু' একবার পাল মহাশয়ের হুঁকাটার উপরেও কলি দাগিয়া দিয়াছে।

কিন্তু এত ব্যস্ততার ভিতরে পাল মহাশয়ও কোন কথা বলিতে পারেন নাই, জয়নালও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস পায় নাই।

সেদিন ভিড়টা একটু কম। জয়নাল পাল মহাশয়ের চৌকির পায়াটার নিকটে আগাইয়া গাঁট হইয়া বসিয়া রহিল। লোকজন সব চলিয়া গেলে হাত পাখাটা কয়েকবার সর্ব্বাঙ্গে নাড়াচাড়া করিয়া পাল মহাশয় তাহার ঝড়ান চশমাজোড়া ঝুকিত কপালের উপরে তুলিয়া বলিলেন,—কি রে জয়নাল, খবর কি?

মনুষ্যস্পর্শে কুঞ্চিত কেঁচোর মতন জড়সড় হইয়া জয়নাল বলে,—আইজ্ঞে আছি ভাল, আপনি একবার চরণ-দর্শনে।

—তা ত এই ক'দিন ধরেই আসিস্।

—হয় কত্তা। বলিয়া জয়নাল ঘাড় নোয়ায়।

—তা ভিটেটাকে ত ক'রে নিয়েছিস্ বেশ, খেটেছিস খুব।

—এখনেন আর কি নিজে? পরিহাসে তাকায় জয়নাল।

—যেছিলাম ত তোদের ওদিকে এই বুধবারে।

—একটু চরণধূলা দিতেন যদি—। আরও কুঞ্চিত হয় জয়নাল।

—তোকে ত ডাকলুম, তুই বাড়ী ছিলি না।

—আইজ্ঞে গেছিলাম বোদ করি কামে।

—তাই হবে। তা নতুন বাড়ী-ঘর ক'রেছিস্ মন্দ না।

—আল্লার দোয়া—। বলিয়া জয়নাল আগাইয়া আসিয়া চৌকির উপরেই রাখে একটা আরাম। আরাম একটু সরিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে—আল্লার কুদরতে যদি পত্তরে বল থাকে তবে ঐ বাড়ীর চারপাশেই সোনা ফলাব কত্তা।

—তা তুই পারবি।

উৎসাহিত হইয়া জয়নাল বলে,—একটা নালিশ করতাম কত্তা।

এইসব চাষীদের মুখে নালিশ কথাটির একটা

আবেদনমূলক বিশিষ্ট অর্থ আছে। পাল মহাশয় বলিলেন, —কি বলিস?

—এই কিছু না কত্তা—বলছিলাম কি—বার বার ঢোক গিলিতে থাকে জয়নাল।

—কি বলছিলি বল না।

—বলছিলাম, বাপী জমি কাল যেখানা ছিল, সে ত নদীতে নিল।

—তার আর কি করতে পারি।

—না, নদীর সঙ্গে আমরা আর কি করব। বলছিলাম আট-দশ কাঠি ধান হয় এমন যদি একটু টুকরা-টাকরা জমি—

—সে আর কোথায় পাবি?

—না, পাব আর কোথায়,—সেই কথাই বলছিলাম কত্তা।

মনোভাবটা বুঝিতে পাল মহাশয়ের দেরী হইল না। চুপ করিয়া তিনি চিন্তা করেন। জয়নালের মনে আশার আলো দেখা দেয়।

পাল মহাশয় বলিলেন,—না, তেমন টুকরা-টাকরা জমি ত দেখতে পাচ্ছি না কোথাও।

—হুজুরের দোয়া কত্তা, আমরা কি কইতে পারি। এই কোন রকমে ৫'টা মোটাভাতের যোগাড় আর কি।

—জমি থাকলে ত তোকে দেব।

—তাবেন ভেবে চিন্তে। বলিয়াই হুঁকা হইতে কল্কি নামাইয়া মাটিতে টাকি দিয়া পরিষ্কার করে জয়নাল, তারপরে নূতন করিয়া তামাক সাজিয়া হুঁকাটা আগাইয়া ধরে পাল মহাশয়ের কাছে।

হাতের কলমটা ঠোঁটে লাগাইয়া আবার চিন্তা করিতেছিলেন পাল মহাশয়। পাল মহাশয়কে চিন্তা করিতে দেখিলেই পরম উৎসাহিত হইয়া পড়ে জয়নাল। ভাবে, নিশ্চয়ই কিছু ফল ফলিবে। অন্যমনস্কভাবে হুঁকাটা হাতে লইয়া মৃদু মৃদু টানিতে লাগিলেন পাল মহাশয়। পরে বলিলেন,—তা দেখ, এক কাজ করতে পারবি?

—ক'ন কত্তা, পারব না ক্যান?

—তুই ত হুজুরদিয়াড়ই লোক, কালু সর্দারের বাড়ীটা চিনিস্?

—কি যে বলেন কত্তা,—গাঁয়ের মধ্যেয় বাড়ী চিনব না?

—তুই ত ওখানে নোতুন এসেছিস্, তাই বলি।

—তা ত ঠিক—তা ত ঠিক—। সব দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিতে চেষ্টা করে জয়নাল।

—তার বাড়ীর ঠিক সামনে দীঘির পাড়ের লাগ পুবে একখানা খোপাবাড়ী ছিল জানিস্?

—শুনলাম সে কথা মেজাদের মুখে।

—সে খোপা বাড়ী ছেড়ে গেছে আজ এক বছর। ও বাড়ী নতুন পত্তনি দেই নি।—বলিয়াই দেশলাই বাক্স হইতে একটা কাটি বাহির করিয়া দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে মুখ হাঁ করিয়া পাল মহাশয় কি ভাবিতে লাগিলেন। আগ্রহে জয়নালের মুখও হাঁ হইয়া যায় অজ্ঞাতে।

পাল মহাশয় বলিলেন—ভাবছিলাম কি,—ও বাড়ীটাতে বড় গাছ-পালা তেমন নেই কিছু, মাটিটাও বেশ ভাল, ক'বে একটা চাষ দিয়ে মাঝখানের ভিটাটা যদি ভেঙে সামনের ছোট পুকুরটাকে ভরাট ক'রে তুলতে পারিস, তবে চাই কি এ-বছরেই হয় ত ফসল ফলাতে পারবি।

জয়নাল দীন হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে,—পারব কত্তা।

—পারবি ত বললি; কিন্তু মুস্কিলও যে আছে।

—কি, ক'ন।

—ঐ কালু সর্দার লোকটা মোটেই সুবিধার না। খোপাদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগেই ছিল; সেই জন্যেই ত খোপারা উঠে গেল। তুই একলা নিরীহ মানুষ, পারবি কি ওখানে গিয়ে হাল দিতে?

বাধ-বিসংবাদের সম্ভাবনায় জয়নাল একটু দমিয়া যায়। সে সত্যই নিরীহ মানুষ, এ-কথা সে নিজেও জানে। তবু সাহস করিয়া বলে,—কত্তা যদি অভয় দান ত সবই পারি।

—আচ্ছা, তা দেখা যাবে।

—কত্তা গরীবের মা-বাপ—। আগ্রহে অঞ্জনাল হাত দু'খানি বাড়াইয়া বেদ পাল মহাশয়ের পায়ের দিকে।

—থাক থাক। বলিয়া পা সরাইয়া লন পাল মহাশয়। অঞ্জনাল আর কথা বাড়াইল না। আবার পাল মহাশয়কে আধার জানায় প্রায় দু' ভাঁজ হইয়া। তার পরে এক পা দু' পা করিয়া নীরবে চলিয়া যায়।

পাল মহাশয় এ ব্যাপারে আর বিশেষ দিধা বা দেরী করিলেন না। নিজেই গরজ করিয়া ঘোপার বাড়ীটা বিনা সেলামীতে অঞ্জনালের নামে পত্তনি করিয়া দিলেন।

আয়পাটা পাইয়া অঞ্জনালের গায়ে অসুরের বল আসিল। অঞ্জনাল নদীর গ্রাস হইতে বলপ দুইটা কাড়িয়া রাখিয়াছে, মজুরী খাটিয়া আবার হাল যোগাড় করিয়াছে, নিজের ঘরে হাল-গোরু পাইয়া অঞ্জনালের ছাতি আবার ফুলিয়া উঠিয়াছে।

চাষের পর চাষ দিতে লাগিল অঞ্জনাল ও ময়নাল। ময়নাল এখন বাপের সহিত পাল্লা দিয়া খাটিতে শিখিয়াছে। সে লাঙ্গল ধরিয়া পাচনি হাতে মুখে টক টক শব্দ করিয়া গোরু চালায়, গোরুর গতি মন্দ হইলে লেজে মোচড় দিয়া 'হেইও' করিয়া ঠেলা দেয়।

অঞ্জনাল পাশে কোদালি লইয়া মাটির ডেলা ভাঙে—আর বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া তাকায় ময়নালের দিকে, বুক তার আনন্দে ফুলিয়া ওঠে।

চাষের পর চাষ দিয়া অঞ্জনাল সত্যই তিটাখানিকে লাল-জমির সামিল করিয়া ফেলিয়াছে। সব লইয়া প্রায় একবিঘা জমি। বেয়েটার জন্ত মন কাঁদে, নইলে এ যেন তার শালে বর।

কালু সর্দারের এই তিটাটার প্রতি কোন লোভ ছিল না; কারণ জমা-জমি চাষ-আবাদ সম্বন্ধে একটা আগ্রহ তাহার কোন দিনই নাই। ঘোপাদের সহিত তাহার নিরন্তর ঠোকাঠুকির কারণ ছিল ভিন্ন।

সারা জীবন সর্দারি করিয়া কালুর একটা সর্দারি মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। কেঁচোর মতন যে তাহার সম্মুখে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত তাহার সঙ্গে কালুর কোন ঝগড়া-বিবাদ নাই; কিন্তু ঘোপাদের মেজাজ ছিল অন্ত রকম, ঝগড়া-কাঁটির প্রত্যক্ষ কারণ যাহাই থাক, ইহাই ছিল আসল কারণ।

একটা সময় ছিল—বেশী দিনও নয়, দশ-পনর বছর আগের কথা—দুতুরদিয়া বা আশপাশের পাঁচ গ্রামে কালু সর্দারকে এক-ডাকে না চিনিত এবং তাহার নামে একটা ভীতি অনুভব না করিত এমন লোক খুব কম ছিল। তখন পর্য্যন্ত জমিদার-তালুকদারগণের ও-সব তল্লাটে প্রবল প্রতাপ। বিষয়-সম্পত্তি, পথ-ঘাট এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি লইয়া পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়াই ছিল। পূর্ব্বকালের রাজ রাজড়াগণ যেমন রাজ্য দখল করিবার জন্যই নহে—স্বীয় ঐশ্বর্য্য এবং মহিমা প্রতিষ্ঠা-কল্পেই দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, এই জমিদার-তালুকদার-গণও বিষয়-সম্পত্তি বা অন্যান্য ব্যাপারের লাভ-লোকসানের জন্য নহে—দাঙ্গাহাঙ্গামের ভিতরে একটা প্রতাপান্বিত প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এই সকল ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হইত।

এই সকল মারামারিতে ডাক পড়িত সর্দারগণের। এই মারামারিতে যাহারা সর্দারি করিত তাহারা যে শুধু কপড়ালিপ্ত দুই পক্ষ হইতেই প্রচুর অর্থ লাভ করিত তাহা নহে, তাহাদের বীরত্বের অনুরূপ সমাজে তাহাদের বিশেষ একটা মর্য্যাদাও ছিল এবং এই দ্বিতীয় লাভটির প্রতিই ইহাদের লোভ ছিল সমধিক।

কালু সর্দার তাহার প্রথম জীবনে বহুবার বীরত্বের এই মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। সাড়ে তিন হাতের উপরেও পুরা পাঁচ আঙুল লম্বা ছিল কালুর বলবুক ঢেঁকা দেহটি। তাহার অস্ত্র ছিল দুইটি লেজা এবং ছ'পল্লা বেতের নির্ম্মিত বিরাট একটি ঢাল। লেজা দুইটির ফলা ছিল পুরা এক হাত লম্বা—আর বাঁশের ডাঁট ছিল প্রায় আট হাত। মারামারির সময় হাঁটু ভাঙিয়া কালু ঢালটি উর্দ্ধমুখে আড়ুর সহিত বাঁধিয়া লইত, তার পরে দুই হাতে লেজা চালাইয়া যখন অগ্রসর হইত তখন দুই পার্শ্ব হইতে প্রতিপক্ষ পলাইবারও সময় পাইত না; ইহার মধ্যেই দুই একটিকে লেজায় গাঁথিয়া সে বীরোচিত

উল্লাসে রক্তবর্ণ গোল চক্ষু দুইটিকে ঊর্ধ্বে স্থাপিত করিয়া উন্মত্তের মতন গর্জ্জন করিতে থাকিত। কেহ যদি বলিয়া তাহা রক্ত আসিয়া ভরিয়া যাইত তাহার হাত, চোখ-মুখ।

কিন্তু এখন আর কালু সর্দ্দারের সে দিন নাই—প্রৌঢ় মনে সে আদিম হিংস্র উন্মাদনা নাই। থাকিবার ভিতরে আছে শুধু মাথার উপরে সেই কোঁকড়ান বাবরিটি—যৌবনের স্মৃতির মতন। সেদিন সে চুল ছিল ঘন কৃষ্ণ—আজ স্মৃতির স্পর্শে রূপালি হইয়া উঠিয়াছে।

আট-দশ বছর হইল সর্দ্দারগিরি কালু একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। টাকা-পয়সা সে কিছুই জমাইতে পারে নাই। তাহার মুখ্য কারণ, এ-অঞ্চলের বাসিন্দাদের রক্তের ভিতরে বিধাতাপুরুষ কেমন একটা সঞ্চয়-বিরোধী প্রবণতা দান করেন। কালের জন্য তাহারা কোন ছেদ রাখিতে ইহাদের ভিতরে সঞ্চয়ের লক্ষ্য করা যায় না। অতএব কালু সর্দ্দার যেদিন সর্দ্দারী ছাড়িয়া দিল, সেই দিনই তাহার উনানে হাঁড়ী চড়ান সমস্যা হইয়া উঠিল।

জমা-জমি কিছুই নাই—তাহে চাষবাসের অভ্যাসও নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া কালু সামান্য ব্যবসায়ে মন দিয়াছে।

পুকুরপাড়ে কলাগাছে কিছু কলা হয়, তাহা লইয়া মাঝে মাঝে যায় বাবুগঞ্জের বন্দরে; সেখান হইতে আবার তামাক, চিটা, পিঁয়াজ-রসুন কিনিয়া আনিয়া ব্যবসা করে—পরিবল, আগরপুর ও ঝাপুরঘাটের হাটে বাজারে। বাড়ীতে লোক অল্প; এক স্ত্রী ও এক মেয়ে বাহু; সুতরাং যৎসামান্য আয়েই একরূপ দিন চলিয়া যায়।

এই ব্যবসায়ের কাজে কালু সর্দ্দারের এক সহায় জুটিয়াছে ওপাড়ার নৈমদ্দি। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অতি কম—অথচ দিনরাত গাধার মতন খাটিতে পারে। নৈমদ্দির এই দুইটা গুণই তাহাকে কালু সর্দ্দারের নিকট প্রিয় হইতে প্রিয়তর করিয়া তুলিতেছিল।

জয়নাল কালু সর্দ্দারের কথা জানিতে পারিয়া প্রথম হইতেই সাবধান হইয়াছে—সে প্রথম হইতেই কালু সর্দ্দারের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল,—যেন কালুই জমির মালিক—সে তাহার ভিটাবাড়ির প্রজা। প্রথমে কালুসর্দ্দার এই বাড়িটা পত্তনের সংবাদ পাইয়া অতিমাত্রায় রুষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন জয়নালের বশ্যতার দ্বারা তাহার তপ্ত মেজাজ অনেক নরম হইয়া গিয়াছে। জয়নালকে ডাকিয়া অযাচিত উপদেশও সে দু'একবার দিয়াছে, জয়নালও তাহা নত মস্তকেই গ্রহণ করিয়াছে।

এমনি করিয়া দিন যায়—মাস যায়—সুখে দুঃখে গড়াইয়া যায় পাঁচটা বছর। জয়নাল এতদিনে আবার চাষবাস করিয়া স্থিতি লাভ করিয়াছে।

শ্রাবণের শেষ। আউধান পাকিয়া উঠিয়াছে। জল থৈ থৈ মাঠে মাঠে পড়িয়াছে কৃষককুলের হর্ষের সাড়া। দু'একখানি জমির ধান কাটা হইয়া গিয়াছে, অন্যান্য জমির চাষীরাও নৌকায় করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজেদের নিজেদের জমি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। কেহ কাল সকালেই ধানকাটা সুরু করিবে, কেহ দু'দিন পরে। চারিদিকে ছিপ নৌকা ও তালের ডোঙার ছপ্, ছপ্, খস্ খস্ শব্দে মাঠ ঘাট উতলা হইয়া উঠিল।

যে-সব মাঠের ধান কাটা হইয়া গিয়াছে সে-সব মাঠে মাছ কোপাইতে কোচ হাতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে বহু চাষী। এত জলে পুকুরের বড় বড় মাছ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে মাঠে। তাহারা জলনিগম কাটাখালের ভাটগুলিতে নাড়া দিয়া স্বাধীন উল্লাসে বিহার করিতে থাকে, আর সেই ভাঁট-নড়া দেখিয়া মুহূর্ত্ত হইতে শিকারীরা ছোঁড়ে কোচ।

গলা জলে দাঁড়াইয়া চাষীরা ধান কাটে আর গান গায়। এখানে কথা সামান্য—সুরই সব—যেমন কথাহীন উল্লাস আগে পাখীর সুরে।

তাহারা হাঁড়ী ভরিয়া আনিয়াছে পান্তা—শালি পাতার মোড়ক করিয়া আনিয়াছে একটু নুন আর লঙ্কা—তাওয়া ভরিয়া আনিয়াছে ভুষের আগুন আর আনিয়াছে সুখদুঃখের সাথী হুকা-কলকি।

সকালবেলা বাড়ি হইতে বাহির হয় নৌকায় বা তালের ডোঙায়—দু'পুরে ভুষের আগুনে লঙ্কা পোড়াইয়া হাঁড়ি হইতে ভাত খায়, সন্ধ্যায় ধান লইয়া বাড়ি ফেরে।

জয়নাল আসিল ময়নালের সঙ্গে। তাহাদের নৌকা নাই, ধান কাটার জন্য তিন দিনের জন্য ভাড়া করিয়াছে। জয়নাল কাস্তে হাতে নৌকায় বসা—কস্ কস্ লগি ঠেলিয়া আসিতেছে ময়নাল।

জমির কাছে আসিয়া ময়নাল নৌকা থামাইল এবং কোন কথা না বলিয়া নৌকা হইতে কাস্তে তুলিয়া লইয়া চুপ্ করিয়া লাফাইয়া পড়িল জলে। জয়নাল একটু হাসিয়া হুঁকা-কলকি বাহির করিয়া তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল।

সোনার ধান ফলিয়াছে এবারে মাঠে। এত বড় লম্বা লম্বা ছড়া—ইয়া মোটা মোটা।

মাঠে নামিয়াই ময়নাল ধানের ছড়াগুলি বুকে চাপিয়া ধরে, অব্যক্ত আনন্দ তাহার সকল রেহমনে। রক্তে যেন আছে তার সোনার ধানের ঢেউ ধানের সঙ্গে আছে নাড়ীর টান।

জয়নাল দেখে আর স্মিত হাসে। গভীর আনন্দে চোখ তিমিত হইয়া আসে—তামাকে টান দেয় আর ভাবে এই একখানি ভুঁয়ে যাহা ধান ফলিয়াছে, আলাপ দোয়ার যদি তাহা কাটিয়া ঘরে তুলিতে পারা যায়, তবে পৌষে তা দিয়া কাটাইতে পারিবে আগামী আমনের বন্ধ পর্যন্ত। পাতির নাম স্মরণ করিয়া জয়নালও হুঁকাটা রাখিয়া কাস্তে লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে জলে।

একমুঠো ধানের ছড়া কাটিয়া জয়নাল ছড়াগুলি হাতে লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল। একটু নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—না রে ময়নাল, আজ কাটব না, চল।

—আমারও তাই মনে হয়। পাকে নাই এখনও সব ধান।

—তাই ভাল, দু'চার দিন পরে কাটব। চল। বলিয়াই বাপ-ছেলে যেমন করিয়া লাফাইয়া জলে পড়িয়াছিল তেমন করিয়াই আবার নৌকায় লাফাইয়া উঠিল। তার পরে আবার ময়নাল লগি ধরিল—খোঁচে খোঁচে ঘরে চলিয়া গেল। [ক্রমশঃ

জীবন-নাট্য

তপতী দেবী

যবে প্রথম প্রভাতে মেলিনু নয়ন,
আঁধারের কোল ছাড়ি,
বুঝিতে পারিনি, কোথা হ'তে দিনু
কোন্ পথে আজি পাড়ি।

দিবসের এই সময়ের ফাঁকে,
বুঝেছি, জেনেছি, চিনিয়াছি তাকে,
আজ মনে হয়, ছেড়ে নাহি দিব,
এত মধু ভরি ভরি॥

দ্বিপ্রহরের অলস প্রহরে হয়ত নামিবে ক্লান্তি
হয়ত ভাবিব, কোথা মধুরতা
এ সকলি ভুলভ্রান্তি।
নীরবে সন্ধ্যা ঘনায়ে আসিবে,
মন্থর পথে আঁধার নামিবে,
নিশীথে আবার যাব অজানায়,
ছিঁড়ে সব দড়াদড়ি।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের করিমচাচা

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা নাটক শাসন-কবল মুক্ত হওয়ায় সকলেই উহা পাঠ করিবার সুযোগ পাইতেছেন। যে সময়ে সিরাজদ্দৌলা প্রথম প্রকাশিত ও অভিনীত হয়, তখন বাঙ্গালীর মন ইংরাজের দিকে খুবই বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল, তাই নাটকের প্রতি কথায়, প্রতি ভাবে, প্রতি বাণীতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিত। বস্তুতঃ বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে ও পরে সিরাজদ্দৌলা নাটক অসম্ভব জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু আজ ইংরাজ এদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে, বিদ্বেষ আর আমাদিগকে নিষ্পেষিত করে না, তাই ইহার অভিনয় যতই সুসম্পাদিত হউক না কেন, উহা দর্শকগণকে আর পূর্ব্বের ন্যায় তেমন ভাবে অভিভূত করে না। তথাপি দেশভক্ত সিরাজের পরিণামে সকলেই যে মর্ম্মাহত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমনও দর্শক অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া গৃহে ফিরিতে পারেন না—ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

ঘটনা-পরম্পরায় সিরাজদ্দৌলা পূর্ব্বের ন্যায় বাঙ্গালীর প্রাণে তেমন উন্মাদনা না জাগিলেও, নাটকের সৌন্দর্য্য, ঘটনা-বিশ্লেষণ এবং চরিত্র-সৃষ্টিতে নাটকখানি বরাবর অমর হইয়া থাকিবে। অন্য চরিত্র সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিব না। কেবল নাটকের অপূর্ব্ব সৃষ্টি 'করিমচাচা' সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে চাই। এই চরিত্রটি কাল্পনিক বটে, কিন্তু যিনি সিরাজদ্দৌলার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, আর তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই উপলব্ধি করেন যে, সেই সময়কার সমুদয় ঐতিহাসিক ঘটনা ও নাটকীয় চরিত্রের গতি "করিমচাচায়" প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

বাস্তবতঃ করিমচাচা রাজবৈদ্য বা বিদূষক, কি সোজা কথায় ভাঁড়, কিন্তু অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে—"নাটকের করুণ রস, স্বদেশ-প্রেম, রাজনৈতিক বিয়োগান্ত ঘটনা এবং ঐতিহাসিক ও মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণকারী দৃষ্টি (analytical out-look) করিমচাচার কথায় ও ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।" বস্তুতঃ করিমচাচা একাধারে দার্শনিক, পণ্ডিত, স্বদেশভক্তই কেবল নহেন, ইনি জীবন্মুক্ত পুরুষ এবং দেশ-নায়কের জন্য সর্ব্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। দেশের ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলেও নাটকের ইতিহাসে ও বাঙ্গালীর জীবনে এই চরিত্রটী বরাবর শাশ্বত ও অমর হইয়া থাকিবে।

সর্ব্বোপরি করিমচাচার কথাগুলিতে মনে হয় যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও গিরিশচন্দ্র আমাদের এই জাতির ভাব চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আজও যেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিতেছে।

সম্প্রতি আমরা স্বাধীন হইয়াছি, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আজও বাঙ্গালী জাতিগঠনে মনো-নিবেশ না করিয়া, নিজের কোলেই কেবল ঝোল টানিতেছে। নতুবা কংগ্রেস সেবীদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য না থাকিলেও বার্থগত এত বৈষম্য কেন? এইরূপ চরিত্রের ইঙ্গিত করিয়াই—করিম চাচা মীরমদনকে নবাব সমীপেই মিরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে—

"কেন চাচা, উল্টো বুঝ্‌লে কেন চাচা? আমি কি বাঙ্গালী নই, এই বাঙ্গলাদেশে কি আমার জন্ম নয়? আমি কি আপনার ভাল খুঁজিনি যে, পরের ভাল খুঁজতে যাব? প্রজার ভাল হ'ল, না হ'ল আমার বয়েই গেল, বাঙ্গলায় জন্মেছি বাবা, আপনার ভালই ভাল, আপনাদের টাকা গুছিয়ে নিই, পরকালের কাজ না হোক, ইহকালের কাজটা তো হবে।"

আজ দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, চোরাই কারবারে কাপড় অন্তর্দেশে রপ্তানি হইতেছে, চাউলেরও আমদানী হইতেছে না, অথচ এদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই—করিম-চাচা তাই বলিতেছে—

"এলো মেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই—"

অন্যত্র বলিতেছে—"সব ঠিক ঠাক হ'য়ে গেল, রাজ্য সুশৃঙ্খলায় চল্‌লে আমার কি লাভ! আমার ভাল কেবল গোলটু পাকাট হ'লেই হয়।"

* সিরিল-অধ্যাপক ঐকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্তও এরূপ বলেন।

এই যে স্বাধীনতা পাইবার পরেও কেবল মন্ত্রিত্ব লইয়া মারামারি, আজ একে বদাই, কাল ওকে তাড়াই, কবিমচাচার কথায় তাহাও প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে—

"নবাবীর জন্ত সবাই ব্যস্ত, আমারও তো নবাবী প্রাণ, আমারও তো কিছু চাই।"

বাঙ্গলা দেশে এই দল, ঐ দল কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না,—কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যে বিসম্বাদ, যুগান্তর দলের মধ্যে বিবাদ, খাদি দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, —ইহাও মহাকবি সত্যই ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"জনাব, এ বাঙ্গলার তিন জনের যদি দু'মত দেখাতে পারেন, আমি নাকে খত দিয়ে আফিং খাওয়া ছেড়ে দিব। তিনজনের তিন মত। একমতে যদি বাঙ্গলার কাজ হ'তো, বঙ্গবাসী যদি একমতে চল্‌তে শিখ্‌তো, তা হ'লে জনাব, বাঙ্গলায় নাটী থাক্‌তো না, বাঙ্গলার সোনা ফল্‌তো। বাঙ্গলার বুদ্ধিও যেমন প্রখর, পাঁচও তেমন বুড়ি বুড়ি। সেই পাঁচ আজও চলেছে, যেটা কাটে সেটা থাকে।"

আজ এই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই খাদি, মহাসভা, অনুশীলন, যুগান্তর, সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া এমন একটী দল গঠিত হওয়া দরকার যাহার উদ্দেশ্য হইবে জাতিগঠন, উদ্দেশ্য থাকিবে স্বার্থ সাধন নয়, স্বার্থ বিসর্জ্জন, আর অবিরাম কার্য্য। কিন্তু এখনও বাঙ্গালী কেবল নিজ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। অমুককে তাড়াইয়া আমি উহার জায়গায় বসিব—অমুক ঐরূপ, আমি ভাল,—এই ভাব।

স্বরাজপ্রাপ্তির পরেও সেই ভাবের যে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, ইহাই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। তবে দেশে নিঃস্বার্থ লোক যে একেবারে নাই তাহা নয়। কবিমচাচা তাই বলিতেছে—

"এই রাজ-সভাসদের ছায় দুই একটা আপাছা গজায়, নইলে বঙ্গভূমিরূপ বিধাতার সাধের উদ্যানে স্বার্থকুসুম ফুটেই রয়েছে। দু-সৌরতে এ বলে আমার ভাব, ও বলে আমার ভাব। এ বাঙ্গালায় যিনি শান্তি স্থাপন ক'রবেন, তিনি বিধাতা পুরুষ।"

কিন্তু গিরিশচন্দ্র নিরাশ হন নাই, তাই তিনি সকলকে উৎসাহিত করিতেছেন "পুরোণো বাঙ্গালায় চল্‌বে না বাঙ্গলা আবার ফিরে গড়তে হবে।" আমরাও বলি আবার নূতন করিয়া বাঙ্গলা গড়িতে হইবে। বস্তুতঃ যে বাঙ্গালী যুবক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে নূতন করিয়া যুবসমাজ গঠন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যে বাঙ্গালী যুবককে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে বলিলেন "বিশ্বাস করো, তোমরা মানুষ, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করে জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম", যে বাঙ্গালী যুবক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নির্দ্দেশে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া তাঁহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, আজ তাহারাই সঙ্ঘবদ্ধ হও, উপদল বৈষম্য দূরীভূত করিয়া আবার নূতন বাঙ্গলা গঠন করিতে সক্ষম। গিরিশচন্দ্রের আশা কি সফলতা প্রাপ্ত হইবে না?

আজকাল যেমন সীমান্তে গোলমাল, হায়দ্রাবাদে গোলমাল, দেশেও গোলযোগ—কোন বিষয়ই জোর করিয়া ধরা হয় না, ভোষণ-নীতিই প্রবল, গিরিশচন্দ্রও নবাবের চক্ষুলজ্জা, দু'নৌকায় পা দেওয়া প্রভৃতি বলিয়া পরোক্ষভাবে শাসন সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছেন—

"আমাদের জনাব কেবল বিবেচনাই কচ্ছেন, আর ইংরাজ ভেতরে ভেতরে সড়পথ পাকাচ্ছে। অত বিবেচনা না ক'রে যদি হুকুম ঝাড়তেন, আর একরকম হ'য়ে যেত, সব দাঁতভাঙ্গা কেউটে সাপ গর্ত্তে সেঁধোতো।"

অন্যত্রও এই ভাবের কথাই কবিমচাচা বলিতেছে—

"নবাব যদি দুটি চোর লাগ ক'রে হুকুম ঝাড়তেন, কোর্ট উইলিয়াম উড়াও, আর কলকাতাটা অমনি আস্মানে গিয়ে একেবারে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে উঠতো। নবাব বিবেচনা কর্ত্তে কর্ত্তেই কেবল ভাবছেন, এ করি কি ও করি, এ দু'নৌকায় পা দিয়েই প্যাচে পড়েছে।"

ইংরাজ-চরিত্র যেরূপ দেখা যাইত, কবিমচাচার কথায় আজও তাহাই স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। 'উন্নমনীল' ইংরাজ সম্বন্ধেও কবিমচাচা ফরাসী মুন্সীকে ঠিকই বলিতেছে "তোমরা পারবে না—তোমরা মিটিয়ে ফেল। এক হাত গলায় আর এক হাত পায়ে দিয়ে কাজ হাঁসিল করা তোমাদের বশ নয়।"

গিরিশচন্দ্রের কবিমচাচা জীবন্ত পুরুষ। ভগবদ্ভক্ত

বলিয়াই সে বলিতেছে—"যদি সুধা-সমুদ্র পেতাম, ঝাঁপ দিতাম," সুখে দুঃখে সমান বলিয়াই বলিতেছে—"আকাশ চন্দ্রাতপ ধরণী শয়ন" আর তাতেই বা কত আনন্দ! হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পারে বলিয়াই হেসান প্রাণ দিতে অগ্রসর হইয়া নবাবকে বাঁচাইতেছে। আর তাহাও বড়ই কৌশলে। নবাবকে বলিতেছে—"নবাবী সবি নিয়ে সবলে কাড়াকাড়ি কচ্ছে, আমি চাই নবাবী পরিচ্ছদটি—তা অমনি দিচ্ছিনে, বদলাবদলি।"

নবাবকে পোষাক পরাইয়া বিদায় দিয়াও কত আনন্দ। তাই বেসেটির সম্মুখে আসিয়াই নিজেকে নবাব বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

মুহূর্তও পাইয়াও তেমনি সন্তোষপূর্ণ চিত্তেই মিরজাফরকে বলিতেছে—

"মেরে ফেলবে! একবার হাতীর উপর চড়িয়ে ঘোরাবে না, পুরোপুরি নবাবটি কর্ত্তে দাও।"

করিমচাচা নিজে একান্ত স্বদেশভক্ত বলিয়াই সে স্বদেশভক্ত নবাবের একমাত্র সুহৃদ, বিপদে সহায়, ঘোলঘোগে সদুপদেশদাতা, দুর্দ্দিনে রক্ষাকর্ত্তা। তাই ষড়যন্ত্রকারীদিগকে বলিতেছে—

"চোখ চেয়ে কাজ করো। ঘরের ভিতর ছুঁচ দিয়ে কালসাপের ঝাঁক খুঁজো না, সকলে মিলে ওদের আগে উদ্ধেদ করো।"

ইংরাজ-চরিত্র ভাল বুঝিয়াই মিরজাফর প্রভৃতিকে বলিতেছে—

"সাদা মুখ চেনো না, শেষে পস্তাবে। ভাবচো পর্দ্দানা দিবে ইংরাজ, আর নবাবী করবে তোমরা।"

আবার বলিতেছে—"কাদিনীকান্ত ইংরাজের পায়ে বুটজুতো দেখেও জুতোর মর্য্যাদা বুঝলে না—তা অনেক বাঙ্গালী তারাকেই জুতোর মর্য্যাদা ঠেকে শিখতে হবে।"

নবাব সিরাজদ্দৌলা মাতামহের মৃত্যুর পরে যে সম্পূর্ণ শোষরাইয়াছিল এবং প্রতি কার্য্যে প্রজাহিতৈষণাই ছিল তাহার প্রধান লক্ষ্য—করিমচাচার কথায় স্পষ্ট লক্ষিত হয়। তাই সে প্রতিহিংসাপরায়ণা জহরাকে বলিতেছে—

"কিন্তু চাচী, যে নবাব হোসেন কুলীকে বধ করেছিল তার তো কিছু কর্ত্তে পারে না, সে ছিল মাতাল নবাব, আর এ হচ্ছে প্রজাপালক নিরীহ নবাব।"

প্রকৃতপক্ষে ছিল বলিয়াই ঈর্ষ্যার প্রাবল্য, হোসেন কুলীর বধ প্রভৃতি সরল কথায় সিরাজচরিত্রের কলঙ্ক কালন করিতেছে। "চাচা, তোমার কি কোমল প্রাণ, তুমি চাচীর পাশে আর একজন চাচা বসিয়ে দেলাম ঠুকতে পার।" আবার বলিতেছে, "আলিফ, যে-পে পড়িয়ে অন্দরে ঢুকে মা-মাসীর কাছে গিয়ে ব'সবে নবাব বান্দা অত বরদাস্ত করতে পারলে না—সকলের তো আর তোমার মত দেলদরিয়া মেজাজ নয়।" ক্লাইভের প্রতি শেষ কথায় তাহার ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হইয়াছে—

"সাহেব বড় জবর লোক তুমি, বাঙ্গলা কি, সমস্ত ভারতবর্ষই তোমাদের।"

ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাসঘাতকতা করিমচাচার কথায় নাটকে একেবারে স্পষ্টভাবে ভাসিয়া উঠিয়াছে—

"চাচারা এখনই কেঁদে লুটোপুটি খাবে, আমাকেই তো শান্ত করতে হবে, আহা, চাচাদের চোখ যে ডবডব কচ্ছে, কালোমেঘের জল আর কোথায় থাকে।" অন্যত্র বলিতেছে—

"আগুন খাও অ্যাতরা ছাড়াবে।"

আরও বলেন "নিমকহালাল চাচা কি করবো মাটীর দোষ। বাবা লাতপুরুষের নেমক এক নিঃশ্বাসে ওগরে ফেলেছ, আর আমি তো সাতপুরুষে নেমকহারাম হয়েছি।"

বাঙ্গলার অবস্থা দেখিয়া গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলা নাটকে অন্যত্র যে বলিতেছেন—

"রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা সতত
কহে যত হিন্দুগণে,
সে চাঞ্চল্য প্রকাশিত বঙ্গভূমে যথা
নাহি হেন অন্য কোন স্থানে।
পুত্রের মমতা নাহি বঙ্গমাতা হৃদে"

তাহাতে ঠিকই মনে হয়—যেমন সিরাজদ্দৌলা, মিরজাফর, মিরবক্সি প্রভৃতি—আবার মিরজাফর প্রভৃতিও

অনবরত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর বাঙ্গলাতেও বোধ হয় বিধাতাপুরুষই শান্তি স্থাপন করিবেন।

যাহা হউক, ইংরাজ ও অ-বাঙ্গালী বণিকের প্রভাবেই যে ব্লাক-মার্কেট প্রভৃতির সৃষ্টি, করিম-চাচা উমিচাঁদকে রহস্যালাপে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন—

"চাচা, কোলকাতা থেকে পালিয়ে ইংরাজ পল্‌তায় যখন নোনা পানি খাচ্ছিল, তখন মহাজন ক'রে তো তাদের সামগ্রী বেচে বেশ লাভ করেছ। কেবল দোষ দেখলেই তো হয় না বাবা, একটু গুণও গাও। বন্দর জুগিয়ে একগুণে একশ গুণ দাম নিয়েছ। চাচা, এক টাকায় একটা চাপাকলা বেচেছ। দিনকতক ইংরাজ থাকলে—যা লুট করেছে—তার দুনো আদায় করবে ভাবনা কি?"

রাজনীতি সম্বন্ধেও করিম-চাচা মিরজাফর প্রভৃতিকে স্পষ্ট কথায় বলিতেছেন—

"বাঁকা পথ ছাড়ো, সোজা পথে চল, ইংরাজের পথেই-

থাকি করো না, সকলে মিলে ওদের আগে উচ্ছেদ করো।"

এই অপূর্ব্ব চরিত্র—একাধারে জীবন্মুক্ত পুরুষ, ভগবদ্ভক্ত, দেশ ও জাতির পরম বান্ধব—গিরিশচন্দ্র কেবল নির্জ্জীব ভাবেই সৃষ্টি করেন নাই, রঙ্গমঞ্চেও এই চরিত্রের রূপদান নিজেই করিতেন। এইরূপ চরিত্রসৃষ্টি গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্বে তিনি 'আনন্দরহো' বেতাল, অশোকের আকাশ, জনার বিদূষক, তপোবলের সদানন্দ প্রভৃতি—এই ধরণের অনেক চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু করিম-চাচা এবিষয় সব চরিত্রই অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে। সত্য বটে ফলষ্টাফ সেক্সপিয়রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (Falstaff is the summit of Shakespeare's creative genuis), কিন্তু আমাদের মনে হয়, করিম-চাচা সৃষ্টিতে ফলষ্টাফ হইতেও অধিকতর কৃতিত্ব প্রকটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোন দেশের সাহিত্যেই এইরূপ অদ্ভুত চরিত্র দৃষ্ট হয় না।

দেবীমূর্ত্তি

শ্রীঋষিভূষণ ভট্টাচার্য্য

অসুখের দুর্ব্বিষহ জ্বালাগুলি মেজে ফেলবার মানসেই মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি দিবসের শেষ আলোকের হাত ধরে,—সুদূরের অবিরাম হাতছানিতে যেতে। কিন্তু সেদিনকার সেই শনিবারের বিকেলে আমার নিজের ইচ্ছার অনুরোধ ছিল না একটুও, শুধু আমার শ্রীমতী ছাত্রীর আগ্রহই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বহুচেনা সেই কীর্ত্তনখোলার জনবহুল পাড়ে পাড়ে,—রাঙ্গামাটির পরিশ্রান্ত পথে পথে। একটুখানি বেয়ে মীনা—তৃতীয় পাঠ পড়ে, কিন্তু তৃতীয় পাঠের গণ্ডী কেটে মনটা তার ছড়িয়ে থাকে সমস্ত আকাশ-বাতাস জুড়ে,—গোটা পৃথিবীর প্রতিটি আনাচ-কানাচ ছেয়ে। দিন রাত মীনার শিশুমনের মধ্যে কত প্রশ্ন, কত কৌতূহল যে দানা পাকিয়ে থাকে, কে রাখে তার হিসাব। মাষ্টার তার সবজান্তা, কাজেই অসংকোচেই তার কাছে যে কোন

সব দেশী-বিদেশী প্রশ্নগুলিকে একসঙ্গে ঘায়েল দিতে দিতে যখন ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম, সূর্যদেব তখন পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন।

একটুখানি ঘরিশাল সহর। তবুও প্রকৃতি তার অফুরন্ত বাদুর্য্য এরই মাঝায় ঢেলে দিতে কার্পণ্য করেন নি এতটুকু। বড় বড় পাম আর ঝাউগাছগুলি বিলিতি পাহারাওলার মত চোখ পাকিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, বাতাসের সঙ্গে লড়াইয়ে শ্রান্ত হ'য়ে শোঁ-শোঁ শব্দ ক'রছিল সেগুলি—যেন রূপকথার দৈত্যের অভিযানের হুঙ্কার। তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে কংক্রীটের বেঞ্চি। ধারে সুখদা কীর্তনখোল—চওড়া নদী, তার ওপারে লাল রংয়ের একখানা মাঝারী ঘর বয়ে বেরতের পাতাবাহারের বেড়া। ওরই পেছনে দিগন্তচুম্বী ধানের ক্ষেত, সুখস্পর্শে হাওয়ার সোহাগে লুটিয়ে লুটিয়ে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে।

মরিবারের বিবেক, অভিজ্ঞতা মাঝেও একটু শান্তি ছিল মনে, ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে একটা খালি বেঞ্চির কোণ টেনে ব'সে পড়লাম। গ্রন্থিহীন ভাবনার জাল বুনে যে কতটা সময় কেটে গেল তো আজ আর মনেই নেই,—মনে আছে কেবল মীনার সেই আকস্মিক চীৎকারটা—'দেখুন মাষ্টার মশাই, খেয়া নৌকাটা যেন নীচু দিয়ে চ'লেছে।' চেয়ে দেখলাম ঢলের নীচে এখনও ঠিক যায়নি; কিন্তু ঢেউ যেন সেই রকমই। একপাল যাত্রী বুকে ঠেলে দুলে দুলে কষ্টে পরপারের পানে চ'লেছে—যাত্রা তার সফল হবে কিনা ভগবান জানেন। এপারেও আবার অধীর অটল বিরাট জনসমুদ্র-তাদের প্রত্যেকের চোখেমুখেই এ-ইঙ্গিত সুস্পষ্ট যে, মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের সহস্র বারণ উপেক্ষা করেই তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে—ধৈর্য্যের সীমা বাস্তবিকই তাদের অপরিমেয়।

কাল বৈশাখী পূর্ণিমা। বিরাট মেলা ব'সবে কমলা-পীঠে। কানা-খোঁড়া, অন্ধ-আতুর যাত্রীর দল আজই তাই অনাগত সুখ-স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে চাক বেঁধে এসে জমা হ'য়েছে এখানে। একখানি নৌকা পার হওয়া দুষ্কর; আর যদিই বা পার হওয়া যায়, তা হ'লেও পর-পারের সেই তমাকবিদ্ধ পথে চলা অসম্ভব না হ'লেও প্রায়ই তার কাছাকাছি। সারাটা মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে রাক্ষসীর বিরাট হিংস্র হাঁ হেলে ব'সে আছে, যে-কোন অসতর্ক মুহূর্তে 'পা' সেই 'হাঁ' এর কবলিত হ'তে পারে। এখনি দু'তিন ক্রোশ পেরিয়ে তবেই দেবীমন্দিরের চূড়া দেখা যায়। ভাবলাম এতগুলি লোক, কেউ বা একপায়ে ঠেঁদিয়ে, কেউ বা আত্মজনের হাত ধরে গত বছরের দুর্ভিক্ষসেবীদের দেওয়া কাঁকর-মেশানো অল্পজল সামান্য রক্তবিন্দু পথে সঞ্চিত রেখে এমন করে ছুটছে কেন? মনে আমার দুঃখ হচ্ছিল এত সব দেখে শুনে। সহর-বন্দরে এক-আধটু ব্যতিক্রম দেখা মিলেও গাঁও গ্রামে ধর্ম্মের tradition এখনও সমান চলছে এবং তারই পাশাপাশি দুঃখের স্রোত বইছে অবিরাম গতিতে,—কূলের সীমানা ছাপিয়ে দিয়ে। মনে পড়ল রোম-সম্রাট নিরোর কাহিনী—শত্রু এসে দোরের কড়া নাড়ছে, আর সম্রাট তখনও তাঁর গাইয়ে বাজিয়ে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে, মুরলীবাজনা দেখাশুনা করা তাঁর কাছে তখনও অনেক বেশী দরকারী। এ যেন জগৎকে ফাঁকি দেবারই একটা চমৎকার ব্যবস্থা। কিন্তু জগৎকে ফাঁকি দিয়ে দিয়েই না আমাদের এই চরম দুর্গতি। সমগ্র বিশ্ব যখন দুর্দ্দমনীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে ধ'রে যৌবনের দুর্গম পথে প্রান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছিল, চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল তারা আরও নতুনকে পাবার জন্য, কণ্ঠে তারা ঘোষণা ক'রছিল light on more light!" আমরা তখন পরমানন্দে আমাদের শান্তিনীড় পর্ণকুটিরে তালপাতার পুঁথি হাতে নিশ্চিন্তে বিমুচ্ছিলাম—ভেবে-ছিলাম ওরা ওদের ভুল বুঝবে; কিন্তু ভুল একদিন বুঝতে হল আমাদেরই এবং যখন বুঝলাম, তখন আর ওদের নাগাল পাওয়া গেল না। সামনের পথ তখন ফাঁকা—শুধু ওদের ঘোড়ার ক্ষুরের ধূলি উড়ছিল একটু একটু। কিন্তু পড়ে থাক ওদের কথা। যাদের দেখে আমার এত ভাবনা, তাদের মনে এর বাষ্পও নেই, তাই ঘুটো-ঘড়ায় জল ঢেলে আর লাভ কি? মীনার ব্যগ্র দৃষ্টির পানে তাকিয়ে উঠতেও ইচ্ছা হ'ল না, কারণ তা হ'লে বাড়ী গিয়ে ওর প্রশ্নের আর অন্ত থাকবে না।

দেখতে দেখতে খেয়া-নৌকাটা ওপারে লোক রেখে আবার এপারে এসে ভিড়ল, পরীক্ষা তার তখনও শেষ

হয়নি। বাঁধভাঙ্গা জনস্রোতের জনস্রোত ভেঙে প'ড়ল নৌকার ওপরে। কিন্তু একটি ছপাঙ্গী বিধবার জন্ত একটু স্থান সঙ্কুলান হ'ল না—ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে সে ফিরে এল এবং পিছু পিছু আরও কয়েক জন। তাদের ব্যথার এক টুক্‌রো যেন আমাতেও বুকে এসে বিঁধলো। মীনাও দেখলাম মাটির দিকে তাকিয়ে। জীবনে এর চেয়ে অনেক বড় বড় দুঃখের ছবিও তো চোখে প'ড়েছে—মেটে বাসন হাতে 'ফুটপাথে' অনেক অস্থি-সারকে কুঁকড়ে শুনিয়ে থাকতে দেখেছি চোখে তাদের মুহ্যমানতার বিভীষিকা দেখেছি, একমুঠো অন্নের জন্ত কেউ হাত পেতেছে, কিন্তু অন্ন তার হাতে পড়বার আগেই প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে; কিন্তু আজকের এ ঘটনার সঙ্গে যেন কারও তুলনা হয় না। ঐ বিধবাটির সর্ব্বাঙ্গে যেন কারুণ্যের একটা নিবিড় ছাপ কে এঁকে দিয়েছে, ও যেন কোন মহাশিল্পীর অক্ষয় পটে আঁকা একখানি বেদনার আলেখ্য—দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। ও যেন বিশ্বের সমস্ত Les miserablesদের প্রতিনিধি,—হতভাগ্য বিধির দরিদ্র সৃষ্টির প্রথম সূত্রপাত। ভাবলাম একবার ডেকে জিজ্ঞেস করি ওর ব্যাপার, কিন্তু মুখে তখন। আমার কথা ফুটছিলো না। দুঃখে বেদনায় আমি যেন কেমন বোবার মত হ'য়ে গেছি।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ক্রমে নেমে আসছে। আশেপাশের বেকিগুলি কখন যে সুপ্তপ্রায় হ'য়ে গেছে তা লক্ষ্য করিনি ঘুরে ইলেকট্রিক্ লাইটের দীপযাত্রা সুরু হয়েছে। ওরাও তীর্থে যাবে নাকি! তা হ'লে তো ভালই হ'ত—ঐ সব অনাথস্থাতুরদেরও পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু তারাও যেন লোক চিনেছে, ওরাও বুঝি জেনে ফেলেছে যে, গরীবকে সাহায্য ক'রে লাভ নেই।

"তোমার আর কেউ নেই?" সেই বিধবাটিকে লক্ষ্য ক'রে মীনার করুণ কণ্ঠ জেগে উঠলো।

"না বোন্, এ পথের বেড়ীটি ছাড়া আমার আর কেউই নেই।" কোলের ছেলেটিকে উদ্দেশ ক'রে বিধবা বল্‌লে। ঠিক ক'রে ছেলেটিকে কোলে চেপে রেখে আবার বসে' পড়ল বিধবাটি, ও যেন তার অক্ষয় কবচ। মন হালকা করবার জন্ত সে বলে চলল—

"একদিন দিদি সবাই ছিল; কিন্তু অদৃষ্টে টিক্‌লো কই? তাই একজন গেল কোথায় চ'লে আর আমি নেমে পড়লাম এই পথে। দিদিমনি, বাসন-বর্ষাযার পুরানো গেরোগুলি খুলে কত লোকের দুয়ারে যে ধন্না দিয়েছি—তার আর হিসেব নেই কিছু। কোথাও পেয়েছি তীক্ষ্ণ ভিরস্কার, কেউ বা ঠেলে দিয়েছেন উপদেশের ঝুড়ি। কিন্তু হাজার প্রার্থনাতেও কোন সহৃদয় স্বামী হুঁস নি আমাকে ঝিয়ের কাজেও বহাল কর'তে, শেষকালে, অন্ন-গৃহিণী আমি, বাধ্য হয়েছি থালা হাতে নোঙরখানার দুয়ারে হাজির হ'তে।—সংসারে একলা থাকলে কোন চিন্তা ছিল না কিন্তু সাথের ঘোদর আছে, তারা যা ইচ্ছে তা করতে পারে না। তাই আমার বেঁচবার শেষ দান আমার এই চোখের ইজ্জতটুকু, এরই জন্ত আমার বেঁচে থাকা। আজও এরই জন্ত চ'লেছি মায়ের কাছে—যেমি ওঁর দয়ায় যদি একটা বিহিত করতে পারি; কত লোকের কত অসুখ-বিসুখ মা সেরে দেন, আর একে কি দেখবেন না? কিন্তু অদৃষ্টে হয় ত আর তা ঘটেও উঠবে না। এই ভিড় ঠেলে কি আর যেতে পারবো?

"নিশ্চয়ই পারবে।" আশ্বাস এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিয়ে মীনা বল্‌লে। আমি শুধু শুন্‌তেই লাগলাম। orphansএর বীণার সুর অথবা Ancient marinerএর চোখের চাহনি, কিছুইএতে ছিল না, তবু স্বপ্নাবিষ্টের মত কেন যে বসে রইলাম তা ব'লতে পারি না। ভাবি এখনই উঠবো, ওঠা আর হয় না, কে যেন পিছন থেকে টেনে রাখে—"বলে উঠো না, আরও একটু। ঠক্‌বে না কিছুতেই।"

হঠাৎ একটা চাপা কোলাহল কানে আসতেই একটু চম্‌কে উঠলাম। জন পনের বস্তামার্কা গোছের লোক আমাদেরই দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।—যেন আমাদের সঙ্গে কি একটা বোঝাপড়া ক'রতে চায় ওরা।

"এই যে এতক্ষণে পেলাম তোমাকে জোচ্চোর"—বলেই মুলকায় একব্যক্তি সেই বিধবার সামনে এসে যমের আসন করে দাঁড়াল।

"যে ঘুলে এগুনি ও শাল, বেটি, কোন সকাল থেকে গা ঢাকা দিয়ে ফিরছো। কার জিনিষে হাত দিয়েছিস

জানিস? তীর্থে চলেছেন পুণ্যি করতে, তীর্থে আর যেতে হচ্ছে না—এবারে চল হাজতে" এই বলে ভদ্রলোকটি ছোট ছেলেটির গা থেকে রঙীন কাপড়খানা টেনে নেবার জন্ত এগিয়ে এলেন। হতভাগ্য বিধবা এতক্ষণ কিছুই বুঝতে পারেনি, একসঙ্গে এতগুলো গালমন্দ খেয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু লোকটি একটু সামনে এগুতেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলতে লাগলো 'কী সব ব'লচেন বাবু যা তা? কিছু নেই ব'লে কি যা ইচ্ছে তাই করবেন আপনারা আমাদের নিয়ে? জোচ্চোর হ'তে যাবো কেন মিছেমিছি!

নাছোড়বান্দা বাবু কিন্তু তার কোন কথা শুনতেই রাজী নন, বিধবার ক্ষীণ কণ্ঠ ছাপিয়ে নিজের রাগিণী সপ্তমে চড়িয়ে সে বকে যেতে লাগলো। প্রতিবাদে রমণী শুধু বানভোলা চোখের জল ছাড়া আর কিছুই দিতে পারছিলো না—নিজের সত্যিকারের সততার প্রমাণ-স্বরূপ। নিজেকে আমি আর চেপে রাখতে পারছিলুম না। এতক্ষণে আরও দু'চারজন ভদ্রলোক এসে জুটেছিলেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্তেরা তখনও সংখ্যায় অনেক বেশী। মনে মনে বললাম, "ভগবান এ-কী শাস্তি দিচ্ছ আমায়! এ কী পরীক্ষার ভেতরে টেনে আনলে দেব!"

দেখতে না দেখতে দুর্ব্বৃত্তটা ছেলেটিকে টেনে নেবার জন্ত বিধবার হাত ধ'রে সজোরে টান মারলো! আর সঙ্গে সঙ্গে বিধবার চোখ দিয়ে যেন আগুন ফেটে পড়ল। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারেও দেখলাম, চোখে তার বিদ্যুতের জ্যোতি জ্বলছে। বজ্রকণ্ঠে সে বলে উঠল—বিধাতাপুরুষ ঠিক্ কোথাকার, এক-পা আর এগুবি তো ঘরে ফিরতে পারবি নে। এতদিন ধ'রে একটা অসহায়া অবলার ইজ্জৎ নষ্ট করবার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারোনি বলে আজকে আবার নতুন ছল ধরে এসেছো আমার অপমান করতে। ভীবনের ভয় থাকলে এখুনি দূর হ' সামনে থেকে।

বিধবার দেহের শুকনো কাঠে যেন সত্যি সত্যিই আগুন ধরে গিয়েছিল, কার সাধ্য তার সামনে যায়, তার ছেলের গায় হাত দেয়। গাছ যেমন ঝড়ের হাত থেকে নিজের ফলগুলিকে রক্ষা করবার জন্ত সমস্ত ডাল-পালা-পাতা দিয়ে সেগুলি ঢেকে রাখে, রমণীও তেমনি সমস্ত দেহ-মন দিয়ে ছেলেটিকে বুকে চেপে রুখে দাঁড়ালো, বিদ্যুতের জ্যোতিকে ধার মানিয়ে তার মেহের ও দুঃখের জ্যোতি ঠিক্‌রে বেরুল, কার সাধ্য তার সামনে যায়, কোন্ দুর্ব্বৃত্তের এমন সাহস যে তাকে স্পর্শ করে!

মনে আমার তখন কী আনন্দ খেলে গিয়েছিলো তা আমি কোনদিন প্রকাশ করতে পারবো না। জগতে সত্যের শির এখনও মিথ্যার পদতলে সম্পূর্ণ নোয়ায় নি—সত্যের মঙ্গল-দীপটী আজও মিট মিট করে জ্বলছে, মিথ্যার ঝড়ে আজও তার অস্তিত্ব লোপ পায়নি। আর সেদিনকার সেই রুদ্রাণীর দেহে যে স্বর্গীয় দীপ্তির ব্যঞ্জনা দেখেছিলাম, মরে গেলেও বুঝি তা ভুলতে পারবো না। সত্যিকারের দেব-দেবী তো কখনো চোখে পড়েনি, কিন্তু সেদিনকার সেই দেবীমূর্ত্তি আমার চোখে যেন গোলক-বৈকুণ্ঠের সমস্ত দ্বার, অবরোধহীন প্রতিটি গবাক্ষ মুহূর্ত্তের জন্ত খুলে ধরেছিল।

খেয়া এসে এপাড়ে ভিড়লে সে উঠে পড়ল, এবার কেউ তাকে বাধা দিল না—এখন সে অজেয়, অদম্য, ভয়ের পালা তার শেষ হয়ে গেছে।

দুঃখে আনন্দে মেশানো এক অভিনব অনুভূতি নিয়ে মীনাকে সাথে ক'রে বাড়ী ফিরলাম। রাত তখন আটটা।

খেলার ছলে বিজ্ঞান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৩। বেগ ও বল সংযোজনের নিয়ম

ধাক্কার ফলে যে জড়ত্বের বেগ উৎপন্ন হয় তার পরিচয় আমরা সাধারণ পর্য্যবেক্ষণ থেকেই সর্ব্বদা পেয়ে থাকি—এই কথাটাই একটু নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা পূর্ব্বের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি—যাকে বলা যায় যাদুঘোষের দৃষ্টিভঙ্গী বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এ কথাও তোমাদের অবশ্য স্মরণ আছে যে, ধাক্কাটা মুহূর্ত্তকালব্যাপী হলেও তার ফলটা (অর্থাৎ উৎপন্ন বেগটা) থেকেই যায়। এ হলো পদার্থটার জড়ত্বের নিদর্শন, যার জন্য স্থির পদার্থ যেমন আপনা থেকে চলতে পারে না, সেইরূপ চলমান পদার্থও আপনা থেকে থামতে পারে না; পরন্তু আপন বেগে, ঐ বেগের দিক বরাবর, ক্রমাগত চলতেই থাকে। এই কথাগুলি মনে রেখে আমাদেরকে এখন একটা নূতন সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে হবে।

কথাটা এই : যদি কোন পদার্থের ওপর একই সময়ে দু'দিক থেকে দুটা ধাক্কা দেওয়া যায়—ধরা যাক একটা উত্তর দিকে এবং একটা পশ্চিম দিকে—তবে ও কি ভাবে চলতে থাকবে? এ সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, উত্তর দিকে ধাক্কার ফলে ঐ পদার্থে উত্তর দিকে এবং পশ্চিম দিকে ধাক্কার ফলে পশ্চিম দিকে ওর একটা বেগ উৎপন্ন হবে এবং ধাক্কা দুটা একই সময়ে প্রযুক্ত হয়েছে বলে' বেগ দুটাও একই সময়ে উৎপন্ন হবে। এখন এ সম্পর্কে আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা এই যে, একই সময়ে পদার্থটা দু'দিকে পা বাড়াবে কি করে?—উত্তর দিকের বেগের অভিমুখে চলার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমমুখী বেগ বরাবর চলবে কি ক'রে? নিশ্চয়ই তা ও পারে না। অথচ যুগপৎ উত্তর দিকেই যে ওকে চলতে হবে তাও আমরা না মেনে পারিনে। বুঝতে হবে, ওকে চলতে হবে উত্তর ও পশ্চিমের মাঝামাঝি বিশিষ্ট একটা দিক বরাবর এবং একটা বিশিষ্ট মাত্রার বেগ নিয়ে—এমন একটা বেগ—যার ভেতর, আমাদের কল্পনা করতে হবে, দু'দিককার ঐ বেগ দুটা গলাগলি হয়ে মিশে রয়েছে। এ ব্যাপারটা যেন চিনিপাতা দইয়ের স্বাদের মত—না মিষ্টি না টক, অথচ যার ভেতর মিষ্টির স্বাদ ও টকের স্বাদ এমন ভাবে মিশে রয়েছে যে, ওদেরকে দুটা আলাদা স্বাদ বলে' ধরতে পারা যায় না। আমাদের এও মানতে হবে যে, এই মিলনকার্য্য একটা বিশিষ্ট নিয়ম মেনে, অর্থাৎ উভয় বেগের সংযোগের ফলটা ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ বজায় রেখে, সম্পন্ন হয়ে থাকে। দু'টা বিভিন্ন বেগের এই ধরণের মিলন ব্যাপারকে ইংরাজিতে বলা হয় Composition of Velocities. আমরা একে বলবো বেগের সংযোজন। সম্মিলিত বেগটাকে আমরা বলবো ফল-বেগ (Resultant Velocity) এবং যে বেগ দুটা পরস্পরে মিলিত হয়ে ফল-বেগটা উৎপন্ন করে তাদেরকে বলবো ঐ বেগের উপাঙ্গ বেগ (Component Velocities)।

এখন ফল-বেগটা ঠিক কোন্ দিকে এবং কি পরিমাণের হবে অর্থাৎ ফল-বেগের দিক ও পরিমাণ উপাঙ্গ বেগ দুটার ওপর কি ভাবে নির্ভর করবে তা আমাদের জানতে হবে। সাধারণক্ষেত্রে বেগ-সংযোজনের নিয়মটা যে কিছু জটিল আকার ধারণ করবে এ সহজেই বোঝা যায়; তবু গোটাকতক বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ নিয়ম যে আকারে উপস্থিত হবে তা সহজ বিচারবুদ্ধি থেকেই তোমরা অনায়াসে বলতে পারবে, যথা—

(১) একই দিকে অবস্থিত দু'টা বেগের ফল-বেগ ঐ দিকেই অবস্থিত হবে এবং ওর পরিমাণটা হবে ওদের যোগফলের সমান।

(২) যদি উপাঙ্গ বেগ দুটা পরস্পরের বিপরীতমুখী হয়, তবে ফলবেগটা ওদের বড়টার দিক বরাবর অবস্থিত হবে এবং পরিমাণে ওদের বিয়োগফলের সমান হবে।

(৩) যদি বিপরীতমুখী বেগ দুটা পরস্পরের সমান হয় তবে ওরা কাটাকাটি ক'রে লোপ পাবে। এরূপ ক্ষেত্রে ওদের ফলবেগ হবে শূন্য।

(৩) যদি উপাঙ্গ বেগ দুই পরস্পর সম্পর্কে হেলা-ভাবে অবস্থান করে, তবে ফলবেগটা অবস্থান করবে উভয়ের মাঝামাঝি একটা দিকে এবং বৃহত্তর বেগটার দিকে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী হেলে আর ওর পরিমাণটা হবে উপাঙ্গবেগ দুটোর যোগফলের চেয়ে ছোট এবং বিয়োগফলের চেয়ে বড়।

(৪) যদি হেলাভাবে অবস্থিত বেগ দুটো পরস্পরের সমান হয় তবে ফল-বেগটা ওদের সঙ্গে সমান সমান কোণ ক'রে ঠিক মাঝামাঝি দিক বরাবর অবস্থিত হবে।

এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সাধারণ ক্ষেত্রে ফল-বেগের দিক ও পরিমাণ নির্ভর করবে প্রথমতঃ উপাঙ্গ বেগ দুটো কতবড় তার ওপর এবং দ্বিতীয়তঃ ওরা পরস্পরের সঙ্গে কতটা কোণ করে অবস্থান করছে তার ওপর। এই নিয়ম ঠিক কি আকারের হবে তার কতকটা আভাস আমরা নিম্নোক্ত পরীক্ষা থেকে পেতে পারি :

সমতল মেজের ওপর 'চ' চিহ্নিত স্থানে একটা টাকা বা পয়সা রেখে বাঁ-হাতের তর্জনী দিয়ে ওর ওপর মেজের তল বরাবর কোন দিকে (যেমন 'চ-ট' দিকে) একটা টোকা মারো। ফলে টাকাটা ঐ দিকে ছুটে যাবে এবং খানিকটা গিয়ে—যেমন 'ট' স্থানে গিয়ে—থেমে যাবে। এখন খড়ি দিয়ে ওর গতিপথটা ('চ-ট' রেখাটা) চিহ্নিত করো। তারপর আবার ওকে 'চ' স্থানে ফিরে এসে ওর ওপর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে আগেকার মত মেজের তল বরাবর, কিন্তু ভিন্ন দিকে

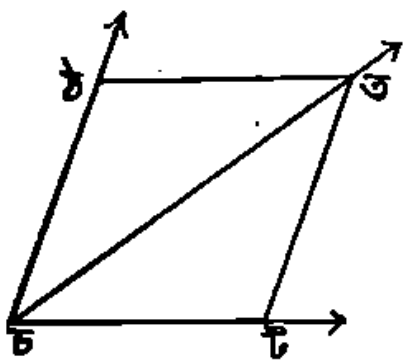

('চ-ঠ' দিকে) একটা টোকা মারো এবং এবারও ওর গতিপথটা ('চ-ঠ' রেখাটা) চিহ্নিত করো। তার পর আবার টাকাটাকে 'চ' স্থানে নিয়ে এসে আগেকার মত, কিন্তু একই সময়ে, দুটো টোকা মারো। এবারও একটা টোকা দেবে বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে 'চ-ট' দিকে। এবং অপরটা দেবে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে 'চ-ঠ' দিকে। অধিকন্তু এই টোকা দুটা যথাক্রমে আগেকার টোকা দু'টার সমান হতে হবে অন্ততঃ সে জন্য চেষ্টা করবে। এখন দেখতে পাবে যে, একসঙ্গে এই ধাক্কা দু'টা খেয়ে টাকাটা চলে গেছে 'চ-ত' রেখা বরাবর এবং রচনা করেছে 'চ-ত' পথটা। এই পথটাও খড়ি দিয়ে চিহ্নিত করো। অতঃপর 'ট' ও 'ঠ' বিন্দুকে 'ত' বিন্দুর সঙ্গে যোগ করে দাও। এখন দেখতে পাবে যে, এইরূপে যে 'চ-ট-ত-ঠ' চতুর্ভুজটা অঙ্কিত হলো তা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি সামান্তরিক ক্ষেত্র (Parallelogram)—যার দু' দিককার দু'জোড়া বাহু ('চ-ট ও ঠ-ত' এবং 'চ-ঠ' ও 'ট-ত') পরস্পরের সমান ও সমান্তরাল।

এখন বেগ-সংযোজনের নিয়মটাকে কিভাবে প্রকাশ করলে ঠিক হবে তা তোমাদের দেখতে হবে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ জন্য তোমাদের পক্ষে জ্যামিতির ভাষাই হবে উপযুক্ত ভাষা। জ্যামিতির ভাষাই হলো রেখা-চিত্রের ভাষা। এখন ৩ নং চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, 'চ-ট' ও 'চ-ঠ' রেখাদ্বয় টাকাটার দুটো বিশিষ্ট গতিপথ নির্দেশ করছে। আলাদা ভাবে টোকা দেবার ফলে যে বেগ দুটা উৎপন্ন হয়েছিল তারই জন্য রচিত হয়েছে এই রেখা দু'টা। এই রেখাদ্বয়ের এবং ঐ বেগ দুটার দিক একই দিক এবং রেখা দু'টার দৈর্ঘ্যও ঐ বেগ দু'টার সমানুপাতিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।* সুতরাং এই রেখাদ্বয়কে আমরা যথাক্রমে ঐ

* যদি মেজেটা সম্পূর্ণ মসৃণ হতো (অর্থাৎ যদি ঘর্ষণ-বল না থাকতো) তবে টাকার গতিপথ দুটা (চ-ট ও চ-ঠ রেখাদ্বয়) উৎপন্ন বেগ দু'টার ঠিক সমানুপাতিক হতো। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে টাকাটা আদৌ থামতো না, সুতরাং ওর পথের প্রান্তদ্বয়কে (ট ও ঠ বিন্দুকে) চিহ্নিত করার সম্ভব হতো না। তোমাদের পরীক্ষার একটা সুবিধা এই যে, মেজেটা সম্পূর্ণ মসৃণ না হলেও প্রায় মসৃণ; সুতরাং শেষ পর্যন্ত টাকাটা থেমে যাবে এবং ওর গতিপথ দুটার দৈর্ঘ্যও উৎপন্ন বেগ দুটার প্রায় সমানুপাতিক হবে।

বেগ দুটার রেখা-চিত্র বা প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে পারি এবং বেগ-সংযোজন ব্যাপারে ঐ বেগ দু'টার বদলে প্রত্যক্ষগোচর এই রেখা দুটাকে নিয়ে কারবার করতে পারি। বস্তুতঃ এইরূপ করাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে; কেবল বেগ নয়, দিকবিশিষ্ট যে কোন রাশিকে—যেমন 'বল' 'ত্বরণ' 'সরণ' প্রভৃতিকেও—আমরা এক একটা সরল রেখাদ্বারা চিহ্নিত করতে পারি। এ শুধু একমাত্র প্রয়োজন—যে-জিনিষটাকে চিহ্নিত করতে হবে তার দিক বরাবর (বা তার সমান্তরাল ভাবে) এবং তার সমানুপাতে একটা সরল রেখা টানা। রেখাটা যে কোন স্থান (বা যে কোন বিন্দু) থেকে টানা যেতে পারে এবং ওর দৈর্ঘ্যও যা কিছু হতে পারে। কেবল এইটা ঠিক থাকার দরকার যে, যে ক্ষেত্রে একাধিক বেগ (বা 'বল' প্রভৃতি) নিয়ে কারবার করতে হবে সেখানে ওদের প্রতীকরূপী রেখা-গুলির দৈর্ঘ্য—ঐ সকল বেগের (বা 'বল' প্রভৃতির) সমানুপাতিক হতে হবে।

এই কথাগুলি স্মরণ রেখে ৩নং চিত্রের সাহায্যে তোমরা এখন সহজেই বুঝতে পারবে যে, আমিত্তির ভাষায় বেগ-সংযোজনের নিয়মটাকে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে :

যদি কোন পদার্থে একই সময়ে দুটা বেগ প্রয়োগ করা যায় এবং কোন একটা বিন্দু (যেমন 'চ' বিন্দু) থেকে দুটা সরল রেখা (চ-ট ও চ-ঠ) টেনে এই বেগ দু'টাকে চিহ্নিত করা যায়, এবং এই রেখাদ্বয়কে সন্নিহিত বাহু করে একটা সামান্তরিক ক্ষেত্র আঁকা যায়, তবে ওর যে কর্ণরেখাটা ('চ-ত' কর্ণ) ঐ বিন্দুর ভেতর দিয়ে টানা যাবে, ঐ রেখাটাই দিকে ও পরিমাণে, ঐ বেগ দু'টার ফল-বেগ নির্দ্দেশ করবে।

এই হলো বিভিন্ন দিগ্‌বর্ত্তী দুটা বেগের সংযোজনের নিয়ম। একে বলা যায় বেগ-সামান্তরিকের নিয়ম (Principle of Parallelogram of velocities) নিয়মটা এই কথাই প্রকাশ করে যে, তোমাদের পরীক্ষায় অন্তর্গত টাকাটা 'চ-ট' ও 'চ-ঠ' চিহ্নিত বেগ নিয়ে আলাদা আলাদা দিকে ছুটে যাচ্ছে। এরূপ কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না ক'রে তোমরা 'চ-ত' রেখাটা বেখিয়ে দিয়ে বলবে যে, সত্যি সত্যি টাকাটা ঐ পরিমিত বেগ নিয়ে ঐ দিকে ছুটে গিয়েছে।

এখন এ কথা বোঝাও তোমাদের পক্ষে কঠিন হবে না যে, যেমন বিভিন্ন দিগ্‌বর্ত্তী দুটা বেগ পরস্পরে সংযুক্ত হয়ে মাঝামাঝি একটা দিকে ওদের ফল-বেগ উৎপন্ন করে, সেইরূপ বিভিন্ন দিগ্‌বর্ত্তী দুটা 'বল' বা দুটা ত্বরণও পরস্পরে সংযুক্ত হয়ে মাঝামাঝি একটা দিকে ওদের একটা ফল-বল বা ফল-ত্বরণ উৎপন্ন করবে, অধিকন্তু বল-সংযোজনের ও ত্বরণ-সংযোজনের নিয়মের আকার ধারণ করবে। এ কথার সত্যতা উপলব্ধির জন্য প্রথমতঃ আমরা বল-সংযোজন ব্যাপারটার উল্লেখ করবো। আমরা জানি যে, টাকাটার ওপর যে টোকা বা ধাক্কা দুটা দেওয়া হয়েছে তা হলো বিশিষ্ট ধরণের দুটা বল। এই বল দুটা প্রয়োগ করা হয়েছে যথাক্রমে 'চট' ও 'চঠ' দিক বরাবর এবং তারই জন্য ঐ বেগ দুটা উৎপন্ন হয়েছে, যাদেরকে তোমরা চিহ্নিত করেছ 'চট' ও 'চঠ' রেখা দ্বারা। এখন নিউটন-বর্ণিত গতির দ্বিতীয় নিয়ম অনুসরণ করে অবশ্য বলতে পারা যায় যে, এই বেগ দুটা ওদের উৎপাদকের ঐ বল দুটার সমানুপাতিক। সুতরাং যে-অর্থে আমরা 'চ-ট' ও 'চ-ঠ' রেখাকে উৎপন্ন বেগদ্বয়ের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছি সেই অর্থে ওদেরকে যথাক্রমে ঐ বল দু'টার প্রতীকরূপেও গ্রহণ করতে পারি।—সঙ্গে সঙ্গে আমরা এও বলতে পারি যে, যে অর্থে 'চ-ত' রেখাটা 'চট' ও 'চঠ' বেগের ফল-বেগ নির্দ্দেশ করছে সেই অর্থে ঐ রেখাদ্বয় দ্বারা চিহ্নিত বল দু'টার ফল-বলও নির্দ্দেশ করছে; কারণ, এ কথাটা আমাদের মেনে নিতে হয় যে, ফল-বেগটা যাই হোক, ওর উৎপাদক-রূপে কল্পিত ফল-বলটা ওর দিক বরাবর অবস্থিত হবে এবং ওর সমানুপাতিক হবে। মোটের ওপর বলা যায় যে, বল-সংযোজনের নিয়ম অবিকল বেগ-সংযোজনের নিয়মের অনুরূপ। আবার একই কারণে —গতির দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে পদার্থবিশেষের ত্বরণ ওর ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক বলে'—ত্বরণ সংযোজনের নিয়মও যে অবিকল বেগ-সংযোজনের নিয়মের অনুরূপ হবে তাও আমরা অনায়াসেই মেনে

নিতে পারি। সুতরাং পূর্বোক্ত বেগ-সংযোজনের নিয়মে 'বেগ' শব্দটার বদলে 'বল' এবং 'ত্বরণ' শব্দ ব্যবহার করলে আমরা যথাক্রমে বল-সংযোজনের ও ত্বরণ-সংযোজনের নিয়ম পাই। এই নিয়ম দু'টাকে যথাক্রমে বল-সামান্তরিক ও ত্বরণ-সামান্তরিকের নিয়ম বলা যায়।

উক্ত বেগ-সামান্তরিকের নিয়মটা হলো একটা সাধারণ নিয়ম। উপাদ্য বেগ দু'টা পরস্পরের সমান হোক বা অসমান হোক, ওদের অন্তর্গত কোণটা ছোট হোক বা বড় হোক, সকল ক্ষেত্রেই এ নিয়ম খাটবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ নিয়ম যে আকার ধারণ করে, তার কোটাকতক উদাহরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। আমরা বলেছি যে, উপাদ্য বেগ দু'টি যদি একই দিকে অবস্থিত হয়, (বা উভয়ের অন্তর্গত কোণ যদি শূন্য-পরিমিত হয়) তবে ফল-বেগটা উপাদ্য বেগ দু'টার যোগফলের সমান হবে, এবং ওরা যদি পরস্পরের বিপরীতমুখী হয় (বা উভয়ের অন্তর্গত কোণ ১৮০ ডিগ্রী পরিমিত হয়) তবে ফল-বেগটা হবে ওদের বিয়োগ-ফলের সমান। বেগ-সামান্তরিকের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সামান্তরিক ক্ষেত্র এঁকে এই সকল উক্তির সত্যতা তোমরা সহজেই প্রতিপন্ন করতে পারবে।

এখন আরো একটা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যেখানে উপাদ্য বেগ দু'টা পরস্পরের সঙ্গে সমকোণ ক'রে (বা পরস্পরের লম্বভাবে) অবস্থান করে সে ক্ষেত্রে বেগ-সংযোজনের নিয়মটা কি আকার ধারণ করে তা বিশেষ-ভাবে দেখার দরকার। ৪নং চিত্রের 'চ-ক' ও 'চ-খ' রেখা দু'টাকে টানা হয়েছে পরস্পরের সঙ্গে সমকোণ ক'রে। সুতরাং ওদেরকে আমরা, পরস্পরের লম্বভাবে অবস্থিত এইরূপ দু'টা বেগের প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে পারি। এইরূপ দু'টা বেগের ফল-বেগ কি ধরণের হবে? স্পষ্ট দেখা যায় যে, এ স্থলে ওনং চিত্রের 'চ-উ-ত-ঠ' সামান্তরিক ক্ষেত্রটা ৪নং চিত্রের 'চ-ক-ত-খ' আয়তক্ষেত্রের (Rectangle) আকার ধারণ করবে এবং ওর 'চ-ত' কর্ণটা 'চ-ক' ও 'চ-খ' রেখা দ্বারা চিহ্নিত উপাদ্য বেগ দু'টার ফল-বেগ নির্দেশ করবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি:

$$চত^2 = চক^2 + কত^2$$
$$= চক^2 + চখ^2 \cdots\cdots (১)$$

এই সমীকরণ এই তথ্য প্রকাশ করে যে, এ ক্ষেত্রে ফল-বেগের বর্গ উপাদ্য বেগ দু'টার বর্গের যোগফলের সমান হবে। এ কথাও মানতে হবে যে, এই নিয়মটা কেবল বেগ সংযোজনের পক্ষেই নয়, পরস্পরের লম্বভাবে অবস্থিত এইরূপ দুটা 'বল' বা দুটা 'ত্বরণে'র সংযোজনের বেলাতেও পূর্ণ মাত্রায় খাটবে।

বেগ-সংযোজন সম্পর্কে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের উল্লেখও আমরা এখানে করবো। ওনং বা ৪নং চিত্র থেকে দেখা যাবে যে, বেগ-সামান্তরিকের নিয়মকে আরো একটা সুবিধাজনক নিয়মের আকার দান করা যেতে পারে। উপাদ্য বেগ দুটাকে আমরা এ যাবৎ 'চ-ট' ও 'চ-ঠ' রেখা দ্বারা চিহ্নিত করেছি (ওনং চিত্র)। কিন্তু 'ট-ত' রেখাটা 'চ-ঠ' রেখার সমান ও সমান্তরাল বলে যে অর্থে 'চত' বেগটাকে আমরা 'চট' ও 'চঠ' রেখা দ্বারা চিহ্নিত বেগ দুটার ফল-বেগ বলে বর্ণনা করতে পারি সেই অর্থে ওকে 'চট' ও 'টত' রেখাদ্বারা চিহ্নিত বেগ দুটার ফল-বেগ বলেও নির্দেশ করতে পারি। আর একথা কেবল বেগ সম্বন্ধেই নয়, বল ও ত্বরণ সম্বন্ধেও খাটবে। সুতরাং বেগ, বল, ত্বরণ প্রভৃতির সংযোজনের নিয়মকে নিম্নোক্ত রূপেও প্রকাশ করা যেতে পারে:

যে দুটা দিকবিশিষ্ট রাশির (বেগ, বল প্রভৃতির) সংযোজন করতে হবে, যে কোন বিন্দু (যেমন 'চ' বিন্দু) থেকে তার একটার রেখা চিত্র (চ-ট) টান, এবং দ্বিতীয়টার রেখাচিত্র টান প্রথম রেখাটার অপর প্রান্ত ('ট' প্রান্ত) থেকে। তারপর প্রথম রেখাটার আদিবিন্দু (চ) এবং দ্বিতীয় রেখাটার শেষ বিন্দু (ত) পরস্পরের সঙ্গে যোগ করে দাও। এইরূপে যে রেখাটা ('চ-ত' রেখা) পাওয়া যাবে তা উক্ত দিকবিশিষ্ট রাশি দুটার সংযোজনের ফল (ফল-বেগ, ফল-বল বা ফল-ত্বরণ) নির্দেশ করবে। এই নিয়মটা সামান্তরিক নিয়মের অন্তর্গত এবং ওরই একটা বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী মাত্র।

এর থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও সহজেই এসে পড়ে। আমরা দেখেছি 'চ-ট' ও 'ট-ত' চিহ্নিত বেগ দুটা মিলে মিশে 'চ-ত' বেগটা উৎপন্ন করেছে [৩নং চিত্র]। এখন এ কথা অতি স্পষ্ট যে, 'চ-ত' চিহ্নিত বেগটার সঙ্গে 'ত-চ' চিহ্নিত বেগটার সংযোগ ঘটালে ওরা কাটাকাটি হয়ে লোপ পাবে। কারণ এই বেগ দুটা পরস্পরের সমান ও বিপরীতমুখী। সুতরাং এর থেকে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারি :

যদি কোন পদার্থে একই সময়ে এমন তিনটা বেগ (বা বল বা স্বরণ) প্রযুক্ত হয়—যাদেরকে দিকে ও পরিমাণে তিনটা বাহুদ্বারা—চ-ট-ত ত্রিভুজের চ-ট, ট-ত যথাক্রমে নির্দেশ করা যেতে ও ত-চ বাহুদ্বারা পারে, তবে ওদের ফল-বেগ (বা ফল-বল বা ফল-স্বরণ) হবে শূন্য ; বা ওরা পরস্পরে কাটাকাটি করে লোপ পাবে। সুতরাং যদি পদার্থটা সাম্যাবস্থায় থেকে থাকে তবে ঐ ধরণের তিনটা বেগের (বা বল বা স্বরণের) প্রভাবে ওর অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটবে না। এই নিয়মটাকে বলা যায় - বেগ-সাম্যের (বা বল-সাম্যের বা স্বরণ-সাম্যের) ত্রিকৌণিক নিয়ম (Triangle Law)।

এই নিয়ম থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত দু'টাও আপনি এসে পড়ে : যদি কোন পদার্থে তিনটা বেগ (বা বল বা স্বরণ) এমন ভাবে প্রযুক্ত হয় যে, তা সত্ত্বেও পদার্থটা আগেকার সাম্যাবস্থাতেই থেকে যায়—তবে (১) ওদেরকে দিকে এবং পরিমাণে একটা ত্রিভুজের বাহুত্রয় দ্বারা যথাক্রমে নির্দেশ করা যেতে পারে ; (২) ওদের যে কোন দুটার যোগফল অপরটা থেকে ছোট হতে পারে না ; কারণ ত্রিভুজের যে কোন বাহুদ্বয়ের যোগফল তৃতীয়টা থেকে ছোট হতে পারে না।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এই : ৩নং চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, বেগ-সংযোজনের নিয়মকে আরো একটা নূতন মূর্তি দান করা যেতে পারে। এই নিয়ম আমাদের বলে দিচ্ছে যে, যে-পদার্থটা 'চ-ট' রেখা-দ্বারা চিহ্নিত বেগটার মালিক তাতে যদি 'ট-ত' রেখা-দ্বারা চিহ্নিত বেগটা নূতন করে উৎপন্ন করা যায়, তবে তার ফলে ওর যে শেষ বেগটা পাওয়া যাবে, তা চিহ্নিত হবে 'চ-ত' রেখাদ্বারা। সুতরাং যে পদার্থ 'চ-ট' বেগের মালিক ছিল, তাকে যদি 'চ-ত' বেগের মালিক হতে হয় তবে ওর বেগের পরিবর্তন ঘটাতে হবে 'ট-ত' পরিমিত। ফলে দেখা যায় যে, যদি কোন বেগমান পদার্থের বেগের পরিবর্তন ঘটে এবং ওর আদি বেগ ও শেষ বেগ দেওয়া থাকে তবে ওর বেগের পরিবর্তনটা নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে :

কোন একটা বিন্দু থেকে দু'টা সরল রেখা টেনে (যেমন 'চ' বিন্দু থেকে 'চ-ট' ও 'চ-ত' রেখা টেনে) পদার্থটার আদি বেগ ও শেষ বেগ চিহ্নিত কর। তারপর প্রথম রেখার শেষ প্রান্তকে দ্বিতীয় রেখার শেষ প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত কর। এইরূপে যে রেখাটা ('ট-ত' রেখা) পাওয়া যাবে তার দ্বারাই দিকে ও পরিমাণে ঐ পদার্থের বেগের পরিবর্তন চিহ্নিত হবে।

আমরা জানি, পদার্থের বেগ-পরিবর্তনের দিক ও স্বরণের দিক একই দিক এবং যে হারে বেগের পরিবর্তন ঘটে তা ওর স্বরণের মাত্রা নির্দেশ করে। সুতরাং যদি পদার্থবিশেষের বেগের পরিবর্তন 'ট-ত' রেখাদ্বারা চিহ্নিত করা যায় এবং ঐ পরিবর্তন সাধনের জন্য যে সময়ের আবশ্যক হয় তাকে 'স' বলা যায় তবে (ট-ত ÷ স) রাশিদ্বারা ওর গড়-স্বরণের মাত্রা নির্দিষ্ট হবে।

৪। বেগ ও বল বিভাজনের নিয়ম

অতঃপর আমরা যে কথার আলোচনা করবো তাকে বলা যাবে বেগ-বিভাজন। এ হলো বেগ-সংযোজনের

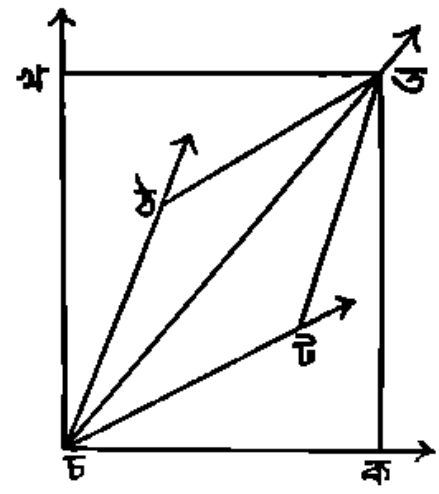

৪ নং চিত্র

উল্টা ব্যাপার। ৪নং চিত্রের দিকে তাকালে কথাটার অর্থ স্পষ্ট হবে।

এই চিত্রের অন্তর্গত 'চ-ট' ও 'চ-ঠ' চতুর্ভুজটা একটা সামান্তরিক ক্ষেত্র। 'চ-ট' এবং 'চ-ঠ' ওর সন্নিহিত বাহুদ্বয় এবং 'চ-ত' ওর কর্ণরেখা। সুতরাং কেউ যদি তোমাদের বলে যে, কোন পদার্থে একই সময়ে 'চ-ট' ও 'চ-ঠ' রেখাদ্বারা চিহ্নিত বেগ দুটা উৎপন্ন করা হয়েছে, তবে বেগ-সংযোজনের নিয়ম থেকে তোমরা অবশ্যই বলতে পারবে যে, পদার্থটা সত্যি সত্যি চলতে থাকবে 'চ-ত' দিক বরাবর এবং 'চ-ত' পরিমিত বেগ নিয়ে। এ ছাড়া অন্য কোন বেগে বা অন্য কোন দিকে ও চলতে থাকবে এরূপ অনুমান করার অধিকার তোমাদের নেই; কারণ 'চ-ট' ও 'চ-ঠ' রেখাদ্বয়কে সন্নিহিত বাহু ক'রে ঐ একটা মাত্র সামান্তরিক ক্ষেত্র (চ-ট-ত-ঠ) এবং 'চ' বিন্দুর ভেতর দিয়ে ও একটা মাত্র কর্ণই (চ ত) আঁকা যেতে পারে; তার বেশী আঁকা যায় না।

এখন কেউ যদি তোমাদেরকে বলে যে, কোন একটা পদার্থ 'চ-ত' বেগে ছুটে যাচ্ছে তবে যদিও তার অর্থ হবে যে, সত্যি সত্যি পদার্থটি ঐ বেগে ঐ দিকে এগিয়ে চলেছে, তবু বেগ-সংযোজনের নিয়ম অনুসরণ করে তার বদলে তোমরা এ-ও ভাবতে পার যে, পদার্থটা 'চ-ট' দিক বরাবর 'চ-ট' পরিমিত বেগ নিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'চ-ঠ' দিকে 'চ-ঠ' পরিমিত বেগ নিয়ে [৪নং চিত্র] অগ্রসর হয়েছে। এই মানসিক প্রক্রিয়াকে বলা যায় বেগের বিভাজন (Resolution of a Velocity) এবং এই বেগ দুটাকে ('চ-ট' ও 'চ-ঠ' বেগকে) বলা যায়—এই দিক দ্বয় বরাবর ঐ 'চ-ত' বেগের উপাংশ দ্বয় (Resolved parts)।

এখন এ-সম্পর্কে একটা বিশেষ বিবেচনার বিষয় এই যে, যদিও 'চ-ট' ও 'চ-ঠ' রেখাদ্বয়কে সন্নিহিত বাহু ক'রে একটা মাত্র সামান্তরিক ক্ষেত্র (চ-ট-ত-ঠ) আঁকতে পারা যায়—যার কর্ণরেখা 'চ-ত' তবু 'চ-ত' রেখাটাকে কর্ণরেখা করে 'চ' বিন্দুর ভেতর দিয়ে বহুসংখ্যক সামান্তরিক ক্ষেত্র আঁকা যেতে পারে, যার কোনটার সন্নিহিত বাহুদ্বয় 'চ-ট' ও 'চ-ঠ' দিকে এবং কোনটার বা ভিন্ন দুটা দিকে, যেমন 'চ-ক' ও 'চ-খ' দিক বরাবর [৪নং চিত্র] প্রসারিত। সুতরাং যে-অর্থে 'চ-ত' চিহ্নিত বেগটাকে আমরা 'চ ট' ও 'চ-ঠ'দিকে বিভক্ত করতে পারি সেই অর্থে ওকে 'চ ক' ও 'চ-খ' দিকে (কিম্বা অপর কোন একজোড়া দিক বরাবর) বিশ্লিষ্ট করতে পারি, এবং যে-অর্থে প্রথম ক্ষেত্রে ঐ বেগটার উপাংশ বেগ দুটা চিহ্নিত হবে 'চ-ট' ও 'চ-ঠ' রেখাদ্বারা, সেই অর্থে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঐ একই বেগের উপাংশদ্বয় নির্দ্দিষ্ট হবে 'চ-ক' ও 'চ-খ' রেখাদ্বারা। এর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যদিও একজোড়া নির্দ্দিষ্ট বেগের সংযোজন ব্যাপারে কোন্ দিকে ওদের সংযোজন করতে হবে এ-প্রশ্ন ওঠে না, তবু একটা নির্দ্দিষ্ট বেগের বিভাজন ব্যাপারে কোন্ দুটা দিক বরাবর ওকে বিভক্ত করতে হবে, তা বলে দেবার দরকার হয়; অন্যথায় কথাটার একটা স্পষ্ট অর্থ হয় না।

উক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, সাধারণ ক্ষেত্রে বেগবিভাজনের নিয়মটাকে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে:

যে-বেগটাকে বিভক্ত করতে হবে তাকে একটা সরল রেখা (যেমন 'চ-ত' রেখা) দ্বারা চিহ্নিত কর। তার পর ওর আদি বিন্দু (চ) থেকে দুটা রেখা (যেমন 'চ-ক' ও 'চ-খ' রেখা) টেনে যে দিকদ্বয় বরাবর বেগটাকে বিভক্ত করতে হবে তা চিহ্নিত কর (৪নং চিত্র)। তার পর 'ত' বিন্দু থেকে 'চ-ক' রেখার সমান্তরালভাবে 'ত-খ' রেখা এবং 'চ-খ' রেখার সমান্তরালভাবে 'ত-ক' রেখা টান। এইরূপে যে 'চ-ক' ও 'চ-খ' রেখা দুটা পাওয়া যাবে, ওরাই ঐ রেখাদ্বয় বরাবর ঐ বেগটার ('চ-ত' বেগের) উপাংশ বেগ নির্দ্দেশ করবে।

এই হলো বেগবিভাজনের সাধারণ নিয়ম। ঐ দিক দুটা (চ-ক ও চ-খ রেখাদ্বয়) যে-ভাবেই অবস্থিত হোক সকল ক্ষেত্রেই এ-নিয়ম খাটবে। আর এ-নিয়ম যেমন বেগ-বিভাজনের পক্ষে সেইরূপ বল ও ত্বরণ-বিভাজনের পক্ষেও খাটবে। এর অর্থ এই যে, উক্ত নিয়মের ভেতর 'বেগ' শব্দটার বদলে 'বল' কিম্বা 'ত্বরণ' শব্দ বসিয়ে

দিলেই যথাক্রমে বলবিভাজনের ও বেগ-বিভাজনের নিয়ম পাওয়া যাবে।

এই নিয়মের একটা বিশিষ্ট প্রয়োগক্ষেত্র হলো আড়াআড়িভাবে (বা পরস্পরের লম্বভাবে) অবস্থিত দুটা দিক বরাবর কোন একটা বেগের (বা বল প্রভৃতির) বিভাজন। ৪নং চিত্রের 'চ-ক' ও 'চ-খ' রেখার বস্তুতঃ এইরূপ একজোড়া দিক নির্দেশ করছে। এই চিত্রের অন্তর্গত 'ক-চ-খ' কোণটা সমকোণ, সুতরাং 'চ-ক'ও'চ-খ' রেখার পরস্পরের লম্বভাবে অবস্থান করছে। এক্ষেত্রেও বেগ-বিভাজনের উক্ত নিয়মটা খাটবে কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রের বিশেষত্ব এই যে, এখানে 'ত-ক' ও 'ত-খ' রেখা দুটা যথাক্রমে 'চ-ক' ও 'চ-খ' রেখার লম্বভাবে অবস্থান করছে বলে 'ত-ক-চ-খ' সামান্তরিক ক্ষেত্রটা একটা আয়তক্ষেত্রের (Rectangle-এর) আকার ধারণ করেছে। এইরূপ বিভাজনকে ইংরেজীতে বলা হয় Rectangular Resolution। আমরা একে বলবো আড়াআড়ি বিভাজন। আমরা এ-ও দেখতে পাচ্ছি যে, কোন দিক বিশিষ্ট পদার্থের (বেগ, বল প্রভৃতির) আড়াআড়ি বিভাজনের নিয়মটাকে পূর্ব্বোক্ত ১নং সূত্র দ্বারাই প্রকাশ করা যাবে। ঐ সূত্র এখন এই তথ্য প্রকাশ করবে যে, আড়াআড়ি বিভাজনের বেলায় কোন একটা বেগের (বা বল প্রভৃতির) উপাংশ দু'টার বর্গের যোগফল ঐ বেগের (বা বল প্রভৃতির) বর্গের সমান হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ কোন দিক বিশিষ্ট পদার্থের বিভাজন বলতে আড়াআড়ি বিভাজনকেই বোঝায়। এরূপ সকল ক্ষেত্রেই ১নং সূত্রটা খাটবে। এখন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে 'চ-ত' বেগটার 'চ-ক' দিকে উপাংশ কত ? তবে তার উত্তরে তোমরা বলবে : —'ত' বিন্দু থেকে 'চ-ক' রেখার ওপর 'ত-ক' লম্ব টান। ফলে যে 'চ-ক' রেখাটা পাওয়া যাবে ঐ রেখাটাই এদিকে ঐ বেগের উপাংশ নির্দ্দেশ করবে।

তোমরা এও লক্ষ্য করবে যে, কোন দিক বিশিষ্ট পদার্থের (বেগ, বল প্রভৃতির) ওর নিজের দিক বরাবর উপাংশটা হবে ঠিক ওরই সমান এবং ওর লম্বের অভিমুখে হবে শূন্য-পরিমিত। এর থেকে তোমরা অবশ্য সিদ্ধান্ত করতে পার যে, অন্য কোন দিকে ওর উপাংশের পরিমাণ হবে ওর নিজের চেয়ে ছোট এবং শূন্যের চেয়ে বড়।

অনুশীলনী

১। বেগ-সংযোজন এবং বেগ-বিভাজনের নিয়ম বল। 'বল' ও 'ত্বরণ'-সংযোজনের বেলায় এই নিয়ম দুটা কি আকার ধারণ করে ? চিত্রের সাহায্যে প্রত্যেক নিয়মের অর্থ বুঝিয়ে দাও।

২। বেগ-সাম্যের (এবং বল-সাম্যের) ত্রিকৌণিক নিয়ম চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

৩। দুটা বলের ফল-বল বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম হয় কোন্ কোন্ অবস্থায় ? দু'টা সমান সমান বলের ফল-বল কোন্ দিকে অবস্থিত হবে ?

৪। দু'টা সমান সমান বেগের ফল-বেগ যদি ওদের প্রত্যেকের সমান হয়, তবে উভয়ের অন্তর্গত কোণের পরিমাণ কত ? [১২০ ডিগ্রী]

৫। কোন পদার্থে একই সময়ে সেকেণ্ডে ৩ ফুট ও ৪ ফুট পরিমিত দু'টা বেগ পরস্পরের লম্বভাবে প্রযুক্ত হলো। ফল-বেগটা কত হবে ? [সেকেণ্ডে ৫ ফুট]

৬। কোন পদার্থে পরস্পরের লম্বভাবে দু'টা বল প্রযুক্ত হলো। একটা বলের পরিমাণ ৪ ; ফল-বলটা ওর দ্বিগুণ। বাকী বলটার পরিমাণ ও ফল-বলের দিক নিরূপণ কর [৪√৩ , প্রদত্ত বলের সঙ্গে ৬০ ডিগ্রী কোণ করে অবস্থিত।]

৭। নদীতে স্রোত বয়ে যাচ্ছে সেকেণ্ডে ৩ ফুট বেগে। তুমি সাঁতার কাটতে পার সেকেণ্ডে ৪ ফুট বেগে। তুমি যদি (ক) স্রোতের অভিমুখে ; (খ) স্রোতের বিপরীত দিকে ; (গ) নদীর আড়ভাবে সাঁতরাতে থাক, তবে কোন্ ক্ষেত্রে কি বেগে তুমি এগোতে থাকবে ?

[সেকেণ্ডে ৭ ফুট, ১ ফুট, ও ৫ ফুট]

৮। ঐ নদীটার পাশ যদি আধ মাইল হয়, তবে (ক) নদী পাড়ি দিতে তোমার কত সময় লাগবে ? (খ) ততক্ষণে স্রোতের অভিমুখে তুমি কতদূর এগিয়ে যাবে ? [১১ মিনিট ; ১৯৮০ ফুট]

৯। কোন পদার্থের ওপর একটা ত্রিভুজের বাহু-

এদের লক্ষের অভিমুখে এবং ওদের সমান্তরালে যথাক্রমে তিনটা বল প্রযুক্ত হলো। ওদের ফল-বল কত? [০]

১০। 'ক-খ-গ-ঘ' একটি বর্গক্ষেত্র; 'ঘ' ওর মধ্যবিন্দু। ম-ক, ম-খ, ম-গ ও ম-ঘ রেখা বরাবর যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ পরিমিত চারটা বল কোন পদার্থের ওপর প্রযুক্ত হলো। ফল-বল কত হবে? [১/২]

১১। 'চ-ক-খ-গ-ঘ-চ' একটি বহুভুজ ক্ষেত্র। প্রমাণ কর যে, চ-ক, ক-খ, খ-গ ও গ-ঘ রেখা দ্বারা চিহ্নিত বেগ বা বল-চতুষ্টয়ের ফল-বেগ বা ফল বলকে দিকে এবং পরিমাণে 'চ-ঘ' রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে।

১২। পদার্থবিশেষের ওপর এমনভাবে কতকগুলি বেগ (বা বল বা ত্বরণ) প্রযুক্ত হয়েছে যাদেরকে দিকে ও পরিমাণে কোন বহুভুজ ক্ষেত্রের বাহুগুলি দ্বারা পর পর চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রমাণ কর যে, ঐ সকল বেগের (বা বলের বা ত্বরণের) সংযোজনের ফল শূন্য-পরিমিত।

১৩। একটা দিক বিশিষ্ট রাশি (যাকে বলা যাবে 'ব') 'চ-ক' রেখার সঙ্গে হেলভাবে অবস্থান করছে। উভয়ের অন্তর্গত কোণ যদি যথাক্রমে ০,৪৫, ৬০ ও ৯০ ডিগ্রী পরিমিত হয় তবে ঐ রেখা বরাবর ঐ রাশিটার উপাংশ কত কত হবে? ব; [$\frac{ব}{\sqrt{২}}$; $\frac{ব}{২}$; ০]

১৪। কোন পদার্থের বেগ যদি এখন 'চ-ট' রেখা দ্বারা এবং একটু পরে ('স' সময় পরে) 'চ-ত' রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা যায় তবে ওর গড় ত্বরণ কত হবে এবং 'স' সময়টা যদি খুব সামান্য হয় তবে তৎকালীন ত্বরণ কি হবে? [$\frac{চত}{স}$]

১৫। যে ক্ষেত্রে পদার্থবিশেষের বেগের পরিমাণ ঠিক থেকে দিকটাই শুধু বদলাতে থাকে সে ক্ষেত্রে ওর ত্বরণ এবং ওর ওপর প্রযুক্ত বলের দিক কি ভাবে অবস্থিত হবে? [প্রতি মুহূর্তে তৎকালীন বেগের আড়ভাবে।]

১৬। প্রমাণ কর যে, যদি কোন পদার্থ ওর বেগের পরিমাণ ঠিক রেখে বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে তবে প্রতি মুহূর্তে ওর ত্বরণ উৎপন্ন হয় ঐ বৃত্তের কেন্দ্রের অভিমুখে এবং ওর বেগের বর্গকে ঐ বৃত্তের ব্যাসার্ধ দ্বারা ভাগ করলে যা হয় তার সমান-পরিমাণে।

১৭। আকাশের চাঁদকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেগ নিয়ে প্রায় বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে বেষ্টন করে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এই ব্যাপারে চন্দ্রে বেগ উৎপন্ন হচ্ছে কোন্ দিকে? যে বল ঐ বেগ উৎপন্ন করে তা প্রযুক্ত হচ্ছে কোন্ দিকে? কে ঐ বল প্রয়োগ করছে বলে অনুমান করা স্বাভাবিক হবে?

ভূ-কেন্দ্র থেকে চন্দ্রের দূরত্ব যদি প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল হয় এবং ভূ-প্রদক্ষিণ ব্যাপারে চন্দ্রের সময় লাগে যদি প্রায় একমাস, তবে চন্দ্রের ত্বরণের মাত্রা কত?

[সেকেণ্ড প্রতি, প্রতি সেকেণ্ডে এক ইঞ্চির প্রায় দশভাগের একভাগ।]

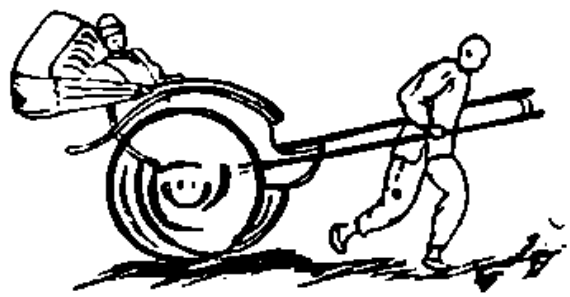

অভিসার

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সখি,

বাজিছে মুরলী মধুর ছন্দে
আকুল করিয়া হিয়া,
এ গৃহে কেমনে রহি গো সজনি
কঠিন আগল দিয়া।

চল যাই সখি বঁধুর নিকটে
কি ছার লোকের লাজ!
সে বঁধুরে যেবা না করয়ে সেবা
সে হীন জগত মাঝ।

ননদি কঠিনা প্রেম-রস-হীনা
ধিক্ তারে শতবার
বাঁধিয়া আমারে রেখেছে ঘরেতে
না করে ঘরের বার।

যদি সে আসিয়া পুছয়ে সজনি
"রাধা কোথা যাস বল।"
বলিব তাহারে "যাই যমুনায়
ভরিতে কলসী জল!

কৃষ্ণদাস গাহে শুন লো রসিকে
উচিত বচন তোর
ছলী না হইলে তারে নাহি মিলে
ছলিয়া মাধব মোর।

তুমি যেন কবিতার মতো

শ্রীঅনিলরঞ্জন রায়

ওগো নিরুপমা।
প্রদোষ উষার থেকে রাতের আঁধারে
যতবার দেখেছি তোমারে—
মনে মনে কল্পনায় অমিয় মিছানি
দিয়াছি সহস্রবার সতলক্ষ বাণী,
কত দিন কতবার দিয়াছি উপমা
ফুটন্ত ফুলের সাথে; পূর্ণশশি-সমা
বরষার সজলতা-মাখা রামধনু তব অনুপমা,
তোমার ভ্রূকুটি দেখি বলিয়াছি তুমি সৌদামিনী,
উষার অধর সম বলিয়াছি বিচিত্ররূপিনী,
বলিয়াছি বহুবার তুমি যেন সঙ্গীতের তান
রচে, রচে, মিশে যাও, দিয়ে যাও আত্মীয়ের টান:
বলেছি অনেক—ঠিক মনে নাই অতো
আজিকে বলিব ফিরে মিষ্টি তুমি কবিতার মতো।

শেষ মিনতি*

শ্রীচারুচন্দ্র সেন

বীণার বাড়ী

মিঃ চাকি—বীণা, এবার তা হলে আমাদের Engagement টা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া যাক্।

বীণা—এখনও সময় হয় নি মিঃ চাকি। মিঃ গুপ্ত আমাদের কলেজ ছেড়ে কৃষ্ণনগর চলে গেছেন। তাঁর একটা বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল, সেটাকে আমি চিঠি লিখে ভেঙ্গে দিয়েছি।

মিঃ চাকি—He is despicable.

বীণা—সত্যি কি? আর যদি বলি আপনি সেদিন বড় বেশী করে তাঁকে অপমান করেছেন!

মিঃ চাকি—That's an unalloyed lie.

বীণা—It is not. That's an absolute truth. আপনি কি মনে করেছেন আমি খবর নেই নি। আমি সেই ভদ্রলোকটিকে সব খুঁটি-নাটি ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে এসেছি। আপনি যে এতদূর নীচ, অভদ্র, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আমাদের এখানে আপনি কখনো আসবেন না। যে ভদ্রলোকটি নিজে বলেছে যে, সে আপনার রক্ষিতা। তাহলেও নিজের আপনার লজ্জা হয় না? আপনি এখন যান।

বলিয়াই বীণা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মিঃ চাকি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজ

সেদিন Economics ক্লাশ ছুটি হওয়ার পর নরেনবাবুর সহিত দিলীপের সাক্ষাৎ। তিনি সেদিনকার কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। নরেনবাবু হিন্দু হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং কলেজের সংলগ্ন হোষ্টেলের গা' ঘেঁসিয়াই তাঁহার বাড়ী। তিনি দিলীপকে দেখিয়া বলিলেন—শুনেছি, তুমি এখানে এসেছো, পরে ভেবেছিলাম হোষ্টেলে রয়েছো। এত কাছে, তবুও তুমি আমাদের বাড়ী যাও নি, চলো আজ আমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য উমাও উদ্‌গ্রীব। শেষ কথাটা ঠিক সত্য নয়। কারণ, উমা কোন উদ্‌গ্রীবতাই প্রকাশ করে নি। দিলীপকে লইয়া নরেনবাবু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "শুনছো! দেখ এসে, কে এসেছে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই উমা আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিল।

পোষাক পরিবর্ত্তন করার জন্য নরেনবাবু উঠিয়া গেলেন।

দিলীপ বলিল—"কেমন আছিস? এখন যে তোকে আপনি করে বলা উচিত। তুই হলি আবার প্রফেসারের wife."

উমার মুখ আরক্তিম হইল। সে দিলীপের মুখের দিকে চাহিয়া কথার জবাব দিতে পারিল না, তাহার সঙ্গে যে অনেক স্মৃতি জড়িত। মাটির দিকে চাহিয়া বলিল—ভাল আছি, তুমি ভাল আছ তো? কবে এসেছো! নরেনবাবু আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন—"দিলীপকে কিছু খাবার দাও।" উমা যেন শুনিয়াও শুনিল না, সে যাইয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। দিলীপ দেয়ালে টাঙ্গান ছবিগুলি একের পর এক দেখিতে লাগিল। নরেন বাবু বলিলেন, "যাঃ! বেশ লোক তো। কৈ, কিছু খাবার দিলে না?"

উমা হাসিয়া উত্তর করিল, "আমি ভাবলাম—দিলুদা বোধ হয় চলেই গেল। আজ এখন খাবার তৈরি নাই, আর একদিন এসে দিলুদা খাবার খেয়ে যাবে। দিলীপও হাসিতে হাসিতে নীচে নামিয়া গেল। কিন্তু উমার আজকের ব্যবহার তাহার হৃৎপিণ্ডটাকে টানিয়া বাহির করিবার উপক্রম করিয়াছিল।

দিলীপ হোষ্টেলে ফিরিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিল। মনে পড়িল—উমার স্নেহের পরশ—গত দিনের কত সন্ধ্যায় দু'জনে একথা সেকথা বলিতে বলিতে কোথায় কোন্ অজানা রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। তাহার সহিত আজকের ব্যবহারটা তুলনা করিতেই বুকের ভিতরটা গুমরাইয়া গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল। কেবলই মনে হইল, হৃদয়ের একটা কোণেও কি উমা তাহার জন্য এতটুকু স্থানও রাখে নাই। উমাদের বাড়ী সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যখন গৃহে ফিরিল তখন

প্রায় হোষ্টেলের গেট বন্ধ হওয়ার উপক্রম। শরীর অসুস্থ বলিয়া ঠাকুরকে বিদায় দিয়া সে ছাদে উঠিল।

উমার গৃহে উজ্জ্বল ভাবে আলো জ্বলিতেছিল এবং সে যে এখন ওখর করিতেছে, সবই দেখা যাইতেছিল। কিছুক্ষণ পর উমা অর্গ্যান বাজাইয়া গান ধরিল। যদিও গানের পদগুলি হোষ্টেলের ছাদ পর্য্যন্ত পৌঁছায় না, তবুও গানের মধুর সুরের ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতেছিল। আর একটি ছেলে ছাদে আসিতেই সে আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—আজ আর planetগুলি ভাল দেখা যাচ্ছে না।

দিলীপ বহুদিন আর উমাকে দেখিতে যায় নাই। আশা করিয়াছিল হয় ত বা উমাই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে! কলেজ হইতে ফিরিবার পথে সেদিন হঠাৎ কে যেন তাহার গলা ধরিয়া নরেনবাবুর বাড়ীতে ঢুকাইয়া দিতে চাহিতেছিল! কিন্তু অতি ত্রস্তে গেট অতিক্রম করিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়াই বইগুলি টেবিলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। আজ প্রাতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত ছেলেদের রাত দশটায় ইলেকট্রিক আলো নিভানো লইয়া ঝগড়া হইয়াছে। দিলীপই ছিল সেই ঝগড়ার দলের নীডার এবং সে নরেন বাবুকে বিশেষভাবে কটু কথা শুনাইয়া দিয়াছে। সন্ধ্যা বেলা তাই শুইয়া ভাবিতেছিল—কি করিয়া উমাকে, নরেন বাবুকে মুখ দেখাইবে। সে এইরূপ আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিল,—ঠিক সেই সময়ে উমার ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, উমা ডাকিতেছে। দিলীপ বিলম্ব করিতে পারিল না, ত্রস্তে ছুটিয়া উমার গৃহে উপস্থিত হইল। উমা তাহাকে দেখিয়াই বলিল, "এখানে কি পড়াশুনা করতে এসেছো, না ঝগড়া করতে এসেছো?"

দিলীপ সহসা জবাব দিতে পারিল না, খানিক পরে বলিল "তা' নরেন বাবু ওরকম করেন কেন?"

উমা—ওঁর দোষ কি? আলো নেভানোর একটা নিয়ম বহুকাল হতে চলে আসছে, তোমরা যদি পরিবর্ত্তন করতে চাও, তবে ধরখাস্ত কর না কেন? শুনে অবাক্ হ'য়েছি, তুমি সকলের নেতা হয়ে ওঁকে যা তা বলেছো।

দিলীপ চুপ করিয়া রহিল। উমা সেলাই করিতে লাগিল। দিলীপ চলিয়া যাইতেছিল, উমা বলিল, "বসো, খাবার তৈরি, খেয়ে যাও।"

দিলীপ বলিয়া উঠিল—'না, আমি যাই; কৈ তুমি তো একদিনও আর আমাকে ডাক নি?' অভিমানের সুরটা উমার কানে বাজিল এবং অলক্ষ্যে তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

উমা—ওঁর কাছে তোমার ক্ষমা চাইতে হবে।

দিলীপ—"না, আমি কিছুতেই ক্ষমা চাইবো না।"

ঠিক সেই সময় নরেন বাবু গৃহে ফিরিলেন। তিনি নিকটে আসিতেই উমা বলিল, "দিলুদা তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে।" নরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষ, ও রকম করতে হয় না, আর কখনও এমন উদ্ধত হ'য়ো না।"

দিলীপ মাথা নীচু করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। উমা বলিল, "যেও না, খাবার খেয়ে যাও।" সে আর নড়িতে পারিল না! কে যেন তাহার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল। সে নিকটস্থ সোফায় বসিয়া পড়িল।

•

১৯৪১ সালে যুদ্ধঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 'Army Commission' এর জন্য ভারতবাসীদের ডাক পড়িল। দিলীপ যেন একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। সে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া কেবলই কলিকাতা যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন বেলা আড়াইটার সময় সে অনিলের হোষ্টেলে যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে হাট-কোটে সজ্জিত দেখিয়া অনিল বলিল, "ও কি রে, এক দম সাহেব বন্ গিয়া?" দিলীপ বলিল, "হাঁ রে, হাঁ, Army Commission-এর জন্য interview ছিল আজকে।"

অনিল—তাই নাকি? কি রকম বুঝলি?

দিলীপ—মনে হচ্ছে, ওরা impressed হয়েছে। তবে বাই বলিস্ selection না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাস নেই। শীগ্‌গির চা খাওয়া, আমি এখুনি কৃষ্ণনগর ফিরবো।

অনিল ভৃত্যকে চা আনিতে বলিয়া দিলীপকে বলিল—"তা'হলে এবার যুদ্ধে যাওয়াই ঠিক করলি? পরীক্ষার বালাই তো ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিস্। বাহ্, তোর

University Corps-এ যোগ দেওয়া যদি সার্থক হয়। না লিখেছেন অনেক দিন তোর কোন সংবাদ পাই নি।"

ভৃত্য চা এবং খাবার রাখিয়া গেল। উভয়ে চা পান করিতে করিতে—

দিলীপ—হ্যাঁ ভাই, আমি মা'কে অনেক দিন চিঠি লিখতে পারি নি। এবার কৃষ্ণনগর ফিরেই লিখবো।

অনিল—উমার উচিত তোর সংবাদটা তার চিঠিতে লেখা।

দিলীপ—আমার উমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই।

চা পান শেষ হইতেই দিলীপ ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, "চলি ভাই, আর মাত্র আধঘণ্টা সময় আছে। তুই তো অনেকদিন কৃষ্ণনগর যাস্ নি। একবার আসিস্।" বলিয়াই দিলীপ চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে উমার বিবাহের পর একটি বছর চলিয়া যাইতেছে। গত বৎসর এই দিনে উমা পত্রদ্বারা হয় নাই—আর আজ দিলীপের উমার বিষয় চিন্তা করাও পাপ। দিলীপের মনে অতীতের নানা কথা একটার পর একটা উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল। ঠিক সেই সময় নরেন বাবুর ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, বাবু ডাকিতেছেন। বিশেষ জরুরি, এখুনি যাইতে বলিয়াছেন।

দিলীপ মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ভৃত্যকে অনুসরণ করিল। নরেনবাবুর নিকট যাইতেই তিনি বলিলেন—আমি এই সাড়ে ছয়টার ট্রেনে কলকাতা যাচ্ছি আই-এ পরীক্ষার খাতা আনতে। উমা একা থাকবে। এই দু'টো দিন তাকে একটু দেখো।

দিলীপ—যে আজ্ঞে।

উমা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, ভাল লোককে আমার খবরদারি করতে রেখে যাচ্ছ। ওকে দেখে কে তার ঠিক নাই। দেখছো না, চেহারাটা যেন আহার-নিদ্রা-বর্জিত।

নরেনবাবু হাসিলেন। গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি আর বিলম্ব না করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। দিলীপ বলিল, তা'হলে যাই উমা। উমা হাসিয়া বলিল, যাই বলতে নেই, বলো আসি। আর এখুনি যাবে কেন, বসো, চা খাবে। দিলীপ আর একটি কথা না বলিয়া উমার অনুসরণ করিল। উভয়ে যাইয়া বসিবার ঘরে বসিল।

দিলীপ—কই একদিনও তো খবর নাও নি?

উমা—আর তুমি যেন রোজই আমার খবর নিয়েছো।

দিলীপ—অন্তর্যামী জানেন, আমি আর কিছুই বলবো না।

ভৃত্য ট্রে'তে চা ও খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল। উমা চা প্রস্তুত করিতে করিতে বলিল—"দিনুদা, যা শুনছি তা কি সত্যি?

দিলীপ—কি-রে উমা?

উমা—তুমি নাকি যুদ্ধে যাচ্ছ?

দিলীপ যেন আর সহ্য করিতে পারিল না, উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল—কেন, সত্যি কি তুমি জান না উমা, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। আর কিছু বলিতে পারিল না, গলা বন্ধ হইয়া গেল।

উমা চা প্রস্তুত করিয়া দিলীপের সম্মুখে চা ও খাবার রাখিয়া, নিজের চেয়ারখানা তাহার অতি নিকটে টানিয়া লইল। চা এক চুমুক মুখে দিয়া বলিল, দিনুদা, জীবনে অনেক বড়-বাদল বয়ে যায়। তুমি ভাল হও, সুস্থ থাক, এই আমার একমাত্র কামনা। তুমি যে খাবারগুলি সব চেয়ে খেতে ভালবাস, তাই আজ বানিয়েছি।

দিলীপ—তোমার কি আজও তা মনে আছে? উমা চুপ করিয়া রহিল। দিলীপ উমার হাত দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "উমা, তুমি বুঝতে পারবে না এ কি ব্যথা! তুমি সুখী হও—না না, আমি যাই।" বলিয়াই চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল। উমা তাহার হাত দু'খানা ধরিয়া বলিল, "দিনুদা, তোমার চা খাওয়া ত শেষ হয় নি, আর একটু বসো।"

দিলীপ বসিল না, উমার কাঁধে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"উমা, একটি কথা তুমি আমায় শুধু বল, তুমি সুখী হয়েছো, তুমি সুখে আছ?"

উমা—দিনুদা, ভেবে নাও, আমি সুখী হয়েছি।

দিলীপ—সত্যি, তোমার সেই দরদ, সেই স্নেহ কোথায় গেল? তোমার বুকের ভিতর আমার জন্য

এতটুকু স্থানও কি রাখনি? আমি বড় দুঃখী, ছেলেবেলা থেকেই দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি।"

এইবার উমা গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "তোমার এ সব কথার জবাব দেওয়া আবশ্যক মনে করি না। বিলুদা, পায়ে পড়ি ভাই—আর যেন পার'ছ না, তুমি এখন এসো।" বলিয়াই সে স্থানত্যাগ করিল। নিজের শয্যায় উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া কেবলই বলিতে লাগিল—ঠাকুর! ও বড় দুঃখী, ওর প্রাণে বল দাও, শান্তি দাও। এসে নিজেও কাঁদে, আমায়ও কাঁদিয়ে যায়।

বীণার বাড়ী

বীণা—কৃষ্ণা, কতবড় আঘাতই না তিনি সব দিক থেকে পেয়েছেন। আমি সব শুনেছি। অনিলবাবুর বোন উমাকে তিনি খুবই ভালবেসেছিলেন। আর সহ্য করতে না পেরে তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন।

কৃষ্ণা—বীণা, তুই আর এ-সব ভাবিস না। আমাদের রেজাল্ট শীগ্‌গিরি বেরুবে। পাশ নিশ্চয়ই করবি। তার পর মন ঠিক করে একটা কিছু করতে হবে।

বীণা—মন স্থির করে ফেলেছি ভাই। মা প্রায় তিন মাস হ'ল দেহত্যাগ করেছেন। সংসারে আমার কেউ নেই, আমার পৈতৃক বাড়ী, টাকা পয়সা সব gift করে দিয়েছি Y.M.C.A. এদিকে আমি গোপনে গোপনে নার্সিং-এর ট্রেণিং শেষ করেছি। আমাকে যেতে হবে বোম্বেতে মিলিটারী হাসপাতালে। আমি পরশু দিন রওনা হ'ব।

কৃষ্ণা—কেন তোর এই দুর্বুদ্ধি হ'ল?

বীণা—আমার সুবুদ্ধি হয়েছে ভাই—চল্, আমি সব গুছিয়ে নেব, তুই সাহায্য করবি।

দিলীপের Army Commission যাওয়ার দিন আসিল। কৃষ্ণনগর-কলেজ এবং অরফেন্‌জ মিশন্ হোষ্টেলের ছেলেরা তাহাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাইতে দল বাঁধিয়া হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। নরেনবাবু এবং উমাও গিয়াছিলেন। ফুলের মালার চাপে দিলীপ যেন চলিতে কষ্ট বোধ করিতেছিল। ঠিক গাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অনিল দিলীপকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। উমা বলিল, বিলুদা, পায়ের ধুলোটা দাও এবং ব্যাগ হইতে একছড়া বেলফুলের মালা বাহির করিয়া দিলীপকে পরাইয়া দিল।

দিলীপ গাড়ীতে উঠিয়াই মালাটি খুলিয়া সযত্নে রাখিয়া দিল।

বাঁশীধ্বনি করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্র। চতুর্দ্দিকে তাঁবুর ছাউনি পড়িয়াছে এবং দূরে পিরামিডের সারি দেখা যাইতেছে। মোমাছির ঝাঁকের মত আকাশে এরোপ্লেন ঘুরিতেছে। মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে বোমা পড়িতেছিল। দুই একখানা প্লেন বিকল হইয়া মাটিতে পড়িতেছিল। সে যেন এক ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা।

একটি তাঁবুতে দিলীপ বোমা বিস্ফোরণে আহত হইয়া পড়িয়াছিল।

বোমা বর্ষণ বন্ধ হইলে তাঁবু পরিদর্শন করিয়া আহতদের একস্থানে একত্রিত করা হইল।

আহতদের আফ্রিকা হাসপাতাল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া Hospital Ship-এ ভারতবর্ষে পাঠান হইতেছিল। সেই জাহাজে দিলীপও বোম্বে পৌঁছিল। মিলিটারী হাসপাতালে বীণা দিলীপকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল।

বীণা Duty র সময় এবং বিশ্রামের সময় অন্যান্য কাজ কোন রকমে শেষ করিয়া সব সময়টাই দিলীপের শয্যা-পার্শ্বে কাটাইত।

দিলীপ—বীণা, উমার চিঠিখানা ডাকে পাঠিয়েছো? আজ অসুখটা আরো বেড়েছে।

বীণা—হ্যাঁ, পরশুদিনই ডাকে দিয়েছি।

দিলীপ—আজ তা হ'লে পাবে। নিয়তির কি বিধান! শেষের দিনগুলিতে তোমার হাতের সেবাযত্ন পাওয়াই ছিল আমার অদৃষ্টে। তুমি আমায় অনেক দিয়েছো। আর আমি, আমি তোমার ফুলের মত নির্ম্মল প্রাণটাকে পায়ে দলন করেছি। (বীণার হাত-খানা নিজের কপালে বুলাইতে বুলাইতে) তোমার প্রতি কত বড় অবিচার করেছি তাই ভাবছি। আজ কেবলই মনে হচ্ছে—অতীতের দেনা-পাওনার কথা।

যারা বেয়ারাকে ডাক্তার ডাকিতে বলিয়া pulseটা ঘড়ির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে লাগিল।

অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া সে ডাক্তারকে আস্তে আস্তে বলিল—"Pulse is sinking" চোখের জল চাপিতে না পারিয়া সে দিলীপের কপালের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, "ওগো তোমাকে পেলাম বটে, কিন্তু এ-ভাবে পেতে তো আমি চাইনি।"

প্রায় এক বছর ঘুরিয়া গিয়াছে, দিলীপ, নরেন বাবু এবং ঊষাকে নিয়মিত চিঠি লিখিয়াছে। আজ ৩।৪ মাস তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পত্রিকাতে Lywiaর যুদ্ধের সংবাদ মাঝে মাঝে পড়া যায়, কিন্তু উহা হইতে অবশ্য কিছুই বোঝা যায় না।

সন্ধ্যার সময় ঊষা অর্গ্যানের সম্মুখে বসিয়া গান গাহিতেছিল, আর নরেন বাবু পড়িয়া পড়িতেছিলেন। গান থামিলে ঊষা বলিল, "কি এত পড়ছো? ও থেকে মাথা-মুণ্ডু কারোরই বোঝার সাধ্য নেই। আমি কেবল ভাবছি—তিন চার মাস দিলুদার চিঠি আসে নি। কেমন আছে, কোথায় আছে কে জানে? ঠিক সেই সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে "বাবু চিঠি" এই কথাটা শোনা গেল। উভয়ে চিঠির প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া চিঠিখানা দিয়া গেল। ঊষার নামে চিঠি, দিলীপ লিখিয়াছে—

Military Hospital, Bombay, 3rd Jan

ঊষা,

অনেক দিন তোমাকে আর চিঠি লেখা হ'য়ে ওঠেনি। ওপরের ঠিকানা দেখেই বুঝবে, আমি হাসপাতালে আছি। আমাদের ওপর প্রবলভাবে Air Raid হয় এবং একটি বোমা আমার তাঁবুর অতি নিকটে প'ড়ে ফেটে যায়—আমি আহত হয়েছি। ডাক্তাররা জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। আজ চার পাঁচ দিন হ'ল Hospital Shipএ ক'রে আমি বোম্বে এসে পৌঁছেছি। তুমি যখন আমার এ চিঠি পাবে তখন আমি এযাত্রার সব কিছু চুকিয়ে দিয়ে চ'লে গেছি।

এ সঙ্গে একখানা চেক্ পাঠাচ্ছি। তোমার জন্য একটি সোনার সিন্দুর-কৌটো তৈরী ক'রে নিও। তাতে লেখা থাকবে দিলুদা—আর বুড়োর স্মৃতির জন্য যা হয় একটা কিছু করো—এই আমার শেষ মিনতি। ইতি—

তোমার দিলুদা।

ঊষা নরেন বাবুর হাতে চিঠিখানা দিয়া সেই ঘর ত্যাগ করিল।

বৃহত্তর বঙ্গ গঠনের কথা

শ্রীসুশীলকুমার দাস

কয়েক বছর রাজনীতির জটিল চক্রান্তে পড়িয়া মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এই 'সুজলা সুফলা' বাংলাদেশ নির্মম ভাবে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ পশ্চিম বাংলা আজ একটি শীর্ণ, দুর্বল প্রদেশে পরিণত। এই দুইটি বর্ত্তমান বিভক্ত বাংলার সাধারণ অধিবাসী কথাবার্ত্তায়, চালচলনে এবং ঐতিহাসিক অতীত ঘটনাবলীতে এমন একটি কঠিন বন্ধনে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জুড়িয়া ছিল যে, তাহার এইরূপ একটি বিস্তীর্ণ কলেবর সহসা একটি অপ্রত্যাশিত তীক্ষ্ণ আঘাতে যখন বিদলিত হইয়া এক একটি স্বতন্ত্র ছিন্ন দেহাবশেষে পরিণত হইল, তখন এই আকস্মিক দুর্ভাগ্যের জন্য কেবল অদৃষ্টের অকরুণ ছলনাহীনতার কথাই মনে হয়। এরূপ নিরুপায় অবস্থায় বাংলার অতীত গৌরবের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিলে খণ্ডিত বাঙ্গলার সুফল লাভের কোনই আশা নাই। আজ আমাদের ভবিষ্যতের জন্য খণ্ডিত বাংলাকে আরো বৃহত্তর করিয়া তুলিবার প্রচুর আয়োজনের দিন সমাগত। এ আয়োজনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে ভারতীয় প্রতি

বাঙ্গালীর সাধ্যায়ত্ত অংশে গ্রহণ করিবার সচেষ্ট মনোভাব একান্তই প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া বাংলার সংলিষ্ট অধুনা অন্তপ্রদেশভুক্ত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি এই ছিন্ন কলেবরা পশ্চিম বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত হইলে ইহার আশাপ্রদ বিস্তৃতি বর্তমানাপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় পরিপুষ্ট হইয়া বৃহত্তর বঙ্গগঠনের প্রভূত সহায়তা করিবে।

পশ্চিম বাঙ্গলার বরাবর পূর্ব সীমানায় পূর্বপাকিস্থান (পূর্ববঙ্গ) ঐরূপ আকারে সীমারেখা লইয়া সংলগ্ন রহিয়াছে যে, তাহাতে পশ্চিম বাংলার পূর্বদিকের আপন সীমানার বাহিরে অতি সামান্ত ভূখণ্ড পাইবার তিলমাত্র আশা নাই—ইহা খুবই সত্য কথা। তাহার পশ্চিম সীমানালগ্ন বিহার প্রভৃতি প্রদেশস্থিত কোন্ কোন্ অঞ্চলের দাবী স্বীকৃত হইবার সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভাবনা—তাহাই স্থিরভাবে আধিকার দিনে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কারণ আজ পশ্চিমবঙ্গ ভারত ইউনিয়নের অন্তর্গত। এ ছাড়া ভাষার ভিত্তিতে সমগ্র ভারতে পৃথক ভাবে প্রদেশ সৃষ্টি করিবারই কথা স্বীকৃত হইয়াছে। একমাত্র এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালী প্রধান অঞ্চলগুলিই ভারত পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবার দাবী আমরা জানাইতে পারি।

পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমানায় যে অঞ্চলগুলি রহিয়াছে—তাহার ভিতর দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা দুইটী একত্রিত আকারে সংলগ্ন থাকিয়া অবশিষ্ট পশ্চিম বাংলা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় বাঙ্গলার দুইটী বিচ্ছিন্ন অংশের সংযোগ রক্ষা করিবার জন্ত একটি স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ডের আবশ্যকতা দেখা যায়। পশ্চিম দিনাজপুরের পশ্চিমাংশ এবং দার্জিলিং জেলার দক্ষিণ প্রান্ত ও জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণ—ইহাদের সহিত পূর্ণভাবে সংযুক্ত হইয়া আছে পূর্ণিয়ার সমগ্র পূর্ব অংশটি। এই ভূভাগটি সংযোগ রক্ষা করে বাঙ্গালার উত্তর অংশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিম অংশটি পূর্বতন মুঙ্গের জেলার কয়েকটি হিন্দীভাষী মহকুমা লইয়া গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্ব-অংশের অন্তর্ভুক্ত কিষাণগঞ্জ মহকুমা, সদর মহকুমার অধিকারী, কসবাদীঘি, আমৌর ও বৈসি থানা এবং আরারিয়া মহকুমার পলাশী থানার সম্মিলিতভাবে মোট আয়তন ২৪০০ বর্গমাইল বাঙালী প্রধান অঞ্চল হিসাবে সেন্সাস অনুযায়ীই গণ্য হইয়াছে। সুতরাং এই বিশেষ স্থানটুকু নিরপেক্ষ বিবেচনার সর্বদিক দিয়া পশ্চিম বাংলারই প্রাপ্য।

ইহার পর বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ জিলার পশ্চিম সীমানায় বিহার অন্তর্ভুক্ত সাঁওতাল পরগণা জেলার কথা ধরিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে সাঁওতাল পরগণা জেলাটি ১৮৫৬ সালে বীরভূম ও ভাগলপুর জেলা দ্বয়ের অনেকটা অংশ কাটিয়া লওয়ার ফলে বর্তমান আকার ধারণ করিতে পারিয়াছে। এই জন্ত এই জেলার পূর্ব অঞ্চলের সমস্তটাই বাঙালীর আবাস স্থানে পরিণত। এই অঞ্চলগুলির অন্তর্গত জামতাড়া মহকুমা, পূর্বদুমকা, পাকুড় ও উত্তরাঞ্চল পাকুড় এবং রাজমহল শাসনকালে বাঙ্গালার বিশিষ্ট স্থান বাঙ্গলার উল্লেখ যোগ্য। এই সমুদয় অঞ্চলের মোট আয়তনের পরিমাণ ২৭০০ বর্গমাইল এবং বাঙালী প্রধান বলিয়া অধুনা জ্ঞাত এবং সর্বত্র পরিচিত। ইহাকে পশ্চিম বাংলার ভাষার ভিত্তিতে দাবী করিবার কথা খুবই যুক্তিপূর্ণ।

তারপরে বিহার প্রদেশের মানভূম জিলার দাবীর কথা মনে হয়। এই জিলাটির সমগ্র লোক সংখ্যার প্রায় বারো আনা অংশই খাঁটি বাঙালী। কেবল ধানবাদ মহকুমার লোকসংখ্যার বিচার করিতে গেলে আপাত-দৃষ্টিতে হিন্দুস্থানীকে সংখ্যায় বেশী বলা যায়। কিন্তু এই হিন্দুস্থানী দলের বেশীর ভাগই অন্তান্ত প্রদেশ হইতে কর্মোপলক্ষে এখানে আসিয়া সাধারণত শ্রমিকরূপে কাজ করে এবং তাহাদের সাময়িকভাবে বাস করিবার রীতি বরাবরই প্রচলিত দেখা যায়। এই জনপদটিকে বাসস্থান হিসাবে তাহাদের দাবী করিবার মত বস্তুতঃ কিছুই নাই। ১৮৩৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই জিলাটি কখন বীরভূম অথবা অনেক সময় মেদিনীপুর জিলা কর্তৃক অনেক বৎসর যাবৎ পূর্ণভাবে শাসিত হওয়ার প্রমাণ এবং হিন্দুরাজত্বসময়ে বাংলার অন্তর্গত স্থান বলিয়া পরিচয়ের সাক্ষ্য ইতিহাসে

যথেষ্ট পাওয়া যায়। কাজেই লোক সংখ্যার অনুপাতে এবং ইতিহাসের পুরাতন নজীর হইয়া বিচার করিবার পর মানভূম জিলাকে কোনমতেই বিহার প্রদেশের মধ্যে ফেলিয়া রাখা সম্ভবপর হইবে না।

এখন আসাম প্রদেশের অন্তর্গত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলির দাবীর উত্থাপন প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের গোয়ালপাড়া ও কাছাড় জেলা দুইটীর কথা মনে হয়। গোয়ালপাড়া বাঙালী সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা এবং হিন্দুরাজত্ব-কালে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাংলার একটি অংশবিশেষ ছিল। তারপরে ইংরেজ সরকারের আমলে ইহা ১৮৭৪ সাল অবধি রংপুর জেলার সহিত যুক্ত থাকে। পরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসামের নবগঠনের সময়ে ইংরেজ শাসক ইহাকে আসামের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিবার জন্য যদৃচ্ছাবশে সংযুক্ত করে। তদবধি সময় হইতে অনন্যোপায়ভাবে এই বাঙালী প্রধান জিলা আসামের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ত্তমানে অসমীয়াদের প্রাদেশিক বিদ্বেষবহ্নিতে অবিরত পুড়িতেছে।

কাছাড় জেলাটীতেও ঠিক গোয়ালপাড়ার মতো সর্ব্ববিষয়ে বাঙালীর প্রাধান্য পুরোমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। জনসংখ্যার অনুপাতে, বাঙালীর মূলগত কৃষ্টি, সংস্কৃতিতে আজও কাছাড় বাঙালী-অঞ্চল বিশেষ। তাহার বহুদিনের স্বাতন্ত্র্য নির্বিচারে ক্ষুণ্ণ করিয়া অপর স্বার্থের জন্য ইংরেজ রাজ এই অঞ্চলটিও আসামের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়।

এখন বর্ত্তমানে প্রশ্ন এই যে, উক্ত অঞ্চল দুইটী পশ্চিম-বঙ্গভুক্ত হইলে তাহার যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। গোয়ালপাড়া জেলাটি জলপাইগুড়ির সহিত পাশাপাশি সংলগ্ন হইয়া থাকায় ভবিষ্যতে যাতায়াতের কোন অসুবিধাই ঘটিবে না। কাছাড়কে লইয়াই একটা সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। কারণ উহা কয়েকটী পাহাড়ের দ্বারা গোয়ালপাড়া হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে পড়িয়া আছে। এই পাহাড় কয়টির নাম গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়। উহারা পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় গোয়ালপাড়া ও কাছাড়কে সুবৃহৎরূপে সংযুক্ত করিয়া পশ্চিম বাঙালার ভবিষ্যৎ যোগা-যোগ রক্ষার প্রয়োজনীয় পথের সৃষ্টি করিবে—তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই পাহাড়গুলি বর্ত্তমান সময়ে আসাম প্রদেশের সম্পূর্ণ অধীন। অথচ এই পাহাড়-অঞ্চলের মোট প্রায় তিন লক্ষাধিক নানা জাতির মিশ্রিত পাহাড়িয়া অধিবাসীর ভিতর মাত্র দুই হাজারেরও কিছু কম সংখ্যক অসমিয়াদের বাস। এবং ইহার তুলনায় বাঙালীর সংখ্যা প্রায় চারগুণ বেশী। এরূপ ক্ষেত্রে আসামের কোন ক্রমেই এই পাহাড় অঞ্চলগুলি জনসংখ্যা-নুপাতে দাবী করিবার এতটুকু অধিকার নাই। বরং বাংলার সহিত এই পাহাড়িয়া অঞ্চল দুটী যুক্ত করিবার যথেষ্ট ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সত্য আছে।

উপরোক্ত অঞ্চলগুলির মোটামুটি আলোচনায় মনে হয়, বিহার ও আসামের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কারণে পশ্চিম বাংলার দ্রুত অন্তর্ভুক্তি হওয়া একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ বাংলার সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ভাষা সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য বৃহত্তর বঙ্গ গঠনের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। দ্বিতীয়তঃ, অধুনা বিহার প্রদেশস্থিত বাঙালী প্রধান অঞ্চলগুলির ন্যায়সঙ্গত উপায়ে প্রাপ্তির ফলে উক্ত দেশস্থিত খনিজ সম্পদের যথাসাধ্য ব্যবহারে মাতৃভূমি দিন দিন ঐশ্বর্য্যশালিনী হইবে। তৃতীয়তঃ—আসামের ঐ দুটী জেলা পূর্ব্ববঙ্গের সন্নিকটবর্ত্তী ও পার্শ্ববর্ত্তী হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গের নির্য্যাতিত আশ্রয় প্রার্থী হিন্দুদের কিয়দংশের বাসস্থানের অনায়াসে সঙ্কুলান হইতে পারে। আজ স্বাধীন ভারতে অন্ধকার ছিন্ন বাংলা তার পূর্ব্বতন গৌরব রক্ষার উপায়স্বরূপ ন্যায্য দাবী হিসাবে উক্ত অঞ্চলগুলি পাইবার আশা রাখে এবং স্বাধীন ভারতের জননায়কগণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাংলার সত্যকারের দাবী পূরণে অনতিবিলম্বে সচেষ্ট হইবেন বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

রূপলোক

এবার থিয়েটারগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। কারণ এখন আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে, এখন গঠনমূলক কাজ যাহাতে থিয়েটারের প্রচারের ফলে আমরা অনুসরণ করিতে পারি, তাহা থিয়েটারের প্রধান কাজ হইলেও সেইরূপ কিছুই হয় নাই। থিয়েটারগুলির স্বত্বাধিকারীগণকে আমরা বুঝাইয়া দিতে চাই, জাতি-গঠনই এখন আমাদের প্রধান কাজ এবং সেই কাজ সম্পন্ন করিতে রঙ্গমঞ্চের সহায়তা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আবার ইহাও দেখিতে হইবে, কেবল প্রচার-কার্য্য হইলেই হইবে না, কলাদক্ষতাবে নাটক রচনা করিতে হইবে, এবং যাহাতে প্রকৃতভাবে রসসৃষ্টি হয় সেইরূপই হওয়া চাই। আমরা মস্কো আর্ট থিয়েটারের সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেছি। এই রঙ্গমঞ্চের সহায়তায় সোভিয়েট রাশিয়া জাতির জাগরণ সম্বন্ধে অল্প সময় মধ্যে অসাধ্যসাধন করিয়াছে। আমাদের দেশেও থিয়েটারের সেইরূপই হওয়া উচিত, কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের যে কয়টি থিয়েটার চলিতেছে, তাহার মধ্যে কোনখানেই উক্ত বিশেষত্ব বিশিষ্ট নূতন কোন নাটকই অভিনীত হয় নাই।

বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় মূলধন—মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা নাটকের অভিনয়ে যাহা অর্জ্জন করিয়া শ্রীরঙ্গম থিয়েটার সাধারণের নিকট জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলিয়াছে। অতঃপরে সেই রঙ্গভূমিতে স্বয়ং শিশিরবাবু সিরাজের ভূমিকায় নামিবেন ঘোষণা করিয়াও নিজের কথার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তাহার ন্যায় আচার্য্যের প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয় নাই। অনেকেই পূর্ব্বাহ্নে টিকিট করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু টাকা ফেরত আনিতে বাধ্য হইয়াছেন। অভিনয় করিতে কেন পারিলেন না, একটা কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত শিশিরবাবু দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। দর্শক এবং সাধারণকে এরূপ তাচ্ছিল্য করা তাঁহার পক্ষে কি উচিত? যাহা হউক, বলেন কি না করেন, তাহার ইচ্ছা, কিন্তু শ্রীরঙ্গমের গভীর ভিতরে তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিগণ যে প্রচার করিত—'সিরাজদ্দৌলা' নাটকই নয়, সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছে স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রতিষ্ঠিত "গিরিশ পরিষদ"। সুষ্ঠু ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ে এই সম্প্রদায় দেখাইয়াছে যে, সিরাজদ্দৌলা একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক আর উহা সু-অভিনীত হইলে দর্শকমণ্ডলী গিরিশচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা না লইয়া ফিরিতে পারে না।

শিশিরবাবুর রাম, নাইকেল, আলমগীর প্রভৃতি এখন আর ভাল লাগে না। তাহার কারণ, আজকাল একদল যুবক এমন কলাদক্ষতার সহিত স্বাভাবিক আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক অভিনয় করিতে সক্ষম যে, সে-যুগে প্রথম নির্ব্বাক বায়স্কোপ চটকের জন্য রঙ্গমঞ্চে যাহা ভাল লাগিত, আজ তাহা নিতান্তই অসার ও অস্বাভাবিক মনে হয়। অথবা হাত-পা নাড়া এ-যুগেও শিশিরবাবু যে ছাড়িতে পারেন নাই, তাহা সে-দিন বাঙ্গলার গভর্ণর শ্রীরাজাগোপালাচারীর সভাপতিত্বে গিরিশ-প্রতিভার সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীরাজাগোপালাচারী বাঙ্গালী না হইয়াও মহাকবির প্রতি যে নিরাবিল শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃতির অনুরূপই হইয়াছে। কিন্তু শিশিরবাবু অঙ্গভঙ্গী ও অযথা রহস্যপ্রিয়তার এমনই বিরক্তিকর আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, অনেক দর্শক বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। অনুবাদও স্থানে স্থানে এমন বিকৃত হয় যে, রাজাজীকে একাধিকবার সতর্ক করিতে হইয়াছিল। অনেকবার তিনি বলেন, "Say, what I said", "আমার কথার কদর্থ করিবেন না।" একজন ভিন্ন দেশবাসীর নিকট এ-ভাবে বাঙ্গালী চরিত্রের পরিচয় দেওয়া খুবই গর্হিত হইয়াছে।

আর একটী কথা বলা বড়ই প্রয়োজন। মহাকবি নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে শিশিরবাবু নিজের থিয়েটারে দাঁড়াইয়া যে অসম্মানজনক উক্তি করিয়াছেন, তাহা প্রতিবাদ করিয়া জিনিষটা আরও ফেনাইয়া তোলা উচিত না হইলেও নির্ব্বাক থাকা সঙ্গত নয়। তিনি বলেন—

"গিরিশচন্দ্র একজন Play-wright মাত্র বাঙ্গালাদেশে নাটকই হয় নাই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ দুই একখানি চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের সহিত সম্পর্ক না থাকায় তাঁহার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে।"

নিশিরবাবু কয়খানি নাটক পড়িয়াছেন যে, এইরূপ অর্ব্বাচীন উক্তি করিতে সাহস করেন?

আর নাটক রচনা দূরে থাকুক, নাটক বুঝিতেও যে তিনি কি বিশেষত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও আমরা জানিতে চাই।

যে স্থানের স্বত্বাধিকারী মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রতি এত অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত নয়, তাঁহার বাড়ীতে যাহারা প্রতিবৎসরে সভা করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে তাঁহাকে তোষামোদ করিতে যায়, তাঁহাদের কি বিন্দুমাত্র আত্মসম্ভ্রম-বোধ নাই?

যাহা হউক, এবার রঙমহলে 'রাণাপ্রতাপ' নাটক করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। রাণাপ্রতাপের ভূমিকায় মহীন্দ্রবাবু খুব সুদক্ষতা অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার বাচনের প্রতাপে আমরা তৃপ্ত হইলেও (অবশ্য তাহাতে তাঁহার দোষ নয়), রাণাপ্রতাপে তৃপ্ত হইয়াছি। তাঁহার বাচন-ভঙ্গিতে কিছু ত্রুটি থাকিলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে, তিনি অন্যান্য ভূমিকার মতই এক্ষেত্রেও যথার্থ ভাবসমৃদ্ধ অভিনয় করিয়াছেন। রঙমহলের মর্য্যাদা রাখিতে তিনি যে যথেষ্ট চেষ্টা করেন, তাহাতেই তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। শরৎবাবু শক্তসিংহের ভূমিকায়ও ভাল অভিনয় করিয়াছেন। রাণীবালার মেহেরউন্নেসার অভিনয় খুব ভাল হইয়াছে। আর ভাল হইয়াছে ছোট ভূমিকায় শ্রীরবি রায়ের পৃথ্বীরাজ ও শ্রীসন্তোষ সিংহের আকবর।

আকবরের মেকআপ ভাল হইয়াছে এবং অভিনয় বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে।

রঙমহল কুদিরামের অভিনয় করিয়াও প্রশংসাভাজন হইয়াছে।

ষ্টার থিয়েটারের রাজসিংহ এবং দুর্গেশনন্দিনী পূর্ব্বের মত চলিতেছে এবং বেশ লোক সমাগমও হয়। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয়, উহার স্বত্বাধিকারী স্বর্গত উপেন্দ্র কুমার মিত্র মহাশয় আর ইহ সংসারে নাই। নাট্যশালার ইতিহাসে তাঁহার অবদান বড় সামান্য নয়, আর তাঁহার ন্যায় এমন ধীর, শান্ত ও সামাজিক ব্যক্তি খুব বিরল দেখা যায়। তাঁহার চরিত্রও যেমন নির্ম্মল ছিল, আবার তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতিও খুব প্রশংসনীয় ছিল। তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছিলেন এবং তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে আমরা আত্মীয় বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। তাঁহার আত্মার শান্তি ও সদ্গতি কামনা করিতেছি।

মিনার্ভা থিয়েটারে কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমতীতে আমরা নায়কের ভূমিকায় শ্রীতরুণ মজুমদার ও শ্রীমতীর ভূমিকায় শ্রীমতী সন্ধ্যারাণীর অভিনয়ে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। শিবকালী বাবুর ও ধনুকভাঙ্গার অভিনয়ও বেশ ভালই হইয়াছিল। তৎপরে আর অন্য নাটক দেখিবার সুযোগ হয় নাই। শুনিয়াছি 'কালো টাকা' ভালই হইয়াছিল। আশা করি শীঘ্রই একখানি নূতন নাটকের অভিনয় হইবে।

কালিকার 'অতঃপর' সাফল্যের সহিত অভিনীত হইতেছে। আগামী বারে আমরা উহার সমালোচনা করিব।

সাময়িকী

কবি ব্রত

"দিন ডাক পঁচিশে বৈশাখ।"

ইহা কেবল কবি-উক্তি নহে। বাঙলা বর্ষ-পঞ্জীর এই স্মরণীয় দিনটি সত্য-সত্যই সত্য-জগতের সকল বিদগ্ধজনকে আহ্বান করিয়া বলে :

"আজ হইতে ৮৮ বৎসর পূর্বে আমার এই পুণ্য-তিথিতে এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল,—সেই মহাপুরুষকে তোমরা স্মরণ করো।"

বাঙালীকে ডাক দিয়া এই তিথি আহ্বান জানায় :

"তোমার ভাষার প্রাদেশিকতাকে বিশ্বরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন যে মহা রূপকার, সেই রবীন্দ্রনাথ আমারই এই তিথিতে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তোমার ঐতিহ্য, তোমার সংস্কৃতি, তোমার চিন্তার আদর্শকে তিনিই উদ্দীপিত করিয়াছেন। তোমার উজ্জীবিত ঐতিহ্য তাই আজ পৃথিবীর সংস্কৃতি-সমাজে বরেণ্য। স্মরণ করো তাঁহাকে, উদ্‌যাপিত করো আমাকে।"

ভারতবাসীকে ডাকিয়া এই তিথি বলে :

"ভারতের সত্যকার পরিচয় তাহার চিন্ময় প্রকাশে, তাহার অবিভক্ত ভাবমানসে, তাহার আইডিয়া-রূপ অরূপ সত্তায়। ইতিহাসের মূল হস্তাবলেপে ভারতের ভৌগোলিক দেহ বহুবার ক্ষত বিক্ষত, বহুবার রাজনৈতিক স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার যূপকাষ্ঠে ভারতের মৃন্ময় অভিন্নতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের অক্ষত ভাব-মানসকে কেহ কোন দিন আঘাত করিতে পারে নাই। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতের এই বিধৃত সত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যিনি, তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাই, স্মরণ করো ভারতের এই সত্তাকে, স্মরণ করো সেই উজ্জীবককে, পালন করো আমাকে।"

পৃথিবীর মানুষকে এই পঁচিশে বৈশাখের পুণ্যতিথি আহ্বান জানাইয়া বলে :

"আঘাতের পর আঘাত পাইয়া তুমি নিজের ভবিতব্য সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছ; অকল্যাণ ও পশুধর্মের অন্তহীন উন্মত্ততা তোমার সাধের সভ্যতা-বিগ্রহকে ভাঙিয়া খান্‌-খান্‌ করিতেছে; তাই শোচনীয় সংশয়ে আজ তোমার সকল শুভেচ্ছা পঙ্গু। কিন্তু হতাশ হইও না, তোমার বিশ্বাসকে অক্ষত রাখো। শোন, আমার এই তিথিতে জাত সত্যদ্রষ্টা ঋষি কী বলিয়াছেন—"আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি; পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অবিকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট, সত্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে-বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা ক'রবো। আশা ক'রবো, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর, একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।

হে পৃথিবীর মানুষ, জীবন্দ্রষ্টার এই নিরুপম জীবন-বাণে আস্থা রাখো। 'নিখানি দুরিতানি পরাসুব'—বিশ্বপাপের যে ভয়ঙ্কর মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়াছে, সংশয় ক্ষিন্ন আত্মবিশ্বাসে সেই বিশ্বপাপকে আঘাত করো। স্মরণ করো, এই বিশ্বাসের বজ্রবাণী শুনাইয়াছেন যিনি, সেই মহামানবকে, আর উদ্‌যাপিত করো আমাকে—তাঁহার জন্মতিথি পঁচিশে বৈশাখকে।

গান্ধীজীর কংগ্রেস

গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণের পর মাত্র সাড়ে তিন মাসের মত সময় অতিবাহিত হইয়াছে। কাজেই ইতিমধ্যেই মহাত্মাকে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি এ-কথা বলিবার মত ধৃষ্টতা বোধ করি আমাদের কাহারই নাই। বস্তুতঃ গান্ধীজীকে যে আমরা ভুলি নাই এ-কথা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা ভারতবাসীরা মানুষের সাধ্য প্রায় সবরকম অনুষ্ঠানই পালন করিয়াছি : গান্ধীজীর মহা-প্রয়াণের

দীর্ঘ একমাস সময় পর্য্যন্ত আমাদের বক্তাগণ বেতারযোগে নানাপ্রকার ভাবের অভিব্যক্তিতে গান্ধীজীর প্রসঙ্গ (সেই সঙ্গে নিজেদেরও) বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন; গান্ধীজীর জীবনী ও বাণীর বিষয়ে বহুদিন পর্য্যন্ত আমাদের সমুদয় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা আমরা অলঙ্কৃত করিয়াছি; জীবনকাহিনী রচনা করিবার প্রতিযোগিতা-মূলক অনুপ্রেরণায় আমাদের দেশের লেখক ও লেখকমন্য ব্যক্তিবৃন্দ কাগজের বাজার গরম করিয়া দিয়াছেন; গান্ধীজীর প্রিয় 'রামধুন' গীত আমরা আবাল-বৃদ্ধ বনিতা ভারতবাসীরা আমাদের প্রাণপ্রতিম সিনেমা-সঙ্গীতকেও ভুচ্ছ করিয়া দীর্ঘ দুইমাস যাবৎ ঘাটে মাঠে বাটে (এমন কি সম্ভবতঃ বিবাহ-বাসরেও) গান করিয়াছি। তাঁহার নামে রাস্তা খুলিয়াছি এবং সম্প্রতি লোকাল-পাট খুলিবারও আয়োজন করিতেছি; তাঁহার নামে আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে ঘাট স্থাপিত হইতেছে; এবং অধুনা বিপুল উদ্যমে গান্ধীস্মৃতি তাণ্ডারের জন্য চাঁদা তোলা হইতেছে। শুধু তাই নয়, এই দীর্ঘ (?) সময়ের পরেও গান্ধীজীকে গান্ধীজীর কংগ্রেসও বিস্মৃত হয় নাই—তাহার প্রমাণ গত ২৮শে ও ২৯শে এপ্রিল তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনটী যে মণ্ডপে বহু আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইল, সেই স্থানটিরও নামকরণ করা হইয়াছিল 'গান্ধী-নগর'।

'গান্ধীজীর কংগ্রেস'—আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে এবম্বিধ বিশেষণ প্রয়োগে আশা করি আমাদের পাঠকদের তরফ হইতে কোনো আপত্তি হইবে না। সত্য কথা বলিতে কি, গান্ধীজী কংগ্রেসে সক্রিয় ভাবে যোগদান করা অবধি, বিশেষতঃ ১৯২০ সাল হইতে কংগ্রেসকে আমরা গান্ধীজী হইতে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবিতে পারি না। তদবধি মহাত্মাজীর কংগ্রেস ও আদর্শ একাত্ম হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার জীবনদর্শন, তাঁহার সংগঠনমূলক কর্ম্মপন্থা কংগ্রেসের বহুবিধ কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে রূপ-ময় হইয়া উঠিয়াছিল—এক কথায় গান্ধীজীর আত্মা ও কংগ্রেস ছিল অভিন্ন বস্তু।

অথচ এ কথা আজ আর কাহারই অবিদিত নাই যে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের মৃত্যুই কামনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে কংগ্রেসের একমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন—১৫ই আগষ্টের পর ভারতের পক্ষে কার্য্যতঃ সেই প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, অতএব এক্ষণে আর কংগ্রেসের কোনরূপ রাজনৈতিক সত্তা বজায় রাখার প্রয়োজন করে না। কংগ্রেস এখন পরিপূর্ণভাবে লোক-সেবা-সঙ্ঘে পরিণত হোক।

সত্যকথা বলিতে গেলে রাজনৈতিক দল বলিতে যাহা বুঝায়, গান্ধীজীর কংগ্রেসের স্বরূপ কখনও তাহা ছিল না। যদিও সর্ব্ববিধ নির্ব্বাচন যুদ্ধে কংগ্রেস প্রত্যক্ষ ভাবেই অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তবু কংগ্রেস ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে ভারতবাসীর পক্ষে ছিল একটা সর্ব্বাঙ্গীন ভারতীয় সামাজিক আন্দোলনের মত—ভারতের ঔপনিবেশিক সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন সাধনই ছিল কংগ্রেসের আদর্শ। সেই আদর্শের মধ্য দিয়াই আমরা কংগ্রেসকে চিনিয়াছিলাম, আর সেই আদর্শের জন্যই ভারতের সমুদয় প্রগতিশীল ব্যক্তি ও দল ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের জন্য কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল।

কিন্তু ১৫ই আগষ্টের পর হইতেই কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্ম্মকর্ত্তাদের কার্য্যাবলীর মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে যাহাতে উপরোক্ত আদর্শের প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে।

আজ প্রায় নয় মাস হইল ভারত স্বাধীন হইয়াছে কিন্তু কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত আদর্শসমূহের কোনটীই আজপর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নাই। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে উহার ব্যতিক্রমই লক্ষিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার লোভ,

দুর্নীতি ও হিংসার বিরুদ্ধেই ছিল গান্ধীজীর জীবন ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। অথচ ঐগুলিই যেন আজ ঝোট বাঁধিয়া আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। গান্ধীজীর জীবদ্দশাতেই কংগ্রেস-নেতৃবর্গের মধ্যে পদাধিকার লইয়া রীতিমত প্রতিযোগিতার লড়াই জমিয়া উঠিয়াছিল। অস্বাস্থ্যকর এই ক্ষমতালোলুপতার মধ্যে গান্ধীজী তাঁহার অতিসাধের কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অকালমৃত্যুই দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই ব্যথিত হৃদয়ে তিনি ইহার বিরুদ্ধে নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আজ সেই কণ্ঠ চির নীরব। নৈতিক অভিভাবকহীন কংগ্রেস-নেতৃত্ব আজ তাই ক্ষমতার লড়াইয়ে মাতিয়া উঠিয়াছে। প্রদেশে প্রদেশে সুরু হইয়াছে মন্ত্রীত্ব লইয়া কারাকারি আর উপদলির চক্রান্তের বক্রকুটীল নেপথ্যলীলা। স্বার্থান্বেষী নেতৃবর্গের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্র আর মুনাফা-শিকারী চোরাকারবারির দল জনগণের জীবনকে আজ এমন দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে যে, স্বাধীনতা সম্বন্ধেই আজ তাহারা সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে। অন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহের দুর্মূল্যতা সাধারণ মানুষের জীবনে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারই সাথে সাথে দেখা দিয়াছে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বেকার সমস্যা। গান্ধীজীর কৃষক-মজুর-প্রজারাজের স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়া গিয়াছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সন্ত্রস্ত ও বিভ্রান্ত জনসাধারণের মনে দেখা দিয়াছে নিদারুণ অসন্তোষ আর সন্দেহ।

নেতৃবর্গের অক্ষম নিষ্ক্রিয়তা অথবা সক্ষম স্বার্থপরতা যাহাই কেন বর্ত্তমানের এই শোচনীয় অব্যবস্থার জন্য দায়ী হউক না কেন, এ কথা অনস্বীকার্য্য যে জনসাধারণের মধ্যে সত্যই অসন্তোষের প্রকৃত কারণ রহিয়াছে। আর সেই অসন্তোষের সুযোগ লইয়াই তথাকথিত বামপন্থী দলগুলি দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছে। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে কংগ্রেসের বর্ত্তমান অনুসৃত নীতিই পরোক্ষভাবে উহাদের ক্রম-প্রসারের সহায়তা করিতেছে। অথচ সমস্যার প্রকৃত সমাধানের দিক দিয়া না গিয়া অভিনাঙ্গ প্রভৃতির সাহায্যে বামপন্থী দলগুলিকে দমন করিয়া বর্ত্তমান সংকট হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে সংকট তো অবসান হয়ই না, উপরন্তু দমননীতি প্রয়োগের ফলে নেতৃবর্গ নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের সহানুভূতি হারাইয়া ফেলেন।

ভারতবর্ষের সম্মুখে আজ এক ভীষণ অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। যন্ত্র-শিল্পের প্রসারের অনিবার্য্য পরিণতিরূপে অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও ধন ও জনসংখ্যার বিরোধ আজ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের ফলে আমাদের স্বকীয় অর্থনীতি বলিয়া কিছুই আর আজ অবশিষ্ট নাই। ইচ্ছাতেই হউক কি অনিচ্ছাতেই হউক অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও আমরা পুরাপুরি বিদেশীয়দের অনুকরণ করিয়াই আসিতেছি। ফলে আমাদের দেশের যাবতীয় সম্পদের চাবিকাঠিই আজ মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর আয়ত্তাধীন। ব্যক্তিগত মুনাফাই যে অর্থনীতির মূল কথা তাহার আওতায় থাকিয়া যে মানুষের দারিদ্র্য বিদূরিত হইতে পারে না—ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলিই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই নীতির ফলে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই বজায় থাকে না:—। মুনাফা-লুণ্ঠন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য—এবং ইহার আওতায় উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া শ্রমিকের অপর কোন পরিচয় অথবা সামাজিক সত্তাই থাকে না। সর্ব্বব্যাপী দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা আর তাহারই আনুসঙ্গিক রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সংঘাতই উহার একমাত্র পরিণতি।

এই নীতির ব্যর্থতা গান্ধীজী বহু পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন আর তাহা পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বৃহদায়তন শিল্পের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বুঝিয়া-ছিলেন যে ভারতবর্ষের মত গ্রাম্যসভ্যতা-প্রধান দেশের পক্ষে যন্ত্র শিল্পের প্রসার কখনই সুফল-প্রসূ হইতে পারে না। ভারতবর্ষের আত্মিক শিক্ষা যন্ত্র-শিল্পের পরিপন্থী। Plain living and high thinking—ভারতবর্ষের চিন্তারাজ্যে ইহাই মূল কথা। যন্ত্র-শিল্প

এই বিষয়ে ভারতবাসীদের সত্যিকারের কোন সাহায্যই করিতে পারে না। উপরন্তু নূতনতর অভাব সৃষ্টি করিয়া তাহাদের জীবনে অধিকতর দুঃখ বহিয়া বহন করিয়া আনিবে।

তাই একদিকে তিনি যেমন চাহিয়াছিলেন যন্ত্র-শিল্পের সংকোচ সাধন করিতে—তেমনি অপর দিকে উহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল কৃষি ও কুটীর শিল্পের প্রসারের দিকে। এই দুটীকে তিনি পরস্পরের পরিপূরক হিসাবেই দেখিতেন। তাহার একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, কেবল মাত্র—তাঁহার এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারাই ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ সত্যিকারের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। কৃষি, কুটীর ও বৃহৎ-শিল্পের এইরূপ পারস্পরিক সামঞ্জস্যযুক্ত অর্থনীতির দ্বারাই শুধু সত্যিকারের স্বাধীন ও সুখী ভারতবর্ষ কৃষক মজদুর প্রজারাজত্বের মধ্য দিয়া তাহার আদর্শ, রাম-রাজ্যের স্বপ্নকে সফল ও সার্থক করিয়া তুলিতে পারে।

গান্ধীজীর রাজনীতি ছিল তাঁহার এই অপূর্ব অর্থ নীতিরই বাহক মাত্র। ইহাকে বাদ দিয়া কেবল মাত্র তাঁহার রাজনীতিকে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা কায়াহীন ছায়ার মতই অবাস্তব ও অকেজো। অথচ গত ২৯শে এপ্রিল তারিখের সংশোধিত কংগ্রেস গঠন তন্ত্রে আমরা সেই প্রচেষ্টাই সভয়ে লক্ষ্য করিয়াছি। উহা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বার্থান্বেষীর ক্ষমতা লাভের যন্ত্র হিসাবে রূপান্তরিত করিবার প্রয়াস বলিয়াও অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন।

যে সব নেতৃবৃন্দ এতদিন যাবৎ দেশবাসীগণকে ক্রমাগত মহাত্মাজীর আদর্শের কথা স্মরণ করাইয়া আসিয়াছেন, আজ কি তাঁহারা নিজেরাই তাঁহার সেই আদর্শ বিস্মৃত হইতে চলিয়াছেন?

দুঃখ দৈন্য প্রপীড়িত অগণিত নরনারী আজ তাহাদের প্রিয়তম নেতৃবৃন্দের মুখের দিকে ব্যাকুল আগ্রহে তাকাইয়া রহিয়াছে এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায়। তাঁহারা যেন কংগ্রেসকে—গান্ধীজীর কংগ্রেসকে অকাল মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া না দেন।

রাজা ও উজীরের গল্প

গত মাসে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য খবর পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি সংবাদ হইতেছে এই যে আমাদের 'রাজা' অর্থাৎ প্রদেশপাল শ্রীযুক্ত রাজাজী ভারতের ভবিষ্যত গভর্ণর জেনারেলের পদের জন্য মনোনীত হইয়াছেন। রাজাজী বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্, কালোপযোগী রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার মত তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কজ্ঞান কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজী ব্যতীত আর কাহারোই ছিল না। তিনি সুবক্তা, শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসীম। আমরা তাঁহার এই পদোন্নতিতে বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেছি।

দ্বিতীয় খবরটি এর চেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ; এটি হইল আমাদের প্রদেশের সাম্প্রতিক মন্ত্রীবদলের নিষ্ফল প্রচেষ্টার বৃত্তান্ত। উক্ত প্রচেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছিল গত ২২শে এপ্রিল তারিখ হইতে। সেই তারিখে বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস পার্লামেন্টারি দলের পক্ষে সব সমস্ত স্বাক্ষরিত একটি পত্র পান। পত্রটিতে উক্ত স্বাক্ষরকারিগণ ডাক্তার ঘোষকে জানান যে "বর্ত্তমান মন্ত্রীসভাই ক্রমেই কংগ্রেসের পবিত্র আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন (যদিও আমরা দেশবাসীরা সেই আদর্শের স্বরূপ কী সেকথা তাঁহাদের কাছে জানিতে পাই নাই)—অতএব বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা নূতন করিয়া গঠন করা হোক এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষকে সেই নবগঠিত মন্ত্রীসভার নেতৃত্বে গ্রহণ করা হোক।'

পরিষদ সদস্যদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত এইরূপ পত্রাঘাত ঘটিত মন্ত্রীবদলের ঘটনা আমাদের প্রদেশে আরও একবার ঘটিয়াছে, এবং সেই খবর এখনও আমাদের কাছে বাসি হইয়া যায় নাই, কাজেই সেই নাতিপুরাতন ঘটনাটি আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তাঁহার মন্ত্রীসভা কংগ্রেসের আদর্শানুগ ছিল বটে, কিন্তু উহা বড় দুর্ব্বল, বড় বেশী একদলভুক্ত ছিল সুতরাং

মন্ত্রী-সভার পরিধি বিস্তৃত করিয়া এবং প্রয়োজন হইলে অকংগ্রেসী যোগ্যব্যক্তিরও হাতে মন্ত্রিত্ব অর্পণ করা হোক্। ডক্টর ঘোষের সমর্থকদের সংখ্যা সে সময় পরিষদে অধিক ছিল না। ফলে ডক্টর বিধান রায়ের মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা উক্ত ঘটনার মাত্র এই প্রসঙ্গটিরই কথা স্মরণ করিতে চাহিতেছি না। আমাদের মুখ্য স্মরণীয় বিষয় এই মন্ত্রীবদল করিবার প্রক্রিয়াটির বিষয়।

মন্ত্রীবদলের বিধিটা গণতন্ত্রের লোকাচার। কিন্তু সেটা নিয়মতান্ত্রিক। এক মন্ত্রীসভা যদি দেশের শাসন-পরিচালনার পক্ষে অযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে তাহাদের চরম বিচার করিবেন সমুদয় পরিষদ্-গৃহ। মন্ত্রীদের দোষত্রুটির কথা প্রকাশ্যভাবে পরিষদে উপস্থাপিত হইবে। উহার পক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্ক হইবে। পরে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনুরূপ প্রয়োজনবোধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিয়া সমুদয় সদস্যের ভোট গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ঘোষ-মন্ত্রীসভা সেই গণতান্ত্রিক নিয়মে পরিবর্তিত হয় নাই, হইয়াছিল একটি বিশেষ দলের একটি বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের গোপন মতানতের দ্বারা। কাজেই আমরা যাহারা দেশের সাধারণ অধিবাসী, যাহাদের সমর্থনে পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হইয়াছেন এবং যাহাদের শুভাশুভ সাধনই প্রকাশ্যভাবে মন্ত্রীসভার একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ, তাহারা পূর্বোক্ত মন্ত্রীবদলে আসল কারণটা কোনোদিনই জানিতে পারি নাই। কেবল জানিতে পারিয়াছি যে, পরিষদের কংগ্রেসীদলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাই এই প্রদেশের ভাগ্যবিধাতা ও প্রকৃত ক্ষমতার মালিক, তাঁহারা যাহারই প্রতি কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করিবেন—তাহারাই মন্ত্রীত্বের গদী লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

ডক্টর রায়ের মন্ত্রীসভাও এই নিয়মেই পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু ডক্টর ঘোষের মত বর্তমান প্রধান মন্ত্রী নির্বাচন নহেন, পরিবর্তনকামীদের চেয়ে পরিষদে তাঁহার সমর্থকদের দলটা ভারী—সেই, হেতু শেষ পর্যন্ত এবারকার প্রচেষ্টাটি বিফল হইয়াছে। বারবার মন্ত্রীবদলের বিপদ হইতে আমরাও সাময়িকভাবে রক্ষা পাইয়াছি।

কিন্তু তবু এই প্রসঙ্গে আমাদের তরফ হইতে একটি কথা বাকি থাকিয়া যায়। ঘোষ মন্ত্রীসভার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল নিঃশব্দে এবং বিনা প্রতিবাদে। তাই আমরা সেই পরিবর্তনের কারণের কোনো সন্ধানই পাই নাই। কিন্তু এবারে আংশিকভাবে পাইয়াছি। তাহার কারণ, এবারের ব্যাপারটার প্রথমদিকে অধিষ্ঠিত মন্ত্রীসভা এবং পরিবর্তনকামীদের দল প্রায় সমান-সমান ছিল বলিয়া একটি ছোটখাটো নির্বাচন-যুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে। অবশ্য ঐ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধটি কেবলমাত্র সংবাদপত্রীয় প্রচার ও স্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবু সেই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হইতেই আমরা আমাদের পরিষদীয় কংগ্রেস-সেবকদের সম্বন্ধে একটা বিরাট তথ্যের আভাষ পাইয়াছি। আমরা আভাষ পাইয়াছি যে পুনর্নির্বাচন না হওয়া অবধি আমাদের এই হতভাগ্য প্রদেশে কখনও সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্ট কার্যকর হইবে না; আভাষ পাইয়াছি যে কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন উপদল রহিয়াছে এবং এই সব উপদলভুক্তরা 'বাজার-ঘটি' সংকীর্ণ স্বার্থ অর্থাৎ স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত; আভাষ পাইয়াছি যে যাহারা আমাদের নেতারূপে বৃত হইয়াছেন তাহারা সবাই কিছু গলদমুক্ত নহেন, আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমুদয় সমস্যা, আমাদের ভাত-কাপড়ের সমস্যা, কালোবাজার দমন করিবার সমস্যা, অতিরিক্ত শোষণ ও মুনাফা লোপ করিবার সমস্যা সম্বন্ধে মিটিং-বাজ নয়। মৃত্যুর পূর্বে গান্ধীজী, বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিবৃন্দ সম্বন্ধে প্রকারান্তরে এই অভিযোগই করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীকে আমরা হারাইয়াছি; কাজেই তাঁহার সেই অস্ফুট অভিযোগ, যাহা ক্রমেই প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে, —সেই অভিযোগের আজ বিচার করিবে কে?

একটি বিদেশী হানাদার

গত মাসে কলিকাতা সহর একটি বিদেশী আততায়ীর ব্যাপক আক্রমণের আশঙ্কায় প্রায় দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিল; আমরা সহরবাসীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম। কাগজে কাগজে সেই হানাদারের কথা,

সেই হানাদারকে প্রতিরোধ করিবার বহুবিধ বিধান, অস্ত্রশস্ত্রের হিসাব, প্রতিরোধ-বাহিনীর সেনাপতিদের সম্মেলন ও বিবৃতি, আর লোকের মুখে মুখে কেবল এককথা 'আজ বজন'—অর্থাৎ কতজন সেই হানাদারের মুখে পড়িল!—আমরা প্লেগের কথা বলিতেছি।

বিশেষজ্ঞদের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে প্লেগ ব্যাধিটি আমাদের সুজলা বাঙ্গলা দেশের সজল হাওয়ায় নাকি তেমন ভাবে সুবিধা করিতে পারে না। বহর পঞ্চাশেক আগে এদেশে একবার উহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বটে এবং সেই সময় বঙ্গবাসীদের মধ্য হইতে উহার শিকারও কিছু জুটিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর বাঙ্গলা দেশে দেখা দেয় নাই, বরঞ্চ দূরে দূরেই আছে। সেই কারণে প্লেগ আমাদের বঙ্গবাসীদের কাছে কিছুটা উপকথার দৈত্যের মত—উহার বিরাট ধ্বংসলীলার বৃত্তান্তই শুনিয়াছি, কিন্তু উহাকে চোখে দেখি নাই। এবারে উহাকে চোখে দেখিবার আকস্মিক সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল—জানিনা এখনও সেই সম্ভাবনা নির্মূল হইয়াছে কি না—তাই আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। দিনকতক হইল এক্ষণে সেই আতঙ্ক কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি এখনও আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। আজও ভীতিমত ভটস্থ হইয়াই দিন কাটাইতেছি।

হয়তো শেষ অবধি প্রমাণিত হইবে যে, আমরা নিতান্ত বোকা বলিয়াই এতটা ভয় পাইয়াছিলাম এবং অবিক্রের ডি-ডি-টির উৎপাদকদের রাতারাতি লাল করিয়া দিয়াছিলাম, তবু আমাদের বর্ত্তমান ভীতিকে একেবারে অস্বাভাবিক বা অবাস্তব বলিয়াও আমরা উড়াইয়া দিতে পারি না। প্লেগ ব্যাধির নারকীয় মারাত্মকতাকে পুরাপুরি ভাবে প্রকাশ করিবার মত শব্দ ও বিশেষণ যোগাড় করা দুষ্কর। প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান যুগ অবধি পৃথিবীর বিস্তৃত ইতিহাসে এমন বহুঅধ্যায় আসিয়াছে যখন এই কালান্তর মানুষের সমাজের এক একটা বিরাট অংশকে অল্পকালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেন্ট খণ্ডে এই ব্যাধির একাধিক উল্লেখ আছে। কোন কোন প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থেও এক-একটি সর্ব্বগ্রাসী মড়কের কথা লিপিবদ্ধ আছে, উহার বিবরণ বিশ্লেষণ করিয়া কতিপয় বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করিয়াছেন যে উক্ত মড়কগুলি খুব সম্ভব প্লেগে ঘটিত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে Black death নামে যে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল সেটা প্লেগেই; এই মড়কে নাকি তদানীন্তন ইয়োরোপের এক চতুর্থাংশ অধিবাসীর মৃত্যু হয়। আমাদের ভারতবর্ষেও ইহার ঘুণকাষ্ঠে অল্পসংখ্যক প্রাণের বলি হয় নাই। এক বোম্বাই প্রদেশেই নাকি গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এক-কোটি লোক ইহার কবলে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।—আমরা কলিকাতা-বাসীরা ভয় পাইয়াছিলাম এইসব বিবরণ সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াই।

সংবাদপত্রে আরও একটি বিবরণ আমরা পাঠ করিয়াছি,—সেটি উক্ত ব্যাধির নিবারণ কল্পে আমাদের স্বাস্থ্যবিভাগের বহুধা প্রচেষ্টার সাড়ম্বর বিজ্ঞাপন: বোম্বাই হইতে বিমানযোগে ৪০লক্ষ সিসি প্লেগের টিকা আসিবার কথা, প্লেগবিশেষজ্ঞের কলিকাতায় আসিবার সংবাদ, হাসপাতালগুলির তৎপরতা এবং সমুদয় প্রচারযন্ত্র মারফৎ স্বাস্থ্যবিভাগের জনসাধারণের প্রতি নির্দ্দেশ ইত্যাদি। আমাদের স্বাস্থ্যবিভাগের আন্তরিকতা সম্বন্ধে অবশ্য আমরা কোন সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি না। কিন্তু, প্লেগে কেন, কোন রোগের মড়ককেই কি এইরূপ উপায়ে কলিকাতার মত একটা জনবহুল সহর হইতে দূর করা সম্ভব? দুরারোগ্য দূষিত ক্ষতের মত কলিকাতার দেহের উপর যতদিন পর্য্যন্ত বস্তিগুলি টিকিয়া আছে, যতদিন কলিকাতার অগণিত রাস্তাগুলির দুপাশে জমাকরা জঞ্জালগুলি নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা না হইতেছে এবং যতদিন না আইন করিয়া কলিকাতাবাসীকে নাগরিক জীবনের সাধারণ নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য করা হইতেছে—ততদিন কেবলমাত্র 'শীঘ্র টিকা নিন্' এই বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা কলিকাতার মড়ক দূর করার চেষ্টাটা আমাদের মনে হয় ঘটি করিয়া সমুদ্রের জল শুকাইবার মত মূঢ় অপচেষ্টায় পর্য্যবসিত হইবে।

কাশ্মীরের শিক্ষা

গত ১৭ই এপ্রিল উনোর সিকিউরিটি কাউন্সিল কাশ্মীর সম্পর্কে একটি বড়জাতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এই সূত্রে উক্ত পরিকল্পনাকারিগণ সাড়ম্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে এই অভিনব পরিকল্পনা দ্বারা উনোর মহান শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টার আন্তরিকতার প্রমাণ বিশ্ববাসী আরেক বার প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইল—সুতরাং পর পর এই তিন বারের বারেও যদি এই নব পরিকল্পনা দ্বারা কাশ্মীর সম্পর্কিত ভারত-পাকিস্তানের সকল বিসম্বাদের অবসান না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী' অর্থাৎ কাশ্মীরের বিবাদের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ই বিশেষতঃ ভারত-ইউনিয়নই অধিকতর দায়ী। এই ঘোষণা কতটা সত্যসন্ধী সেকথা বিচার করিবার পূর্বে উক্ত পরিকল্পনাটি আমরা খুব সংক্ষেপে একটু দেখিয়া নিতে চাই।

এই পরিকল্পনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, এখনই একটি পঞ্চদশী অর্থাৎ পাঁচজন সদস্য গঠিত কমিশন 'উনো' দ্বারা মনোনীত হইয়া কাশ্মীরে প্রেরিত হইবে। পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট সমুদয় বহিরাগত হানাদারদিগকে কাশ্মীর হইতে সরাইয়া লইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। ইহার পর, কমিশন যখন বুঝিবেন যে পাকিস্তান যথাযথ-ভাবে এই দায়িত্ব সন্তোষজনক ভাবে পালন করিয়াছে এবং কাশ্মীরস্থ যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, তখন ভারত ইউনিয়নকেও উহার সৈন্যবাহিনী ক্রমক স্থান হইতে সরাইয়া লইয়া সেই সব স্থান স্থানীয় পুলিশ ও সৈন্য বাহিনীর উপর কাশ্মীরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিতে হইবে। কাশ্মীর যখন এইভাবে সম্পূর্ণ বহিরাগত সৈন্য-মুক্ত হইবে তখন কমিশনের তত্ত্বাবধানে সেখানে 'প্লেবিসাইট' অথবা সার্বজনীন ভোট গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু প্লেবিসাইটের পূর্বে কাশ্মীরের শাসনচক্র পক্ষপাত শূন্য হওয়া চাই, সংশ্লিষ্ট সকল দলেরই লোক নিয়া মধ্যবর্তীকালীন গভর্ণমেন্ট গঠন করিতে হইবে। প্লেবিসাইটটি প্রয়োজনানুরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সদস্যদের তত্ত্বাবধানেই অনুষ্ঠিত হইবে। এই প্লেবিসাইট পরি-চালকদের হাতে সাধারণের অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে এবং তাহারা তাঁহাদের বিবেচনানুযায়ী সৈন্য বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করিবেন এবং অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটও তাঁহারা নিযুক্ত করিতে পারিবেন। বহিরাগত সকল ব্যক্তিকেই কাশ্মীর ত্যাগ করিতে হইবে এবং বাস্তুত্যাগী কাশ্মীর অধিবাসীদের স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে উৎসাহিত করা হইবে।

উনোর ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। আমাদের পররাষ্ট্র বিভাগও শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের কার্য্য সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহেরুর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "আপোষ-আলোচনার দ্বারা সমস্যা সমাধানের কোন সম্ভাবনা বর্ত্তমানে নাই।"

উনোর প্রধান পাণ্ডাদ্বয় আমেরিকা ও ইংলণ্ডের শান্তি প্রচেষ্টার ছদ্ম আন্তরিকতা সম্বন্ধে প্রথম হইতেই আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণের দুর্বলতা অপরিসীম এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, কাশ্মীরের ব্যাপারের পরও এখনও তাঁহাদের সেই দুর্বলতা অটুট আছে। তাঁহাদের বিবৃতির সুরে বিগত-মোহের দীর্ঘশ্বাস, কিন্তু কার্য্যে এখনও তাহারা ইঙ্গ-আমেরিকার রক্ষণাশ্রিত আচরণেই আত্মারাম। তাই কাশ্মীর সম্বন্ধে একটা চরম নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিতে এখনও তাঁহারা ইতস্ততঃ করিতেছেন। দেড়শ বছরের শোষণে সাম্রাজ্যবাদ ভারতের শিরদাড়া ভাঙ্গিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ভারতের ভাগ্যকে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, এ সময় অনর্থক আমরা এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে পারি না; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের টাল-বাহানা, মনোভাবের জন্য কাশ্মীরের জন্য খরচ হইতেছে দৈনিক প্রায় দশলক্ষাধিক টাকা। রাজনৈতিক যোগ্যতার দিক হইতে এটাকে মোটেই প্রশংসনীয় বলা চলে না।

আমাদের দেশের শিক্ষিত মহলের মধ্যে যাহারা আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণভাবে

চিন্তা করেন, তাহারা কিন্তু উনো তথা ইঙ্গ-আমেরিকার আচরণ সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই দৃঢ় সন্দেহ পোষণ করিতেছেন। তাঁহারা তাই ভারত সরকার কর্তৃক কাশ্মীরের প্রশ্ন উক্ত প্রতিষ্ঠানে হাজির করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া মাত্রই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে: কাজটা বিশেষ বিজ্ঞজনোচিত হইতেছে না, কেন না আইনতঃ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার দরুণ এবং কাশ্মীরবাসীদের অধিকাংশের সমর্থন লাভের দরুণ কাশ্মীর ভারতেরই অংশ বিশেষ এবং উহার রাজনীতির সমস্যাও ভারতেরই নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপার। সেই ঘরের ব্যাপারে বাহিরের কেহ যদি অনধিকার চর্চ্চা করিয়া মাথা ঢুকাইতে চায়, তবে নিজের শক্তির জোরে সেই মাথাতেই আঘাত হানিতে হইবে, নতুবা বাহিরের আর পাঁচজন সালিশকে আহ্বান করিলে সমস্যা জটিলতরই হইবে। উক্ত সাবধানবাণী নিষ্ফল হয় নাই। উনোর বর্ত্তমান পরিকল্পনার ফলে কাশ্মীরের উপরে অনধিকারী পাকিস্তানের ও উপজাতিদের দখলী পাকা হইয়াছে, জাতীয় কনফারেন্সের মুক্তিকামী কাশ্মীরীদের স্বাধীনতার আশা দুরাশাপরাহী হইয়াছে, সর্ব্বোপরি ভারতবর্ষ যে আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদা অর্জ্জন করিবার জন্য উনোর দ্বারস্থ হইয়াছিল, আজ তার নিরীহ নীতির ফলে সেই মর্য্যাদাই বিশ্বের উপহাসের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উনোর পাণ্ডারা গলাবাজি করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে কাশ্মীরের ব্যাপারটায় তাঁহারা নিঃস্বার্থ ন্যায়বিচার করিয়াছেন। হয়তো ইঙ্গ-আমেরিকার স্বার্থের দিক দিয়া এটা সত্যই ন্যায় বিচার। কাশ্মীরের অপর প্রান্তেই সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্রের ডাইনে ও বামে মধ্যপ্রাচ্য ও চীন—দুটি অঞ্চলই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হয় তো বা (দুটি ফ্রন্টই এবং) উক্ত দুটি ফ্রন্টেই সোভিয়েট রাষ্ট্র আজ আঘাতোদ্যত বসিয়া রহিয়াছে। এহেন পরিস্থিতিতে কাশ্মীরকে Advance base হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিলে ইঙ্গ-আমেরিকা হাতে স্বর্গ পাওয়ার মত লাভবান হইবে। সুতরাং যে পাকিস্তানকে সহজেই তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসাবে পাওয়া যাইবে তাহার তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরকে ষড়যন্ত্র করিয়া প্রদান করিলে ইঙ্গ-আমেরিকার পক্ষে তার চেয়ে আর ন্যায়-বিচার কী হইতে পারে? কিন্তু এ সম্বন্ধে দুটিকথা বিশ্বের প্রতি আমরা আমাদের স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বর্ত্তমান গ্রীসের বিদ্রোহিবাহিনীর সহিত যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং আলবেনিয়ার সম্বন্ধটা অধিকন্তু কাশ্মীরের হানাদার ও পাকিস্তানের সম্পর্কের মত—কিন্তু গ্রীসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র-মিশ্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপকে কি উনোর পাণ্ডারা ন্যায় বিচারসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন? ফ্রান্স এবং ইটালীতেও সোভিয়েট কমিউনিষ্টদের সমধর্ম্মীরা অর্থাৎ ফরাসী এবং ইটালীয় কমিউনিষ্টরা তথাকার প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের বিরোধী অংশ ও উক্ত কমিউনিষ্টদের প্রচারানুযায়ী অত্যাচারিত ও বঞ্চিত অংশও বটে,—কিন্তু এতদুভয়ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কমিউনিষ্টরা যদি ফ্রান্স ও ইটালীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে অগ্রসর হয় তবে কি সেই ব্যাপারটাকেও ন্যায় বিচার বলা যাইবে? চীনের ব্যাপারটাও একইরূপ—সেখানেও যদি সোভিয়েট রাষ্ট্র চীনা কমিউনিষ্টদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যদানে অগ্রসর হয় তবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের আচরণকে কি পাকিস্তানের মত ইঙ্গ-আমেরিকা সমর্থন করিতে পারিবে? জানি, আমাদের এই প্রশ্ন কোনোদিনই উনোর পাণ্ডাদের কর্ণগোচর হইবে না? কিন্তু আমরা বিস্মিত হইতেছি, আমাদের প্রতিনিধিরা এই প্রশ্নগুলি উনোর বৈঠকগুলিতে উত্থাপন করিলেন না কেন?

উনোর দরবারে আমরা যে মামলা পেশ করিয়াছিলাম, বিচারপতি ও জুরিদের কপট বিচারের ফলে আমরা সেই মামলায় হারিয়া গিয়াছি, কিন্তু হারিয়া গেলেও আমরা সবকিছুই হারাই নাই। পরাজয়ের বিনিময়ে আমরা শিক্ষালাভ করিয়াছি একাধিক। প্রথমতঃ আমাদের শিক্ষা হইয়াছে যে—আন্তর্জ্জাতিক নীতিটা নিছক আদর্শবাদের উপাদান নয়, সেখানে কিছুটা বাস্তববুদ্ধিযুক্ত কূটপন্থা প্রয়োজন, আমাদের দ্বিতীয় শিক্ষা হইয়াছে যে, উনোর দরবারের ষড়যন্ত্রচক্রের মধ্যে যাওয়া নিতান্ত অবিবিচ্যকারিতা, সেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত। কিন্তু ইহার চেয়েও বড় শিক্ষা যেটা

আমাদের হইয়াছে, সেটা এই যে স্বার্থ ব্যতীত পাকিস্থান ভারতের সহিত কোনো বিষয়েই সহযোগিতা রাখিবে না; আশু: ডোমেনিয়ান চুক্তি বা অন্যান্য বৈষয়িক ও বাণিজ্য-চুক্তির ফলে ভারত সরকার অপেক্ষা পাকিস্তানের অনেক বেশী লাভ হইবে ইহা স্থির জানিয়াই পাকিস্তান ঐসব চুক্তিতে ভারতের সহিত মিলিত হইতেছে। অতএব অতঃপর পাকিস্তানের সহিত কোন কিছু বিষয়ে বোঝা পড়া করিতে হইলে তুল্য মনোভাব লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, কিন্তু এই শিক্ষাটি পাইয়াছে ভারতের সাধারণ ছাপোষা অধিবাসীরা মাত্র, পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষবর্গ কতদিনে এই বিষয়ে চৈতন্যযুক্ত হইতে পারিবেন, সে কথা শুধু ঈশ্বরই জানেন।

দেশবন্ধু-স্মৃতি

আগামী ১৬ই জুন দেশবন্ধুর স্মৃতি বার্ষিকী দিবস। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যাঁহার বিপুল ত্যাগ মহীচির ত্যাগ অপেক্ষাও বিপুল আর, জাতির কল্যাণ সাধনে, দেশের কার্য্যে বাড়ী ঘর, স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজন সবই আহুতি দিয়াছেন, যাহার রাজনৈতিক কর্মপন্থাই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থারূপে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইয়াছে, আজ ভারতবাসীর কথা ছাড়িয়া দিতেছি, বঙ্গবাসী এমন কি দেশবন্ধুর খাস শিষ্যগণ পর্য্যন্ত সেই মহামানবকে বিস্মৃত হইয়াছেন!

মনে পড়ে সেই স্বরাজ বৎসর ও পরবর্ত্তী ১৯২২ সালের কথা। চৌরীচুরার ব্যাপারের পরে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; সেই বর্দ্ধৌলী সিদ্ধান্ত ভারতবাসীকে কিরূপ পঙ্গু ও নিষ্কর্ম্মা করিয়া দিয়াছিল, ত্বরিত গতিতে সহযোগিতা আরও অধিকতর শক্তি লইয়া দেশে আসিয়া জুড়িয়া বসিল—আদালত, বিদ্যালয়, কাউন্সিল পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল—অসহযোগ যেন একটা তামাসার ব্যাপার হইয়া পড়ে। জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশবন্ধু যখনই দেখিলেন, নন-কোয়াপারেসন ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে, অনুস্থ শরীর লইয়া তিনিই যেন দেশকে আবার সঞ্জীবিত ও সতেজ করিয়া তুলিলেন, অসহযোগিতা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াও যে কাউন্সিল প্রবেশ সম্ভব, দেশবন্ধু তাহা প্রমাণিত করিলেন আর বিষাদগ্রস্ত যুবকগণও ইহাতেই সংগ্রামের সম্পূর্ণ উপাধান পাইয়া উহা আঁকড়াইয়া ধরিলেন। আর শেষ পর্য্যন্ত সেই অদ্ভুত পন্থার সহায়তায়ই ভারতের স্বাধীনতা আয়াসসাধ্য হইয়াছে ও তাহা লাভ করিয়াছি।

আগামী ১৬ই জুন স্বরাজ লাভের পরে সেই মহামানবের প্রথম শ্রাদ্ধ বাসর। বাঙ্গলার কংগ্রেসকর্ম্মী মন্ত্রীগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দেশবন্ধুর প্রিয় ও

দেশবন্ধু

অন্তরঙ্গ শিষ্য। আজ এই মন্ত্রীমণ্ডলীর সহায়তায় সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কি দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষিত হইবে না? আর বাঙ্গলার কংগ্রেস সেবীগণও কি তাহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন?

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ভারতের বৈদেশিক নীতি

চেকোস্লোভাকিয়ার coup d'etat এবং ব্রাসেল্‌সে অনুষ্ঠিত পঞ্চশক্তি চুক্তির (এতদুভয় ঘটনার বিস্তৃততর আলোচনা বঙ্গশ্রীর বৈশাখ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য) পর পৃথিবীর দিগন্তে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের কালো মেঘটা ক্রমেই ঘনাট বাঁধিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতেই ইয়োরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি ও আমেরিকা মুখে শান্তির স্তোকবাক্য আওড়াইয়া তলে তলে যে শান্তির সম্ভাবনাকে সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস করিবারই জন্য অস্ত্র শানাইতেছিল এই চক্রান্তের কথাও আজ আর পৃথিবীর সাধারণ নরনারীর কাছে অস্পষ্ট নাই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্ত্তমান পরিস্থিতির এই হইল একদিক। আর একদিক হইল এই যে, এই ভয়ঙ্কর চক্রান্তের মধ্যে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলির ভাগ্য তমসাচ্ছন্ন, বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি ইহাদের লইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিবে—প্রমাণ—প্যালেস্টাইন, প্রমাণ—কাশ্মীর। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উক্ত দুইটি দিক মোটামুটি এবং বাস্তবতাসন্ধী দৃষ্টি দিয়া অনুধাবন করিয়াই ভারতের পররাষ্ট্রীয় নীতি রচনা করিতে হইবে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্ত্তমান রূপটা আরো কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করা দরকার:

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বিশ্বরাজনীতি বা শক্তিচক্রান্তের প্রাণকেন্দ্র হইল ইয়োরোপ; এই ইয়োরোপই এতাবৎ পৃথিবীর সমুদয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমন কি সাংস্কৃতিক কার্য্যকলাপেরও নেতৃত্ব করিয়াছে। এই কারণেই দেখা গিয়াছে যে, ইয়োরোপের রাজনীতিতে যে রাষ্ট্রের প্রভুত্ব, বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রেও তাহার কর্তৃত্ব অবিসম্বাদী। পৃথিবীর দু-দুটি সর্ব্বাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল উক্ত ইয়োরোপীয় রাজনীতির কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করিয়াই।

গত বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে একাধিপত্য ছিল বৃটেনের। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক তাহার সেই একাধিপত্য বিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু শেষ অবধি কাইজার উইলহেল্‌মের পরাজয়ের ফলে বৃটেনের সেই একাধিপত্য অটুট ছিল প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই পুনরায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে। আমরা জানি, বৃটেন এবারেও জয়ী হইয়াছে, এবং শুধু জয়ীই হয় নাই, বিশ্বরাজনীতিতে তাহার চরম বৈরী জার্ম্মেনী প্রায় পুনরুত্থানের আশাচ্যুত হইয়া পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। তাই এবারেও মনে হইয়াছিল যে,ইয়োরোপের নেতৃত্ব বুঝি পূর্ব্বের মত বৃটেনেরই হস্তে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু ইতিহাস এক রহস্যময় রসায়নকার—ইহার বহুবিধ অনুপরমাণুরূপ ঘটনার মধ্যে যে কোন্ অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিণতি লুকাইয়া থাকে তাহা বুঝি স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষেও দুর্জ্ঞেয়। যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই আজ বিশ্ববাসী পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছে যে, ঘটনাবলীর সেই অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিণতির ফলে ইয়োরোপীয় তথা বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে নূতন দুইটি রাষ্ট্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—একটি নিত্য-প্রগতিশীল ও ক্রমবর্দ্ধমান-শক্তি সোভিয়েট রাশিয়া, আরেকটি ডলার-বক্ষ আমেরিকা। বৃটেন এখন পৃথিবীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

এতদুভয়ের মধ্যে আমেরিকার স্বরূপটি সম্বন্ধে আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের একটু বেশী করিয়া অবহিত হওয়া আবশ্যক, কারণ বৃটেনের দুষ্পরিহার্য্য মধ্যস্থতার ফলে বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে আমেরিকার সহিতই আমাদের সম্পর্কটা ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছে।

আমেরিকা অতিবিস্তৃত দেশ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদপ হইতেই স্বীয় কাচামাল ও যন্ত্রপণ্য তাহার স্বকীয় প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এতটা বিত্তের অধিকারী হইয়াও আমেরিকার ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে কর্তৃত্ব করিবার উচ্চাভিলাষ সেদিন পর্য্যন্ত পূরিত হইবার কোন আশা দেখা যায় নাই। তাহার সে-সুযোগ আসিয়াছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—কেননা এই যুদ্ধের ফলেই আজ জার্ম্মেনী পর্য্যুদস্ত, বৃটেন সাম্রাজ্যচ্যুত হইয়া বিকলাঙ্গ আর অন্যান্য পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ক্ষতবিক্ষত এবং কঙ্কাল। পক্ষান্তরে, কার্য্যতঃ বিজয়শক্তির নেতৃত্ব করিয়াও আমেরিকার দেহ অক্ষত রহিয়াছে; আজ তাহার লোকবল অটুট এবং অর্থবল

আকাশচুম্বী। পশ্চিম ইয়োরোপের এই পরিস্থিতির মধ্যেই মার্শালের E. R. P. (European recovery program) পরিকল্পনাও তাহার পরিপূরক আটলান্টিক চুক্তির উদ্ভব।

পক্ষান্তরে রাশিয়ার বর্তমান ক্রমবর্ধমান শক্তিও আমেরিকারই সমাবস্থাপ্রসূত। পরিমাণের তুলনায় আমেরিকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হইলেও সোভিয়েট রাষ্ট্রের লোকবল এবং বিত্তবলও উপেক্ষণীয় নহে। তদুপরি দিয়া তাহার শক্তি ও প্রভাব বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে আমেরিকা অপেক্ষা শুরুতর—কেননা রাশিয়া আজ যে অর্থাধিক ইয়োরোপের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেটা শুধু টাকার জোরে নয়। বস্তুত ইয়োরোপের বৃহত্তর অংশের উপর তাহার আদর্শগত প্রভাবও অত্যন্ত প্রবল। এতদ্ব্যতীত আমেরিকার প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলিতেও সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমর্থকদের দলটা ছোট নয়।

কিন্তু বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রের উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দৈত্যরূপী রাষ্ট্র দুইটির মনোভাব ভারতের প্রতি কীরূপ?—এই প্রশ্নের উত্তরটি আমাদের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জীবন-মরণের সমস্যামূলক। প্রথমে আমেরিকার মনোভাবটির পরিচয় লওয়া যাক্। এবিষয়ে আমরা আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির শ্রেষ্ঠ প্রতিপক্ষিশালী ব্যক্তি মিঃ আর্থার লিপম্যান বহুদিনের পূর্বে যে একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করিয়াছিলেন, সেটি উদ্ধৃত করিতেছি—"Heroic measures must be taken in time to prevent the collapse of the British attempt at the reconstruction of her Empire." মিঃ লিপম্যানের এই দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বিলাতের socialist Tribune-পত্রিকাটি যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহাও এখানে উদ্ধৃত যোগ্য:

Lippman sees that the collapse of the British Empire would isolate the U. S. A from Europe and Asia, for in the prevent situation the British Empire is really a pathway by which American capital is crossing into so many countries in Asia and Europe. Finance capital is easy to imagine, so the cundy boy Uncle Sam is begining to weigh the question whether it would not be wise to pump a few more life-giving dollars into the exhausted pocket of the junior partner.

প্রত্যক্ষ আইনের দিক দিয়া না হইলেও বৈদেশিক বাণিজ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এখনও পরোক্ষভাবে বৃটীশ সাম্রাজ্যেরই অন্তর্গত। এমতাবস্থায় বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ এবং কার্যতঃ সেই সঙ্গে ভারত সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাবটা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। অন্যপক্ষে ভারতবর্ষ সম্পর্কে রাশিয়ারও যে প্রকৃত মনোভাব কী তাহারও বহুপরিচয় ইতিপূর্বে বঙ্গশ্রীর এই বিভাগের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে মনোভাব বিস্তবতী উপনিবেশের সহিত প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদের পূর্বরাগমূলক শুভেচ্ছার মত।—একথায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিক ক্ষেত্রে ইয়োরোপের অন্যান্য দুর্বল রাষ্ট্র ও উপনিবেশগুলির মত ভারতেরও সত্যকার অবস্থা হইল, জলে কুমীর ও ডাঙায় বাঘ—এই দুইয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান করিবার মত।

এই সংশয়পূর্ণ স্থানে দাঁড়াইয়া কোনো পক্ষেরই কণ্ঠলগ্ন হওয়া ভারতের পক্ষে নিরাপদ নয়, সম্মানজনকও নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় ভারতের পররাষ্ট্র নীতিকে আরও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়া এবং আরও দৃঢ়তর মনোভাব নিয়া গঠন করিতে হইবে।

পুস্তক ও আলোচনা

শেষ বসন্তে : কাব্যগ্রন্থ। শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। পুস্তকালয় : ২৯, বাহুড়বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা মাত্র।

সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যে কয়েকজন দৃষ্টিমেয় চিন্তাশীল লেখক কবি-মননশীলতার খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, চপলাবাবু তাঁহাদের একজন। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁহার পরিণত বয়সের প্রকাশ। যৌবন-সীমায় দাঁড়াইয়া পশ্চাতের পানে চাহিয়া ভরন্ত কবি-হৃদয় বেদনা-সিঞ্চিত হইয়া বলিতেছে :

"বেলা যায়, বেলা যায়,
আপন অজ্ঞাতে তোর জীবনের ঐশ্বর্য্য ছায়ায়
ওরে ভাগ্যহত,
এ জগতে নিঃস্বতম, কেবা বল, আছে তোর মতো?
সহস্র সঞ্চয় তোর উপেক্ষায় করিলি যে ক্ষয়,
কি লইয়া রহিবে রে এ জীবন মহাশূন্যময়?
অর্থহীন শেষ নহে,
এরই মাঝে পাবে নিঃশেষে!
ফুরালো আম্রবসীমা—সম্মুখে জগৎ নিরুদ্দেশ।"

বসন্তের ডাক বার বার আসিয়া কবি-হৃদয়কে আঘাত করিয়া গিয়াছে। তখন আপনার পরম ঐশ্বর্য্য-পরিবার কবি মত্ত ছিলেন। অকস্মাৎ হৃদয়ের চোখে নিকুঞ্জের মলয়-সঞ্চারের অভাব স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের ক্ষণস্থায়ী সুখৈশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট ছিল বলিয়া ভূমা-চেতনা সম্বন্ধে হৃদয় বধির ছিল। কবি-আত্মা তাই এক এক সময় হাহাকার করিয়া ওঠে :

'ক'রে যাই, ক'রে যাই,
বহুকাল হ'য়ে গেল পৃথিবীতে থাকা;
মলিন ধূলায় তাই বৃথা আর কেন ধরি রাখা!'...

বসন্ত-বিচ্ছেদ মানব-জীবনের চিরন্তন বেদনার উদ্রেক। সেই বেদনা তিলে তিলে মানুষকে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর করিয়া তোলে। কিন্তু এখানে বসন্ত-অবসানের ভিত্তিতে কবির মধ্যে একটি অতীন্দ্রিয় দুঃখের আভাষ পাই। যতদিন যৌবন-মোহে বসন্ত-লালিমায় হৃদয় লীলায়িত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত পরমার্থ লাভ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অনুভূতি জাগে নাই। কিন্তু সেই বসন্তেরও একদিন অবসান হইল। নিষ্ঠুর বিধাতার কাছে কবি তাই আকুলচিত্তে ব্যথার প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়াছেন :

"যে ঐশ্বর্য্য প্রকৃতির প্রতি অঙ্গে উছলিয়া ওঠে,
সকল অভাব ছাপি বার বার পূর্ণরূপে ফোটে,
অক্ষয় সম্পদ যাহা, কেন তাহা দাও নাই মোরে?
যাহা যায়, আর নাই—কেন তোতে প্রাণ ওঠে ভ'রে?

যৌবনের প্রান্তর-সীমায় দাঁড়াইয়া কবি চাহিয়া দেখিলেন—অনর্থের হাটের ভিড়ে ভবিষ্যতের সঞ্চয় কখন্ ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন তিনি সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া শুধু এই বাণীই শুনিতেছেন—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্; অর্থাৎ যাহাতে অমৃতত্ব-ভোগ নাই, তাহা লইয়া কি করিব! যৌবন-বসন্ত তাই তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চারের চাইতে দুঃখানুশোচনার উদ্রেকই করিয়াছে। এখন তাঁহার শেষ সম্বল—

আশা আছে রজনীর শেষে
আবার ভিড়িবে তরী কোনো নব প্রভাতের দেশে।

এই অনুভূতিই কবির সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষাসিঞ্চিত অনুভূতি।

সুতরাং 'শেষ বসন্তে' কবিতায় নৈরাশ্য অপেক্ষা আশার আলোকরশ্মিই যেন অধিকতর প্রতিভাত হইতেছে।

গ্রন্থে মোট ১৫টি ছোট-বড় কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম কবিতাটির নামেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। অন্যান্য কবিতার মধ্যেও এই সুরই কখনও প্রকাশ্যে কখনও বা প্রচ্ছন্নভাবে লক্ষ্য করি। হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্মের অতি স্বাভাবিক পরিচয় 'শেষ বসন্তে'র প্রায় প্রতিটি কবিতার মধ্যে সুস্পষ্ট। বইখানি আগা-গোড়া পাঠ করিয়া শুধু এই কথাই বলা যায়—সাংবাদিক চপলাকান্তের চাইতে কবি চপলাকান্ত বড় ভিন্ন ছোট নন।

সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত